

সহচরী

তনুমন

জায়গা আছে

তিনটি উপন্যাসের একখানি অপূর্ব সংকলন

স্নেহ মমতা ভালবাসা

জ রা স ন্ধ

রচিত ও

সম্পাদিত



SNEHA MAMATA BHALOBASA

JARASANDHA

Rupees Twelve and Fifty Paise only.





জরাসন্ধ

প্রথম প্রকাশ
২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৭

প্রকাশক
শ্রীহরিগোপাল বসাক
১এ, বুদ্ধু ওস্তাগর লেন,
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর
জলি আর্ট প্রেস
৭/১এ, জাষ্টিস মন্মথ মুখার্জী রো.
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সত্য চক্রবর্তী

পরিবেশক :
সন্ধানী ২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কাল-৭৩





বাংলাসাহিত্যে জরাসন্ধ একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী, যেখানে তাঁর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, বোধহয় কোনো অনুগামীও নেই। সমাজজীবন থেকে বিতাড়িত, ঘৃণিত এবং ব্রাত্য জগতের অধিবাসীদের তিনি লৌহকপাট, তামসী এবং ন্যায়দণ্ড উপন্যাসে এমনি এক একটি জীবন্ত মর্মস্পর্শী চরিত্র চিত্রিত করেছেন, তাদের অনেকেই বাংলা-সাহিত্যের অঙ্গনে চিরস্থায়ী ভাল-বাসার আসন পেয়েছে।

তাঁর 'নিসঙ্গপথিক' উপন্যাসটি বাংলাসাহিত্যের আত্মজীবনীমূলক শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির অন্যতম।

জরাসন্ধের রচনার সব চেয়ে বড় গুণ হল, তিনি অতিরঞ্জন বা অতিকথন সবসময় এড়িয়ে চলেন। অথচ, যাদের কথা শোনান, মনে হয়, তাঁরা অন্তর্লোকের এত উপরের মানুষ তাদের প্রতি মুহূর্তের সুখ-দুঃখ-ব্যথা-বেদনার আনন্দে তাঁর হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রী অনুরণিত হচ্ছে।

এইজন্যই জরাসন্ধ চরিত্র গঠনের কাজে আজো একক অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

'স্নেহ মমতা ভালবাসা' তাঁর বৈচিত্র্যময় বাস্তবজগতের উজ্জ্বল ও সার্থক নিবেদন।

প্রকাশক

এক

(অঞ্চলটা) নতুন গড়ে উঠেছে।) শুধু চেহারায় নয়, নামেও তার পরিচয়—নিউ সাউথ পার্ক। দক্ষিণ কোলকাতার আরো খানিকটা সম্প্রসারণ।

পীচঢালা রাস্তাগুলো জ্যামিতিক সরল রেখার মত সোজা। উপনগরীর ঠিক মাঝখান দিয়ে যেটা চলে গেছে পূর্ব থেকে পশ্চিমে, সেটা বেশ চওড়া, বোধহয় ষাট ফুট। তার নামকরণ হয়েছে, কী একটা অ্যাভিনিউ, যদিও তার দুধারে কোথাও গাছপালার চিহ্ন নেই। হয়তো পরে লাগানো হবে। শুরু থেকেও তো হতে পারত। হয় না। নগর-পত্তনের পরিকল্পনায় ওটা অবান্তর। স্থপতির ব্লু-প্রিণ্টে বৃক্ষের স্থান নেই।

আগেকার দিনে 'জলাশয়-খনন' 'বৃক্ষরোপণ'—এসব ছিল গৃহস্থের পুণ্য কর্ম। রাজারা যখন রাজপথ তৈরী করতেন তার দুধারে থাকত ঘনপল্লব বৃক্ষের সারি। তারা পথচারীকে ছায়া দিত, দূরাগত শ্রান্ত পথিককে বিশ্রাম দিত, ফলের দিনে কিঞ্চিৎ আহারও দিত সেই সঙ্গে। শুধু পথচারী নয়, আকাশচারী মেঘলোকের সঙ্গেও তাদের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। দীর্ঘায়ত শ্যামল তরুবীথিকার স্নিগ্ধ আহ্বানে বিগলিত হয়ে কোনো কোনো চলমান মেঘ নিজেকে রিক্ত করে বিলিয়ে যেত তার দাক্ষিণ্যের ধারা। আকাঙ্খিত বর্ষণে তৃপ্ত হত ধরণী। মাঠে মাঠে চাষের মরসুম শুরু হত।

কালক্রমে মানুষের পুণ্য-লোভ আর তেমন প্রবল নেই, পুণ্যার্জনের পথও বদলে গেছে। রাজরাজরাও নেই, তার জায়গা নিয়েছে রাজ্য-সরকার। নগর-পত্তন, রাজপথ-নির্মাণ, দীর্ঘিকা-খনন—এসব কর্ম চলে গেছে সরকারের হাতে। তার মধ্যে পুণ্যের প্রেরণা নেই, সবটুকুই প্রয়োজনের তাড়না। পাইটি নয়, ইউটিলিটি।

সম্ভবতঃ সেই কারণেই পূর্বাঞ্চলে, বিশেষ করে পদ্মা-ভাগীরথীর

শ্যামলিমায় ঘেরা যে ভূখণ্ড, সেখানে সহর বসাতে গিয়ে তার রাস্তার ধারে গাছ বসাবার দিকে তেমন ঝোঁক দেখা যায় না। প্রকৃতি এখানে হরিদ-বর্ণা। পথে, প্রান্তরে, লোকালয়ে সবুজের সমারোহ। মানুষের প্রকৃতি তার প্রতি অনেকটা উদাসীন। অন্তত তার উপরে এমন কোনো মোহ বা বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করে না, যার ফলে 'বৃক্ষ-রোপণ' বলে একটি প্রয়োজনীয় আইটেম বা দফা নতুন নতুন নগর-পরিকল্পনার অঙ্গীভূত হতে পারে।

পশ্চিমাঞ্চলের কথা আলাদা। সেখানকার গৈরিক প্রকৃতির সারা দেহে সবুজ-স্নিগ্ধতার একান্ত অভাব। তার মাটি রুক্ষ, বাতাস শুষ্ক, আকাশ বর্ষণ-বিমুখ। তার পাথুরে ডাঙায় গাছপালা, লতাগুল্ম দূরে থাক, ঘাস পর্যন্ত গজায় না। বৃক্ষ সেখানে বৃক্ষ-সম্পদ। ঝোপ-ঝাড় সেখানে আপদ নয়, শ্রী। সেখানকার মানুষের মনে গাছের একটা বিশেষ স্থান আছে। তাকে তারা যত্ন দিয়ে, শ্রম দিয়ে গড়ে তোলে, কষ্ট করে বাঁচিয়ে রাখে। রাস্তা বানাতে, বাড়ি তুলতে গিয়ে ওখানকার স্থপতিরাও তাকে বাদ দিতে পারেন না।

রবীন্দ্রনাথ যে 'বৃক্ষ-রোপণ'কে একটি বিশেষ উৎসবের রূপ দিয়েছিলেন, তার মধ্যে তাঁর কবি-প্রকৃতির প্রেরণা অবশ্যই ছিল, সেই সঙ্গে প্রয়োজনের তাগিদটাও অস্বীকার করা যায় না। একথা অন্তত মানতে হবে, যে 'অঙ্গনে' তিনি 'বালক তরুদলকে' নৃত্য-গীতের অঞ্জলি দিয়ে আহ্বান জানিয়েছিলেন, সেটা যদি শান্তি-নিকেতনে না হয়ে বরিশালে হতো, তাঁর শিল্পীরা হয়তো অতটা উৎসাহিত হতেন না, ঐ উৎসবের পিছনে আশ্রমবাসীদের প্রাণের সাড়া যে কতটা পাওয়া যেত, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে।

নিউ সাউথ পার্কে প্রধান রাস্তা ঐ একটি। বাকীগুলো কম চওড়া—বোধহয় তিরিশ ফুট—দু'দিক থেকে আড়াআড়িভাবে ওর সঙ্গে এসে মিশেছে। তাদের কোনো নাম নেই। দু'ধারে সরু ফুটপাথ। তার পাশে বিচিত্র গেটওয়ালা বাড়ি। কোনো-

কোনোটার সামনে একফালি বাগানও আছে—ফুল, লতা, পাতা-বাহারের বাগান। মাঝে মাঝে খালি প্লট। এখানে সেখানে নতুন বাড়ি উঠেছে. গায়ে ভারা বাঁধা ; চারধারে ইট, খোয়া, বালি আর পাথর-কুচির স্তূপ।

যে-রাস্তায় পাশাপাশি সব প্লট ভর্তি হয়ে গেছে, সেখানেও বাড়িগুলো পুরনো কোলকাতার মতো কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে নেই। মাঝখানে বেশ খানিকটা ফাঁক, প্রচুর আলো-বাতাসের অবাধ পথ। ফাঁকগুলো হয়তো শুধু সেই উদ্দেশ্যেই রাখা হয়নি। এখানে যাঁরা থাকেন, ওগুলো তাঁদের স্বভাব ও মেজাজের প্রতীক। এঁরা যে-তলার লোক, প্রতিবেশীর সঙ্গে 'মেলামেশাটা' সেখানে রেওয়াজ নয়। তার থেকে যতটা সম্ভব দূরত্ব বাঁচিয়ে চলাই এঁদের জীবন-দর্শন।

বাড়িগুলোর আকার, গড়ন এবং নক্‌শা আলাদা হলেও, একটা বিষয়ে আশ্চর্য মিল আছে। প্রায় প্রতিটির সামনে চওড়া বারান্দা এবং তার ধারে নয়, অনেকটা মাঝ-বরাবর একটি করে কালো মোটা পিলার একতলার ছাদ ফুঁড়ে দোতলা বা তিনতলা পর্যন্ত উঠে গেছে।

সুহৃদ রুদ্র যেদিন স্ত্রীকে সঙ্গে করে এই পল্লীতে ফ্ল্যাট খুঁজতে এসেছিলেন, মালতী ঐগুলো দেখিয়ে এঞ্জিনিয়র স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আজকালকার বাড়ির প্ল্যানে বুঝি ওই রকম একটা পিলার ঢোকানো নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে?

অন্তত এ পাড়ায় তাই।

কেন?

ওগুলো হচ্ছে পিলারস্ অব সাক্‌সেস্। জীবনে এঁরা জয়ী হয়েছেন, তারই চিহ্ন। অর্থাৎ, বলতে পার জয়স্তম্ভ।

পিলারের এই দার্শনিক ব্যাখ্যা শুনে মালতী হাসলেন। চারদিকটায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, কিন্তু সবগুলোই কালো তা দেখেছ?

সুহৃদও সেটা লক্ষ্য করলেন। বাড়ির রং আলাদা-আলাদা হলেও পিলারগুলো সত্যিই কালো। তাঁর স্থপতি-দৃষ্টিতে মনে হল কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্য রং হলে মানাত ভালো। বললেন, তুমি বলতে চাও, জয়স্তম্ভ যদি, তবে অশোক-পিলারের মত ব্রাউন কেন হল না?

তা নয়, তবে কালোটা বড্ড একঘেয়ে লাগছে না?

সুহৃদ চলতে চলতে মাথা নিচু করে কি ভাবলেন। তারপর গম্ভীর মুখে বেশ খানিকটা গবেষণার ভাব ফুটিয়ে তুলে বললেন, ওরও একটা মানে আছে।

কী, শুনি? মালতীর চোখে কৌতুক দৃষ্টি।

ঐ কালোটা হচ্ছে সিম্বল, বাংলায় যাকে বলে প্রতীক। মানে, এই বাড়িওয়ালাদের সকলের না হলেও, অনেকের জীবনে সাকসেস্ যে পথ দিয়ে এসেছে, তার রংটা ঐ।

মালতীর ভ্রূর উপরে কুঞ্চন দেখা দিল। হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, তার মানে এটা ব্যবসাদারদের পাড়া? তাহলে এখানে এসে কাজ নেই, বাপু।

এ তোমার ভারী অন্যায়। তাদের পক্ষে দাঁড়িয়ে যেন প্রতিবাদ করছেন, এমনি সুরে বললেন সুহৃদ, শুধু ব্যবসাদাররাই বুঝি কালো রাস্তায় চলে? এর মধ্যে অনেকে ছিলেন সরকারী কিংবা মার্চেন্ট আফিসের বড় বা মেজো সাহেব। তাছাড়া উকিল, ব্যারিস্টার, ডাক্তার, প্রফেসর—কোনো প্রফেশনই বোধহয় বাদ পড়বে না। কালো পথটা কারো একচেটে নয়।

মালতী প্রতিবাদ করেননি, স্বামীর মতে মনে মনে সায় দিতেও পারেননি। তাঁর ধারণা, কালো বাজার, কালো টাকা, এইসব কথাগুলো যেখানে খাটে বা চলে, সেটা হচ্ছে কারবারীদের জগৎ। তিনি দেখেছেন, তাঁর মুদী, মনোহারী দোকানদার, সবজিওয়ালা, মাছওয়ালা যখন খুশি দাম চড়িয়ে দেয়, গয়লা কখনো দুধে জল

মেশায়, কখনো জলে দুধ মেশায়, যে শাড়িখানা ক'দিন আগেও তিরিশ টাকা দিয়ে কিনেছেন, আজ তারই দাম হাঁকছে পঁয়ত্রিশ টাকা। এইগুলো কালো বাজারের রোজগার, গৃহস্থকে ঠকিয়ে অতিরিক্ত মুনাফা লোটা। সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এক বেলার মধ্যেই তো একটা দাঁতের মাজন এক টাকা থেকে লাফ দিয়ে দেড় টাকায় গিয়ে উঠতে পারে না। ওটা ওদের অন্যায় লাভ। ওদের উপরের স্তরে যারা রয়েছে, মানুষের নিত্য-ব্যবহারের জিনিসপত্র যারা তৈরি করে, কিংবা দোকানে দোকানে যোগান দেয়, —বড় বড় কারবারী এবং কলকারখানার মালিক—তাদের এই অসঙ্গত মুনাফার সুযোগ রয়েছে। সে সুযোগ তারা নিচ্ছে এবং অন্যকে করে দিচ্ছে বলেই দোকানদাররা তার উপরে খানিকটা করে ভাগ বসাচ্ছে। কোথা দিয়ে কী ভাবে কে কতটা লুটছে, অতসব ব্যাপার মালতীর জানা নেই। কিন্তু উপর থেকে তলা পর্যন্ত এদের গোটা দলটাই যে এই কালো রোজগারের পথ বেয়ে ওঠা-নামা করে, এ-বিষয়ে তাঁর একটা মোটামুটি বিশ্বাস জন্মে গেছে। তার থেকে 'ব্যবসা' নামক বস্তুটির প্রতি তাঁর মনোভাব ঠিক বিরূপ না হলেও অনুকূল নয়।

কিন্তু তাঁর স্বামীর মতো যারা কোনো অফিস বা প্রতিষ্ঠানে বাঁধা মাইনের চাকরে, কিংবা যারা ডাক্তারি, প্রফেসরি, ওকালতির মতো একটা সৎ এবং সম্ভ্রান্ত বৃত্তি আশ্রয় করে মেধা, বুদ্ধি এবং শ্রমের বদলে অর্থ উপায় করেন, তাদের বেলায় 'কালো বাজার' বা 'কালো টাকা'—এই কথাগুলো কি করে খাটতে পারে, তিনি বুঝতে পারেন না। কোনো কোনো চাকরিতে অবশ্য ঘুষ বলে একটা বাড়তি এবং গোপন রোজগারের পথ আছে, একথা তিনি অনেকের মুখে শুনেছেন। হয়তো আছে, কিন্তু সে আর ক'টা? তার সংখ্যা যেমন কম, সুযোগও তেমন বেশী নয়।

তাঁর এক পিসেমশায় যেখানে চাকরি করেন, সেখানে নাকি

কথায় কথায় ঘুম। বাড়িতে বলতে শুনেছেন, উনি ডান হাত দিয়ে সই করে আর কত পান? তার অনেক বেশী আসে বাঁ হাত দিয়ে, বিনা সইয়ে। যদি সত্যিই তাই আসে, সেটা এমন কিছু বড় ব্যাপার নয়। সেই ছোট থেকে তো দেখছেন তাঁদের। হঠাৎ ফেঁপে ওঠার কোনো লক্ষণই চোখে পড়েনি। কিন্তু তাঁদের গলির মোড়ের ঐ বাবুলাল সাধুখাঁ? এই সেদিনও খোলার ঘরের মাটির দাওয়ায় বসে ষ্টীলের পেয়ালায় চা খেত। যুদ্ধের বাজারে লোহার দৌলতে ক'মাসের মধ্যে আঙুল ফুলে কলাগাছ। তিনতলা বাড়ি, দু'খানা গাড়ি। একটা মেয়ের বিয়েতেই কর্ম করে তিরিশ হাজার টাকা খরচ করেছে। আরো তিনটি বাকী। কালো টাকা না হলে এমন করে রাতারাতি লাল হওয়া যায় না। আর, তার মসৃণ-পথ যদি কোথাও খোলা থাকে সে হচ্ছে ঐ ব্যবসা।

সে যা-ই হোক, নিউ সাউথ পার্কের বাড়িগুলোর পিছনে কালো বা সাদা যে-টাকাই থাক, অঞ্চলটা স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই ভালো লেগেছিল, এবং কয়েকদিন ঘোরাঘুরির পর ওখানেই একটা ছোট ফ্ল্যাট পেয়ে গিয়েছিলেন। খাস কোলকাতার বন্ধুবান্ধব আত্মীয়েরা বিশেষ উৎসাহ দেননি, কেউ কেউ বরং এদিকে না আসতেই পরামর্শ দিয়েছিলেন। একজন বলেছিলেন, খুব খোলা-মেলা তো বুঝলাম, কিন্তু শুধু আলো আর হাওয়া খেয়ে যেমন পেট ভরে না, তেমনি মনও ভরে না। কথা বলবার মতো দুটো একটা মানুষের মুখ দেখতে না পেয়ে প্রাণটা যখন হাঁপিয়ে উঠবে, তখন করবে কি?

যা মনে করছেন, তা নয়, বক্তার ভুল ধারণাটা শুধরে দিতে চেয়েছিলেন মালতী, চারদিকে অনেক বাড়ি উঠে গেছে এর মধ্যে। মানুষ-জনেরও অভাব নেই।

মানুষ! ভুল করছ। ওরা মানুষ নয়, 'মামী'। তোমার দিকে ড্যাব্ড্যাব করে তাকিয়ে দেখবে, কথা বলবে না।

বেশ তো, আপনারা যাবেন মাঝে মাঝে। ছুটিছাটা দেখে

আমরাও আসবো।

একজন প্রৌঢ়া আত্মীয়াকে অমনি মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসবার অনুরোধ করতেই তিনি চমকে উঠেছিলেন, ও সর্বনাশ! সে-তো শুনছি অনেক দূর। একদিনে ফিরে আসা যাবে তো?

খাস কোলকাতার এই নিজস্ব রূপটি মালতীর আগে থেকেই চেনা। শ্যামবাজার-বাগবাজার-দর্জিপাড়া-হাটখোলা নিয়ে এদের জগৎ। তার বাইরেটা এদের কাছে দুস্তর ও দুর্গম। সেখানে যেতে হবে শুনলেই চোখে-মুখে এমনি আতঙ্ক ফুটে ওঠে।

প্রৌঢ়ার কথায় কৌতুক বোধ করেছিলেন মালতী। বলেছিলেন, একদিন কেন, এক বেলাতেই ফেরা যায়। আর না গেলেই বা কী? একটা দিন না হয় থেকেই এলেন আমাদের কাছে। জলে তো আর পড়বেন না। জঙ্গলের ভয়ও নেই।

কি জানি বাপু, বাবার বয়সে ওসব জায়গা কখনো দেখিনি, নামও শুনিনি।

বাইরে থেকে যতটা শুনেছিলেন, এ-পাড়ায় এসে দেখলেন, তার কিছুটা অমূলক এবং অনেকখানিই অতিরঞ্জিত। ওরা যাদের 'মামী' বলেছিলেন, পুরনো কোলকাতার অলিগলিতেও তাদের অভাব নেই। বছরের পর বছর ধরে, অনেক ক্ষেত্রে হয়তো বংশপরম্পরায়, প্রতিবেশীর সঙ্গে তাদের একমাত্র সংযোগ ঐ দৃষ্টির লেহন। তার সম্পর্কে কৌতূহলের অন্ত নেই। হাঁড়ির খবর নেবার দিকেও প্রবল আগ্রহ, কিন্তু রসনার অর্গল কখনো খোলে না।

এই চাপা-ওষ্ঠ এবং চক্ষুদ্বারা-লেহনকারী বিচিত্র জীবটি নতুন গড়ে-ওঠা দক্ষিণের বিশেষ দান নয়, এই মহানগরীর সাধারণ ফসল। কোলকাতার জল-হাওয়ায় আপনা থেকে জন্মায়, অঞ্চল ভেদে উৎপাদনের হার কিছুটা বেশী-কম, এই পর্যন্ত। কোনো পাড়ায় এদের নাম 'স্নব', কোনো পাড়ায় 'উন্নাসিক'। আখ্যা দুটো উত্তর দক্ষিণ নির্বিশেষে অনেকের সম্বন্ধেই খাটে।

মুখ-না-খোলার একটা কারণ যে ঐ জাতীয় মনোভাব, সেটা অবশ্যই স্বীকার্য, কিন্তু একমাত্র কারণ নয়। দেখা গেছে, অনেক ক্ষেত্রে আসল বাধা হলো, ইংরেজিতে যাকে বলে ব্রেক দি আইস— কে আগে এগিয়ে আসবে, কার ঠোঁট আগে খুলবে। বরফ ভাঙার দুরূহ কাজটি দু'পক্ষের কেউ একবার করে ফেললেই আলাপ-সালাপ, মেলামেশার দরজা খুলে গেল। পরের ধাপগুলো তখন সহজ ও স্বচ্ছন্দ।

তবে একথা নিশ্চয় মানতে হবে, মেলামেশার প্রবৃত্তিটা সমাজের সব স্তরে সমান নয়। যতক্ষণ মাটিতে দাঁড়িয়ে আছি, আমি আমার আশ-পাশ থেকে আলাদা নই, অন্ততঃ মনে হবে না, আমি আলাদা। উঁচুতে উঠলেই অনুভব করি, আমি সকলের থেকে স্বতন্ত্র। যত উপরে উঠব, ততই সে স্বাতন্ত্র্য-বোধ প্রবল হয়ে উঠবে। এটা প্রাকৃতিক নিয়ম। সামাজিক নিয়মও মোটামুটি তাই।

ছোট দোতলা বাড়ির উপরের ফ্ল্যাটটি মালতীদের। একতলার সামনের দিকে পাশাপাশি দুখানা দোকান ঘর, পিছনের বাকী অংশটা নিয়ে আছেন বাড়ির মালিক, অর্থাৎ ল্যাণ্ড-লর্ড, যদিও চেহারায় বা জীবনযাত্রার লর্ড-শিপের কোনো লক্ষণ নেই। পৈতৃক বাড়ি ছিল মেডিক্যাল কলেজের পশ্চিমে একটা কোন্ গলির মধ্যে। সারাজীবন রেল অফিসে চাকরি করেছেন। শুরু করেছিলেন কনিষ্ঠ কেরাণী হয়ে, যখন শেষ করেন তখনো বড় বাবুর গদি পর্যন্ত উঠতে পারেন নি। বুড়ো বয়সে অবসর নেবার পর দেখলেন, বাড়িটার অবস্থাও অবসর নেবার মতো। ছাত জীর্ণ, দেয়ালে বড় বড় ফাটল, জানালার খড়খড়িগুলো মাঝে মাঝে উধাও, বারান্দার রেলিং ভেঙে পড়ছে।

পেন্‌সেন্ নেই। সম্বলের মধ্যে প্রভিডেণ্টফাণ্ডের কয়েক হাজার টাকা। তা দিয়ে মেরামতের কাজটা চলে যেতে পারে। কিন্তু তারপর? মাথার উপর একটা আশ্রয় হলেই তো চলে না, তার সঙ্গে পেটে পুরবার মতো কিছু আহারও চাই। সেটা আসবে কোথেকে? বাকী জীবনের মতো ঐ পুঁজিটুকুই ভরসা। ছেলে নেই, তিনটি মেয়ে।

বড় দুটি আগেই কোনো রকমে পার করেছেন। ছোটটি এখনো ঘাড়ে। তার উপরে নিজেরা দু'জন এবং ফাউ হিসাবে একটি বাপ-মা-মরা ভাগ্নে।

ধার-দেনাও ছিল কিছু কিছু। সব তাকিয়ে আছে ফাণ্ডের ঐ নোট ক'খানার দিকে। তাই হাতে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলো চোখ বুজে পোষ্ট অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। একপাশে পাস বই আর একপাশে একটুকরো সাদা কাগজ নিয়ে যখন বসে বসে হিসাব করছেন, কোন্ দাবিটা আগে আর কোন্ দাবিটা পরে মেটানো যায়, কোন্ দফায় কী পরিমাণ অঙ্কপাত করলে মাথাটাও বাঁচে, সেই সঙ্গে আসন্ন অনশনের কবল থেকেও বাঁচা যায়, তখন নিতান্ত দৈবক্রমে একখণ্ড ছাপানো কাগজ এসে তাকে এই দুটো সমস্যা থেকেই বাঁচিয়ে দিয়ে গেল।

নোটিসটা যখন পেলাম, বুঝলেন, মিসেস রুদ্র, বিশ্বনাথ সরকার তাঁর নিজের ফ্ল্যাটে বসে শোনাচ্ছিলেন মালতীকে, বার বার পড়েও মানে বুঝতে পারি না। মানেটা যখন কোনো রকমে বোঝা গেল, তখনো বিশ্বাস করতে পারছি না যে আমার এই ভাঙা বাড়ির জন্যে এত টাকা দিতে চাইছে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট্! কী করবে? ওদেরও যে গরজ। মস্ত বড় রাস্তা বেরোচ্ছে। চৌরঙ্গী থেকে বাগবাজার। অনেক বাড়ি ভাঙতে হবে। বড় বড় বাড়িওয়ালারা তো বসে পড়ল। তাদের চেষ্টা হলো নোটিস কী করে রদ্ করানো যায়। কেউ মোটা টাকা দাবি করে বসল, কেউ বাপ-দাদার আমলের ঠাকুর-দালান ভাঙা চলবে না বলে আপত্তি জানাল। ধর-পাকড়, তদ্বির-তদারক কী রকম চলল, সে-তো বুঝতেই পারছেন। শুনছি, আর ভয় হচ্ছে - এদের চাপে পড়ে স্কিমটাই না বন্ধ হয়ে যায়। এ-আমল হলে কী হতো বলা যায় না। ভাগ্যিস সেটা ইংরেজের আমল। বন্ধ হলো না।'

তখন এখানটায় ছিল ফাঁকা মাঠ, কাঁটা-ঝোপ, আর মাঝে

মাঝে ডোবা। নতুন টাউনশিপ তৈরী হচ্ছে শুনে খোঁজ-খবর নিয়ে হাতে যা ছিল তাই দিয়ে কিনে ফেললাম চার কাটা। খুব সুবিধে দরেই পেলাম। তারপর ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের টাকাটা হাতে আসতেই শুরু করলাম বাড়ি। মাল-পত্তর হাতের কাছেই পাওয়া গেল। কণ্ট্রোল-ফণ্ট্রোলের বালাই তখন ছিল না। বিশেষ কোনো বেগ পেতে হয়নি।

উনি কিন্তু বারণ করেছিলেন, (গৃহিণীকে দেখিয়ে দিলেন), আমি শুনিনি। নিজের চোখেই তো দেখলাম, এই সেদিন পর্যন্ত রাসবিহারী এ্যাভিনিউ আর তার আশপাশ জুড়ে ছিল শুধু ধানক্ষেত আর বড় বড় পুকুর। ক'টা বছরের মধ্যে কি হয়ে গেল! তেমনি এ জায়গাও পড়ে থাকবে না। এখন দেখুন।

বেশ গর্বের সঙ্গে বাইরের দিকটা দেখিয়ে দিলেন বিশ্বনাথবাবু, যেন এই দ্রুত উন্নতির পিছনে যে কৃতিত্ব, সবটুকু না হলেও, অনেকখানি তাঁর।

উনি যাই বলুন, যোগ করলেন সরকার গৃহিণী, আমার কিন্তু বড্ড ভয় ছিল মনে। ঝোঁকের মাথায় হুট্ করে কিনে তো বসলেন এতটা জায়গা, যদি লোকজন না আসে, পাশে বাড়ি-ঘর না ওঠে, এই মাঠের মধ্যে থাকব কেমন করে? জানো ভাই, একতলাটা খাড়া হতেই আমরা যখন উঠে এলাম, তখন ঐ রান্নাঘরের পেছনে শেয়াল ডাকত। ঐ দূরে দূরে দু-একখানা করে বাড়ি উঠছে। দিনের বেলা যদি-বা দু-চারটে মানুষজনের মুখ দেখা যায়, সন্ধ্যা হতে না-হতেই রাস্তা-ঘাট একেবারে ফাঁকা। তাছাড়া কি অন্ধকার? লাইট তো এল এই সেদিন। তার ওপরে আরেক বিপদ—ফী-রাতে চুরি। ঠাকুরের আশীর্বাদে আমাদের অবিশ্যি কিছু নেয়নি।

নেবার মতো কিছু পেলে তো নেবে।

শোন কথা, স্বামীর মন্তব্য শুনে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানালেন সরকার-জায়া, আর কিছু না থাক, দু-একখানা জামা-কাপড় কি

দু-চারটে ঘটি-বাটীও তো নিতে পারত। সেও কি কম নাকি? গেরস্তের ঘরে যা যায় তাতেই লোকসান। কি বল?

সে তো নিশ্চয়ই, সমর্থন জানালেন মালতী. এখন বোধ হয় আর সেসব ভয় নেই?

না, এখন আর শুনতে পাই না। দেখতে দেখতে কত বাড়ি উঠে গেল। চারদিকে লোকজন গিজ-গিজ করছে।

গিজ-গিজ করছে না আরো কিছু। সরকারদের ছোট মেয়ে অঞ্জলি চুপ করে ছিল, এবার আর না বলে পারল না। সন্ধ্যে হতে-না-হতেই মনে হবে মাঝরাত। রাস্তাগুলো খাঁ-খাঁ করছে। ধারে কাছে না আছে একটা সিনেমা, না আছে দুটো দোকান-পশার। এর চেয়ে গাঁয়ে গিয়ে থাকলেই হয়। আচ্ছা, বলুন তো মাসীমা, এখানে কারো মন টেকে?

আমার সুবীরও ঠিক ঐ কথা বলে, সস্নেহ প্রশ্রয়ের সুরে বললেন মালতী, একদণ্ড বাড়ি থাকতে চায় না। এখন থেকেই ছটফট করছে, একটা বছর কবে কাটবে, তারপরেই শিবপুরে গিয়ে ভর্তি হবে।

ওখানে কোথায় থাকবে?

হস্টেল আছে। সব ছেলেকেই সেখানে থাকতে হয়।

বিশ্বনাথবাবু বললেন, ও! ও বুঝি বাবার মতো ইঞ্জিনীয়ার হবে?

ওঁর তো তাই ইচ্ছে। ছেলের নিজেরও ভীষণ পছন্দ। আমার কিন্তু ও-সব লাইন একেবারেই ভালো লাগে না। বাড়ির প্রথম ছেলে। আমার ইচ্ছে ছিল, লোহালক্কড় না ঘেঁটে লেখাপড়া শিখুক।

বিশ্বনাথ হেসে ফেললেন, ও-সব বিদ্যা বুঝি আপনি লেখাপড়ার দলে ফেলেন না? অবিশ্যি, সেই ধারণাই ছিল আমাদের দেশে। এখন সব পাল্টে গেছে। সায়েন্সের যুগ। ঠিকই করছেন সুহৃদবাবু। করে খেতে হলে টেকনিক্যাল লাইন ছাড়া উপায় নেই। বি. এ. এম.এ. পাস করে কী করবে?

ছোটটার ঝোঁক আবার সেই দিকে। ইংরিজীতে এম. এ. পাস করে প্রফেসার হবে, রিসার্চ করবে। আপনাদের আশীর্বাদে পড়াশুনোয় ভালো। তার ওপরে আরেক বিত্তে আছে।

সকলেই উৎসুক হলেন, সেটা আবার কী ?

মালতী সগর্ব হাসির সঙ্গে বললেন, পদ্য লেখে।

তাই নাকি ! হো-হো করে হেসে উঠলেন বিশ্বনাথবাবু, তা লিখুক। ও-সব অভ্যেস এই বয়সে অনেক ছেলেরই থাকে। বড় হলে আপনিই কেটে যায়। আমাকেও একদিন ঐ রোগে ধরেছিল।

ওমা, তা তো শুনিনি, উচ্চকণ্ঠে বিস্ময় প্রকাশ করলেন সরকার-গৃহিণী, তুমি পদ্য লিখতে !

তোমার তো বিশ্বাস আমি জন্ম-কেরাণী, চিরকালই এমনি কাট-খোট্টা। তা নয়, এ শর্মার মনেও একদিন কিছুটা রসকস ছিল।

হাসিচ্ছলে বললেও, শেষের দিকে কোথায় যেন একটু ক্ষোভের স্পর্শ লুকিয়ে ছিল।

গৃহিণী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চোখ দুটো টান করে টেনে টেনে প্রশ্ন করলেন, তা গেল কোথায় ?

এর মধ্যে যে একটি ব্যঙ্গের সুর মেশানো ছিল, সেটা কারো কাছেই অস্পষ্ট রইল না।

উত্তর দিতে গিয়ে একটা গভীর নিশ্বাস ফেললেন বিশ্বনাথ সরকার। —কোথায় গেল, তা কি ছাই আমিই জানি ? ইস্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকতেই বাবা মারা গেলেন। ঘাড়ে চাপল সংসার। তারপর থেকেই চলছে একটানা ঘানির পাক।

ডান হাতের তর্জনী ঘুরিয়ে সেই 'পাক'-এর একটা ইঙ্গিত দিয়ে হাসবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু হাসিটা ঠিক ফুটল না, কেমন একটা বিকৃত কুঞ্চন দেখা দিল ঠোঁটের কোণে।

মালতী একটু অস্বস্তি বোধ করলেন। ভাবলেন, এবার ওঠা

দরকার। তারই উদ্যোগ করতে গিয়ে মহিলাটির দিকে নজর পড়তেই তাঁর বিস্ময়ের অবধি রইল না। সারা মুখে কে যেন একরাশ বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণার বিষ মাখিয়ে দিয়েছে। কণ্ঠস্বরেও তার ঝাঁঝটা চাপা রইল না, না করলেই হতো সংসার। কেউ তো আর পায়ে ধরে সাধাসাধি করতে যায়নি।

বিশ্বনাথবাবু একটু ঝিমিয়ে পড়েছিলেন। স্ত্রীর বচনস্পর্শে হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠলেন। কী একটা বোধহয় বলতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই মালতী উঠে দাঁড়ালেন। বিনীত কৈফিয়তের সুরে বললেন, এখনকার মতো তাহলে চলি, দিদি। মেয়েটার ফেরবার সময় হল। অবসর মতো আপনি একবার যাবেন।

সরকার-জায়া ততক্ষণে নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়েছিলেন। বললেন, যাবো বৈকি। তবে, দেখতেই তো পাচ্ছ, জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ—সব এই এক হাতে। মরবো যে সে ফুরসৎটুকুও নেই।

অঞ্জলি আগেই কখন উঠে চলে গিয়েছিল।

মালতীকে উঠতে দেখে ওদিকের একটা ঘর থেকে হাসি মুখে বেরিয়ে এলো। তার দিকে নজর পড়তেই গৃহিণী বলে উঠলেন, ঐ অত বড় মেয়ে, কুটোটি ভেঙে দুখানা করবার নাম নেই।

মেয়ে যেন শুনতে পায়নি এমনিভাবে মালতীর কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, আবার আসবেন, মাসিমা।

আসবো বৈকি। তুমিও যেও। দিদি নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন। তোমার তো অনেক সময়। যখন খুশি চলে আসবে।

বিশ্বনাথবাবুও ওঁদের পিছনে পিছনে আসছিলেন। নিচের ফ্ল্যাট থেকে উপরে উঠবার সিঁড়ির মুখে একটা দরজা আছে। মেয়েদের যাতায়াতের সময় খুলে দেওয়া হয়, অন্য সময় বন্ধ থাকে। মালতী যখন সিঁড়িতে পা দিতে যাবেন, তিনি একটু এগিয়ে এসে নমস্কার করে বললেন, আপনার কোনো অসুবিধা নেই তো?

না, অসুবিধা আর কি?

কোনো কিছুর দরকার হলে বলবেন।

বলবো বৈকি? আপনাদের আশ্রয়ে এসে উঠলাম। দরকার পড়লেই এটা-সেটা নিয়ে জ্বালাতন করতে হবে।

একশ' বার করবেন। আমি তো সেই প্রথম দিনই বলে রেখেছি, আমি ল্যাণ্ড-লর্ড আর আপনারা আমার টেনাণ্ট—এটা আমিও মনে করি না আপনাদেরও ভুলতে হবে। আমরা প্রতিবেশী। নেক্সট্ ডোর না বলে বলতে পারেন নেক্সট্ ফ্লোর নেবার্স।

বলে, উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন বিশ্বনাথবাবু। মালতীও এই সম্পর্কের স্বীকৃতিস্বরূপ একটা সময়োচিত জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ মহিলাটির দিকে চোখ পড়তেই থেমে গেলেন এবং কেবলমাত্র একটি বিনীত নমস্কার জানিয়ে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন।

দুই

বাড়ির গা ঘেঁসে চার ফুট চওড়া প্রবেশপথ। তা দিয়ে কয়েক পা গেলেই দোতলার ফ্ল্যাটে উঠবার দরজা। দেয়ালের গায়ে ইলেকট্রিক বেল-এর সুইচ। টিপতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই কপাট ছুটো খুলে গেল। সুহৃদ খুশি ও চমক মেশানো সুরে বলে উঠলেন, তুমি!

মালতী সে-কথার জবাব দিলেন না। স্বামীর শ্রান্ত মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে বললেন, এত দেরি হল যে?

চল, বলছি। তুমি কোথাও বেরোচ্ছিলে নাকি?

বেরবো আর কোথায়? দেখছিলাম, বিশ্বনাথবাবুকে বলে কোনো জায়গা থেকে যদি একটা ফোন করানো যায়। সেই তখন থেকে যাবো-যাবো করছি আর ভাবছি, আর একটু দেখি।

স্বর নামিয়ে মৃদু হেসে যোগ করলেন, ওঁকে আবার কোনো কিছু বলতে যাওয়াও মুশকিল।

কেন, বিরক্ত হয় বুঝি বুড়ো? কিন্তু কথাবার্তায় তো তা মনে হয় না।

না, না, উনি মোটেই বিরক্ত হন না, বরং খুশি হন। গিন্নীটি করেন কেমন-কেমন করে।

সুহৃদ এগিয়ে গিয়েছিলেন। পিছন ফিরে সকৌতুক দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন। কিছুক্ষণ তাকিয়েও রইলেন। ধীরে ধীরে চোখের রূপ বদলে গেল। একটা কোনো দূরাগত আলো এসে পড়ল তার উপর। অনেক দিন পরে যেন প্রথম দেখলেন স্ত্রীকে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। বয়স? তা হলো বৈকি তিনটি সন্তানের মা। বড়টি বাইশ পেরিয়ে তেইশে পা দিয়েছে। তার মানে কয়েক মাস পরেই চল্লিশে পড়বে মালতী। কিন্তু মুখের রেখায়, চোখের তারায়, দেহের বাঁধুনিতে কোথাও তার ছাপ পড়েনি। আঁট-সাঁট দোহারা গড়ন। একটু হয়তো ভারী হয়েছে আগের চেয়ে, কিন্তু কোথাও কোনো অনাবশ্যক মেদভার দেহের সাম্য ও সৌষ্ঠব নষ্ট হতে দেয়নি।

কী দেখছ অমন ড্যাব-ড্যাব করে? তাড়া দিয়ে উঠলেন মালতী। স্বামীর একাগ্র মুগ্ধ চোখ দুটির দিকে চেয়ে তাঁর চোখেও একটি মধুর লজ্জার স্নিগ্ধ ছায়া ফুটে উঠল।

সুহৃদ নিজেকে সামলে নিলেন। হালকা সুরে বললেন, দেখছি, কর্তার খুশি দেখে গিন্নী যদি একটু কেমন-কেমন করেন, তাকে দোষ দেওয়া যায় না।

কী যে বল তার ঠিক নেই। বাপের বয়সী বুড়ো মানুষ।

আহা, ওঁর কথা কে বলছে? বেচারা সত্যিই বড় ভালো মানুষ। মনটাও ভদ্র। আমাদের একটু উপকার-টুপকার করতে পারলে খুশি হন। কিন্তু জায়গা বিশেষে একজনের খুশি যে আরেক জনের জ্বালা, এসব সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলো হয়তো বুঝতে পারেন না। সে যাকগে। ভদ্রলোককে দৌড় না করিয়ে ভালোই করেছ। ফোন্ করে আমাকে পেতেন না।

অফিসে ছিলাম না তো।

কোথায় গিয়েছিলে ? যাক, সেসব পরে শুনবো। জামা-কাপা ছেড়ে আগে কিছু খেয়ে নেবে চলো।

উপরে উঠেই স্বামীর হাত থেকে টুপিটা নিয়ে র‍্যাকে ঝুলিে দিলেন। তারপর রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে বললেন, চট্ কে মুখ-হাত ধুয়ে নাও। আমি চায়ের জল চড়িয়ে দিচ্ছি।

সুহৃদ এদিক-ওদিক চেয়ে কারো সাড়া-শব্দ না পেয়ে বললেন এরা সব কোথায় গেল ?

কেউ বাড়ি নেই। রান্নাঘর থেকেই জবাব দিলেন মালতী খুকু পাড়াতেই এক বন্ধুর বাড়ি গেছে, আর সুনুর কোথায় মিটি আছে। বলে গেছে ফিরতে একটু দেরি হবে।

এই শেষের খবরটায় সুহৃদ মনে মনে আবার একটু অপ্রসন্ন হয়ে উঠলেন। পাছে মুখেও তার ছায়া পড়ে, মালতী দেখতে পায়, তাই তাড়াতাড়ি স্নানের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

তুটি ছেলের কে কোন্ দিকে যাবে, সে সম্বন্ধে তাঁর মনে একট পরিকল্পনা ছিল। বড়টির বেলায় সেটা সফল হয়েছে। সুবীর এঞ্জিনিয়ার হবে—মেকানিকাল এঞ্জিনিয়ার, এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। সেই ইচ্ছা পূরণ করেছে। খুব ভালো ভাবে পাস করেছে শিবপুর থেকে। ব্যবহারিব দিকটায় যাতে আরো দক্ষ এবং অভিজ্ঞ হয়ে উঠতে পারে সেই উদ্দেশ্যে সুহৃদ কোনো বন্ধুর আনুকূল্যে তাকে একটি প্রসিদ্ধ ফার্মে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। আপাতত শিক্ষানবিশ. একটা অ্যালাউন্স পায় কোলকাতা থেকে শ'দেড়েক মাইল দূরে বিরাট কারখানা। সেখানে অ্যাপ্রেন্টিস্‌দের জন্যে নির্দিষ্ট মেস-এ থাকে, ছুটির দিনে মা-বাবার কাছে আসে। এদিকে তার মেধা আছে, আগ্রহ আছে এবং খাটতে পারে। সুতরাং ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত। সুহৃদও তার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত

ছোট, সুনীতও এই লাইনে যাক, মেকানিক্যাল না হলেও

সিভিল কিংবা ইলেকট্রিক্যাল—গোড়ার দিকে মনে মনে তা-ই চেয়েছিলেন। কিন্তু তার গড়নটা খুব মজবুত নয়, স্বাস্থ্যও একটু দুর্বল। তার চেয়েও বড় কথা, মালতীর ইচ্ছা নয়, দুটি ছেলেই এক দিকে যায়। কারিগরি-শিক্ষাকে সে যে সুনজরে দেখে না, স্পষ্ট ভাবে না বললেও সুহৃদের অজানা ছিল না। তাই ওদিকে জোর না দিয়ে ভেবে রেখেছিলেন, ওকে কমার্স কিংবা অ্যাকাউন্ট্যান্সি পড়াবেন। সুদক্ষ এঞ্জিনিয়রের মতো পাকা অ্যাকাউন্টান্টেরও যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে দেশে, ক্রমশ আরো বাড়বে। এ ছেলে বড়টির চেয়ে আরো মেধাবী। ভালো ভাবেই দাঁড়িয়ে যাবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রথম দিকে, অর্থাৎ শিক্ষানবিশির স্তরটা পার হয়ে দু'জনেই যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি করতে থাক। তারপর হয়তো আর দরকার হবে না। সুহৃদের মনের তলায় আরেকটা গোপন পরিকল্পনা ছিল। তখনো সেটা দানা বেঁধে ওঠেনি। যখন উঠবে, দুটি ছেলেকেই তাঁর প্রয়োজন হতে পারে।

মেয়ের সম্বন্ধে ভাববার কিছু ছিল না। সে মেয়ে, এবং সকলের ছোট। বড় হোক, আরো কিছু লেখা-পড়া শিখুক। তারপর সব দিক দেখে-শুনে, স্বাস্থ্যবান, চরিত্রবান, বিনয়ী এবং মোটামুটি ভালো রোজগার করে, এমনি একটি ছেলের হাতে সঁপে দেওয়া। সেদিকে বিশেষ কোনো সমস্যা নেই। শিখা, রূপেও শিখা। তার উপরে আর যেটা প্রয়োজন, তার ব্যবস্থাও মেয়ের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে করে রাখা হয়েছে। একটি পাঁচ অঙ্কের পলিসি। শিখা আঠারো পেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই তার মেয়াদ শেষ হবে।

এমনি একটা খসড়া ছবি মনের পাতায় এঁকে রেখেছিলেন সুহৃদ রুদ্র। তার উপরে ভিত্তি করে পাকা-নকশা অর্থাৎ ব্লু-প্রিন্ট তুলতে গিয়ে প্রথম অদল-বদলের প্রয়োজন হলো ছোট ছেলের বেলায়। তার জন্যে যে-জায়গাটা চিহ্নিত করে রেখেছিলেন, সেখানে তাকে

বসানো গেল না। স্কুলের নিচু ক্লাস থেকেই অঙ্ক দেখলে তার জ্বর আসে। অন্য সব বিষয়ে, বিশেষ করে ইংরেজী ও বাংলায় নম্বর ওঠে আশি-নব্বই, অঙ্কের খাতায় তিরিশ ওঠাতেই টানাটানি। ঐ দিকে বিশেষ নজর দিলেন সুহৃদবাবু। অঙ্কের জন্যে অভিজ্ঞ টিউটর নিযুক্ত করা হলো, কিন্তু কাজ যা হলো, সামান্য। কোনো রকমে পাসের নম্বর রাখতে হলে যেটুকু দরকার তার বেশী মনোযোগ এই ছাত্রটির কাছ থেকে তার মাস্টার মশাই কিছুতেই আদায় করতে পারলেন না।

সুহৃদ দেখলেন, সুনীতের অঙ্কে যেমন প্রচণ্ড বিরাগ, সাহিত্যে তেমনি প্রবল অনুরাগ। তার উপরে শুনলেন, ছেলে নাকি কবিতা লেখে! অন্য সকলের মতো ব্যাপারটাকে মোটেই হালকা ভাবে নিতে পারলেন না। ভালো কেরিয়ারের পক্ষে এটা যে একটা বড় রকমের অন্তরায়, সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল না। এই ব্যাধির হাত থেকে কী করে ছেলেটাকে বাঁচানো যায়, কোন্‌দিকে কতটা কড়া হওয়া দরকার, এই সব কথা যখন ভাবছেন, তখন হঠাৎ লক্ষ্য করলেন, এ ব্যাপারে তিনি যতই চিন্তিত এবং শঙ্কিত হোন না কেন, ছেলের মা অত্যন্ত খুশি। এই কাব্যানুশীলনের পিছনে মালতীর রীতিমতো প্রশ্রয় আছে। ছেলে তার কবি হবে, সাহিত্যিক হবে— এটা শুধু তার আনন্দ নয়, গর্ব। এরপর একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে চুপ করে যাওয়া ছাড়া সুহৃদ রুদ্র আর কোনো পথ দেখতে পেলেন না।

স্ত্রী এবং কনিষ্ঠ পুত্রের উপর খানিকটা অনুকম্পা বোধ করলেন। এমন সব অসার জিনিসের মধ্যে এরা কী পায় কে জানে?

সুনীত ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাস করল। প্রথম শ্রেণীতে যেতে না পারলেও—তার কারণ বোধহয় সাহিত্য-চর্চা এবং সাহিত্য-বিষয়ক সক্রিয়তা—দ্বিতীয় শ্রেণীর বেশ উপরের দিকেই স্থান পেল। তার মধ্যেই তার সাহিত্য-কর্ম কলেজ-

ম্যাগাজিন এবং আঞ্চলিক পত্র-পত্রিকার সীমানা পার হয়ে দু-একখানা নামী কাগজের সম্পাদকের দাক্ষিণ্য লাভ করেছে। একটি ভক্তগোষ্ঠীও গড়ে উঠেছে তার চারদিকে। সেই সঙ্গে দু'চারটি সাহিত্য-সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটেছে। এখানে ওখানে নানা উপলক্ষ্যে তাদের ফাংশান বা অনুষ্ঠান লেগেই আছে। সুনীতকে বাদ দিয়ে সেগুলো চলে না।

সুহৃদ এ জগতের খবর রাখেন না। সাহিত্যিক পুত্রের কৃতিত্ব সম্পর্কেও তাঁর উৎসাহ অতি অল্প। মাঝে মাঝে কানে আসে।

মালতী কিংবা শিখার মুখে হঠাৎ কখনো শুনতে পেলেন অমুক কাগজে সুনীতের একটা ছোট গল্প বেরিয়েছে, অমুক সভায় সে স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনাবে, ইত্যাদি। সুহৃদ মুখে বলেন, 'বেশ' কিন্তু মনটা ভিতরে ভিতরে বিষণ্ণ হয়ে ওঠে—ছেলেটাকে মনের মতো করে গড়ে তুলতে পারলেন না। কখনো কখনো তার এবং সেই সঙ্গে মালতীর উপরেও বিরূপ হয়ে ওঠেন। তারপর নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করেন, সংসারে সব কিছুই যে তাঁর ইচ্ছা বা পছন্দ মতো ঘটবে অতটা আশা করা উচিৎ নয়। তিনি তো চেষ্টার ক্রটি করেননি। তা সত্ত্বেও যদি সে অন্য দিকে চলে যায়, তিনি আর কি করতে পারেন? এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করা মানে তাঁর এই ছোট্ট সুখের সংসারে অশান্তি সৃষ্টি করা। ও যা করছে করুক। তবে, সাহিত্যের উৎপাতে এম. এ. পরীক্ষার ফলটা যেন খারাপ না হয়, সেদিকে ওদের প্রায়ই হুঁশিয়ার করে দিয়ে থাকেন।

স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে মাথায় তোয়ালে ঘষতে ঘষতে সেই কথাটা আবার মালতীকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, মিটিং-ফিটিং তো খুব হচ্ছে শুনি, আসল ব্যাপারটায় খেয়াল আছে তো? পরীক্ষা তো এসে গেল।

কারিগরি বিদ্যার বাইরে আর কিছুর উপরেই যে তাঁর স্বামীর আস্থা নেই, বিশেষ করে সাহিত্য নামক বস্তুটি যে তাঁর দু'চক্ষের বিষ,

মালতী সেটা বিলক্ষণ জানেন এবং তার জন্যে কৌতুক অনুভব করেন। তাঁর ঐ 'মিটিং' কথাটার মধ্যে যে ঝাঁঝ ছিল সেটা তিনি মনে মনে উপভোগ করলেন। হাসিমুখে বললেন, আছে গো আছে। এবার ও খুব মন দিয়ে পড়ছে। সবাই আশা করছে, ফার্স্ট ক্লাস পাবে। এখন শরীর গতিক ভালো থাকলে হয়।

কি জানি? আমি তো ওসব দিকে যাকে বলে একেবারে কাহিল। খোকার বেলায় তবু বুঝতে পারতাম কদ্দূর কী করছে। একজন প্রফেসর-ট্রফেসর রাখা দরকার মনে কর?

এখন কোনো দরকার নেই। হলে ও নিজেই বলবে।

হ্যাঁ, যেন সময় মতো বলে, তাই দেখো। আমি তো আর কিছু দেখতে-টেখতে পারছি না, এখন তো আরো পারব না।

দুটি জিজ্ঞাসু চোখ স্বামীর পানে তুলে ধরলেন মালতী। হয়তো মুখেও জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলেন, না পারবার বিশেষ কারণ কী ঘটল। তার আগেই সুহৃদ বলে উঠলেন, তোমার চায়ের কদ্দূর?

এই তো হয়ে গ্যাছে। তুমি এসো না।

বাড়িটা দক্ষিণমুখী। সকলের পিছনে রান্নাঘর। তার কোলে বারান্দা। ভাঁড়ার হিসাবে ব্যবহারের জন্যেই তৈরী করেছিলেন বিশ্বনাথবাবু। মালতীদের আগে যে ভাড়াটে ছিল, তারাও একে সেই কাজে লাগিয়েছিল। মালতী ওরই মধ্যে একটা সুন্দর ঢাকনা-ঢাকা ডিম্বাকার টেবিল আর তার চারদিকে খানচারেক সুদৃশ্য চেয়ার বসিয়ে ওকে একটি আধুনিক ধরনের ডাইনিং রুমের মর্যাদা দিয়েছিলেন। দু'পাশের দেয়ালে গোটা কয়েক তাক ছিল। তেল-ঘি এর ছোপ, ঝোলাগুড়ের ছাপ এবং ডাল-মসলার ধুলোর তলায় তাদের আসল রংটা যে কি, বোঝা যেত না। রুদ্র গৃহিণী সেগুলোকে ঘষে-মেজে নতুন রঙের পোষাক পরিয়ে জাতে

তুলেছিলেন। তার সঙ্গে নানা ধাঁচের মানানসই কাঁচ এবং চীনা মাটির বাসন-কোসন সাজিয়ে গোটা ঘরখানার চেহারা একেবারে পাল্টে ফেলেছিলেন।

ঘষা-মাজা, সাজানো-গোছানোর পালা যদ্দিন চলছিল, মালতী কাউকে কিছু জানতে দেননি, ঘরটাও বন্ধ করে রাখতেন। সব কিছু শেষ হলে সবাইকে ডেকে হঠাৎ তাক লাগিয়ে দেবেন, এই ছিল তাঁর মতলব। মেয়ে এবং ছেলেদের বেলায় সেটা পারেননি।

সারা দুপুর দরজা বন্ধ করে মা ওখানে কী করেন, সে রহস্য তারা আগেই ভেদ করে ফেলেছিল এবং ব্যাপারটা আবিষ্কার করবার পর হাতে-হাতে মাকে খানিকটা সাহায্যও করেছিল। চমকটা তোলা ছিল সুহৃদের জন্যে। তিনি সত্যিই চমৎকৃত হয়েছিলেন। তখন ঘরে আর কেউ ছিল না। চারদিকে চেয়ে সব জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে যেন নিশ্চিন্ত হয়েছেন, এমনি ভাবে বলেছিলেন, যাক্, একটা ভাবনা গেল।

কিসের? বেশ খানিকটা অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন মালতী।

উটকো লোক আর খুঁজতে হবে না। ঘরের লোককেই পার্টনার করা চলবে।

পার্টনার!

হ্যাঁ। আমি যেদিন নিজের ফার্ম খুলবো, তার। এ রকম ডিজাইনের হাত—

হাত দিয়ে ঘরের চারদিকটা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। ভারী খুশি হয়েছিলেন মালতী। বুঝেছিলেন, স্বামীর সবটাই খুব ভালো লেগেছে। ভালো-লাগার সরাসরি প্রকাশ তাঁর স্বভাব নয়। বাঃ, চমৎকার—এসব উচ্ছ্বাস-বোধক শব্দ তাঁর অভিধানে নেই। ঐ কথাগুলো তিনি অন্য ভাষায়, অন্য ভাবে বলে থাকেন। সকলে না বুঝলেও মালতী বুঝতে পারেন। সলজ্জ আনত মুখে

বলেছিলেন, থাক, যে পার্টনার-গিরি করছি, সেই আমার ভালো। সেটাই যেন বরাবর করে যেতে পারি। তার বেশী আর কিছু চাই না।

শেষের দিকে মুখের সে হাসি-হাসি ভাবটা আর ছিল না। স্বরটাও গভীর হয়ে উঠেছিল।

নিজের হাতে সাজানো গোছানো—তৈরী বললেই হয়—সেই ছোট ঘরটিকে স্বামীকে নিয়ে বসলেন মালতী। সাধারণত এ সময়ে চা বা কফির সঙ্গে হালকা ধরনের কিছু তাঁকে দিয়ে থাকেন। ঘরে ছানা কাটিয়ে সন্দেশ করে রাখেন, (সুহৃদের সেটি খুব পছন্দ) তার দু-তিনটে, আর কিছু মুখরোচক নোনতা জিনিস। এর বেশী সুহৃদ বড় একটা খেতে চান না। বলেন, ভুঁড়ি হচ্ছে দেখছ না? ইনি যদি দিন-দিন, তোমাদের সাহিত্যিকরা যাকে বলেন, 'শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায়' বাড়তে থাকেন, তাহলেই গেছি।

ভুঁড়ি না আরো কিছু, ঝাঁঝিয়ে ওঠেন মালতী, ঐ করে করে একটা শক্ত অসুখ না বাধালে বুঝি আর চলছে না? না খেলে দাঁড়াবে কিসের জোরে?

আজ স্বামীর ফিরতে দেরি দেখে কয়েকখানা ফুলকো লুচি এবং একটি সাদা তরকারী করে রেখেছিলেন। মুখ-ঢাকা পাত্রে উনুনের ধারে বসিয়ে রেখে দিয়েছিলেন, লুচিগুলো যাতে নরম থাকে, আর ঠাণ্ডা হয়ে না যায়। একটা ডিশে করে সামনে ধরে দিলেন, অনেকটা ভয়ে ভয়ে। সুহৃদ হয়তো লাফ দিয়ে উঠবেন, এ কী করেছ? এই অবেলায় দিস্তা খানেক লুচি খেয়ে, তারপর?

আজ কিন্তু সেসব কিছুই বললেন না। বসেই খেতে শুরু করলেন। খিদেও পেয়েছিল। তাছাড়া, চোখ দেখে মনে হলো, এসব দিকে তেমন খেয়াল নেই। একটু অন্যমনস্ক হয়ে অন্য কিছু ভাবছিলেন। খেতে খেতে ঘরের চারদিকটায় একবার চোখ

বুলিয়ে নিলেন। তারপর স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন, সেই দিনটা তোমার মনে আছে মালতী?

কোন্ দিন? মালতী একটু সচকিত হলেন।

যেদিন তোমার এই ডাইনিং রুমে প্রথম ঢুকলাম।

মালতী জবাব দিলেন না। মুখখানায় যে স্নিগ্ধ হাসিটি দীপ্ত হয়ে উঠল, তার মধ্যেই জবাব পাওয়া গেল।

সুহৃদ বললেন, সেদিন আমার একটা কথা বোধহয় তেমন খেয়াল করনি।

কোন্ কথাটা বল দিকিন?

বলেছিলাম, যেদিন নিজের ফার্ম খুলবো···

বাঃ! কে বললে খেয়াল করিনি? ওটা কি সেদিন নতুন শুনলাম নাকি?

আরো দু-একবার বলেছি, না? আমার অনেক দিনের স্বপ্ন তো।

বলে, একটু থামলেন। কণ্ঠস্বরে যে আবেশটুকু জড়ানো ছিল, তাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সহজ সুরে বললেন, কেন দেরি হল শুনবে? কাশীপুরে গিয়েছিলাম।

কাশীপুর!

হ্যাঁ। একটা চালু কারখানা সুবিধে দরে বিক্রী হচ্ছে শুনে দেখতে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখলাম, এখন আর ঠিক চালু নেই প্রায় বন্ধ হবার মতো। তবে কয়েক হাজার টাকা হলেই খেটে-পিটে দাঁড় করানো যাবে। কিছু সময় লাগবে। বায়না করে ফেললাম। হাতে টাকা ছিল না। ব্যাঙ্কও তখন বন্ধ হয়ে গেছে। ওখান থেকে এলাম ভবানীপুরে আমার সেই ডাক্তার বন্ধু বিভূতির কাছে। ভাগ্যিস তাকে পাওয়া গেল। তখনি বেরিয়ে যাচ্ছিল। ওর কাছে যা ছিল, তাতেও কুলায় না। কোত্থেকে যেন যোগাড়-টোগাড় করে নিয়ে এল। তারপর ছুটলাম মালিকের বাড়ি, মানে

শ্যামবাজার। পৌঁছলাম গিয়ে একেবারে যাকে বলে, ইন দি নিক অব টাইম। দু-মিনিট দেরি হলে আর হত না।

এতগুলো কথা প্রায় এক নিঃশ্বাসে শেষ করে সুহৃদ এবার সাগ্রহ দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে চাইলেন। প্রায় সারাটা দিন অনেক ছোটাছুটি এবং গভীর উদ্বেগের মধ্য দিয়ে কেটেছে। চোখে মুখে তার চিহ্ন তখনো স্পষ্ট, তার উপরে একটি পরিতৃপ্তিময় সজীব হাসি ভেসে উঠেছিল—দীর্ঘ দিনের আকাঙ্ক্ষা যখন প্রথম সাফল্যের আশ্বাস পায়, তখন যে তৃপ্তি জাগে, সেই তৃপ্তি।

মালতী সেটি লক্ষ্য করলেন। স্বামীর এই নতুন উদ্যমে সাড়া দেওয়া তাঁর কর্তব্য, তাও বুঝলেন, কিন্তু ভিতর থেকে যেন যথেষ্ট জোর খুঁজে পেলেন না। অনেকটা খাপছাড়া ভাবে বললেন, কিসের কারখানা ?

বেশির ভাগ মেসিন পার্টস, নানারকম যন্তরপাতি, কল-কারখানায় যা হরদম দরকার হয়। তাছাড়া কিছু বাজার-চলতি এঞ্জিনীয়ারিং গুডস্‌ও হত। ভদ্রলোক পাকা ব্যবসায়ী। প্রচুর পয়সা করেছেন ঐ ফ্যাক্টরী থেকে। এখন আর খাটতে পারেন না। খুব বুড়ো হয়ে পড়েছেন। উপযুক্ত কোনো ছেলে নেই যে এসব বোঝে বা দেখতে পারে। মাইনে-করা লোকের ওপর ছেড়ে দিলে তিনদিনেই বারোটা বাজিয়ে দেবে, দিয়েছেও খানিকটা, তাই বিক্রী করে দিলেন।

তুমি খবর পেলে কী করে ? কৌতূহলী হবার চেষ্টা করলেন মালতী।

দু'চারজনকে বলে রেখেছিলাম, তাদেরই একজন খবর দিয়ে গেল। ভদ্রলোক আমাকে আগে থেকে চিনতেন মনে হল। মানে, আমি কি করি-টরি কোথাও হয়তো শুনেছেন। বললেন, আমার সারা জীবনের তৈরী জিনিসটা আপনার হাতে পড়ল দেখে আমি নিশ্চিন্ত হলাম। বড্ড ভয় ছিল, কে এসে জুটবে, রাখতে পারবে

কিনা। আপনি ঠিক পারবেন। তবে নিজে দেখতে হবে, খাটতে হবে। তা না হলে ব্যবসা চলে না।

কিন্তু সেটা হবে কেমন করে? দশটা-পাঁচটা পরের চাকরি করে কারখানার পেছনে খাটবে কখন? দুদিনে শরীর ভেঙে পড়বে, মালতীর স্বরে উদ্বেগ ফুটে উঠল।

কিছুদিন চলুক, তারপর চাকরি ছেড়ে দেবো।

ছেড়ে দেবে! রীতিমতো চমকে উঠলেন মালতী, এ রকম একটা চাকরি! তারপর অনেকটা যেন আপন মনে বললেন, ছেলে দুটোর একটাও এখনো মানুষ হয়ে দাঁড়াল না, মেয়ে বড় হচ্ছে···

সুহৃদ মৃদু হেসে স্ত্রীর মুখের দিকে চাইলেন। দেখলেন, তার দুচোখ ভরা গভীর শঙ্কার ছায়া। স্ত্রীকে তিনি ভালো করেই জানেন। বিয়ের আগে তাদের দেখা হয়নি। তবু তার কুমারী জীবনের ছকে-ফেলা দিনগুলোও স্পষ্ট অনুমান করতে পারেন। সবটাই যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন। চিন্তার স্রোতটা সেই দিকে ফিরে গেল।

মাঝামাঝি স্তরের সরকারী চাকুরের মেয়ে মালতী। চোখ ফুটবার পর থেকেই দেখে এসেছেন, প্রতি মাসের প্রথম দিন সন্ধ্যাবেলা অফিস থেকে ফিরে বাবা একখানি ক্লিপ-আঁটা সাদা খাম মায়ের হাতে এনে দিয়েছেন। তিনি সেটা কপালে ছুঁইয়ে সযত্নে আলমারীতে তুলে রেখেছেন। এ নিয়মের কোনো নড়চড় হয়নি। ঐ খামখানার ভিতরে কয়েকখানা গোণাগুণতি নোট। সংখ্যা যাই হোক, তার নিশ্চয়তা অবধারিত। তার উপরে সারাজীবন নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত মনে নির্ভর করা চলে।

চাকরি থেকে বেরিয়ে আসার পরেও সে নির্ভরতা অক্ষুণ্ণ থাকবে। তখনো মাস গেলে একখানা খাম বাবার হাত থেকে মায়ের হাতে গিয়ে পৌঁছবে, শুধু তার ওজনটা অনেক কম। তবু তিনি যতদিন আছেন, সেও ঠিক নিয়মমতো এবং নির্ধারিত দিনে আসতে থাকবে।

বিয়ের পর এ সংসারে এসেও মালতী তার মায়ের মতো অমনি একখানি খাম স্বামীর হাত থেকে পেয়ে এসেছেন, তাতেই তিনি অভ্যস্ত। এই প্রসঙ্গে ছোট্ট একটা ঘটনা সুহৃদের মনে পড়ল।

সওদাগরি অফিসের চাকরে, মাইনে পেতেন চেক্-এ। প্রথম যেদিন বাড়ি ফিরে কোটের পকেট থেকে চেকখানা মালতীর হাতে দিলেন, তিনি উল্‌টে-পাল্‌টে দেখে বললেন, এ রকম নোট তো দেখিনি। কত টাকার ?

সুহৃদ হেসে ফেলেছিলেন।

হাসছ যে।

ওটা নোট নয়, চেক্।

তাই বুঝি ? বাবা তো অফিস থেকে টাকা নিয়ে আসেন।

এও টাকা। ব্যাঙ্কে পাঠালেই নোট হয়ে ফিরে আসবে।

অতশত বুঝি না বাপু। আমাকে তুমি সোজাসুজি টাকা এনে দিও। দশ টাকা, পাঁচ টাকার নোট।

পরের মাস থেকে চেকখানা আর বাড়িতে না এনে সরাসরি ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে দিতেন। পরদিন কিংবা কোনো কোনো মাসে সময় করতে না পারলে, তিন চারদিন পর টাকাটা এনে পৌঁছে দিতেন স্ত্রীর হাতে।

মালতী একদিন বলে বসলেন, যা-ই বল, তোমাদের এই মার্চেণ্ট অফিসের চেয়ে সরকারী চাকরি অনেক ভালো।

কেন বল দিকিন ? পেনসন্ আছে বলে ? কিন্তু মাইনের বেলায় যে সরকার বাহাদুরের হাত উঠতে চায় না।

তা হোক, তবু ঠিক পয়লা তারিখে টাকাটা পাওয়া যায়।

এরাও তো তা-ই দেয়।

কই, ফী মাসেই তো দেরি করে দেখি।

সেটা ওরা করে না, করি আমি। চেক ভাঙাতে দু-একদিন দেরি হয়ে যায়।

তাই তো বলি। ওখানে এসব চেক-ফেকের ঝামেলা নেই।

সুহৃদ বলতে যাচ্ছিলেন, ওখানেও চেকের ব্যাপার আছে, উঁচু রের অফিসাররা অনেক ক্ষেত্রে টাকা না নিয়ে চেক নেন। বললেন । মালতী মনে করতে পারেন, তার বাবার চাকরিকে ছোট বলে াচ্ছিল্য দেখানো হলো।

এমনি আবহাওয়ায় এই মনোভাব নিয়ে মানুষ হয়েছেন মালতী। ার কাছে আয়ের পরিমাণের চেয়ে বড় তার নিশ্চয়তা। চাকরি িনিসটাকে তিনি বোঝেন, তার থেকে যে প্রাপ্তি সেটা পরিমিত লেও নির্দিষ্ট এবং নিয়মিত। তিনি জানেন, এই তাঁর অঙ্ক, এরই ামার মধ্যে তাঁর প্রয়োজনগুলোকে কেটে-ছেঁটে খাপ খাইয়ে নিতে ব। ব্যবসা তিনি বোঝেন না, তার অনিশ্চয়তাকে ভয় পান। ার সম্ভাবনা যতই বিপুল হোক, তবু তো সে 'সম্ভাবনা'। হবেই, বং বরাবর হতে থাকবে, এমন কথা জোর করে বলা যায় না।

আসল ব্যাপার হলো, উচ্চাশা বা অ্যামবিশন বলতে যা বোঝায়, ালতীর মনে তার স্থান অতি পরিমিত। বিপুল ঐশ্বর্যের উপর ার কোনো মোহ নেই। স্বামী সন্তান নিয়ে মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্য ও স্চ্ছলতার ভিতর দিয়ে তার ছোট্ট সংসারটি চালিয়ে নিয়ে যেতে ারলেই যথেষ্ট, তার বেশী আর কোনো কামনা বা আকাঙ্খা নেই।

মেয়ে যদিও ছোট, তবু মাঝে মাঝে তার বিয়ে নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে হৃদের কথা হয়েছে। তার ভিতরেও ঐ একই চিন্তাধারার পরিচয় পয়েছেন।

জানো, খুকুর জন্যে আমার বড় ভাবনা হয়।

সুর অতি গম্ভীর। স্ত্রীকে তো চেনেন। কিছুমাত্র চিন্তিত না য়ে মনে মনে কৌতুক বোধ করেছেন। বাইরে অবশ্য তার খানিকটা অংশ নেবার ভাব দেখাতে হয়েছে, কেন, কী ?

মেয়ে এখন থেকেই বড্ড বড়লোক ঘেঁষা হয়ে উঠছে। বাড়ি,

গাড়ি দামী দামী শাড়ি, গয়না, পোষাক-আসাক, পার্টি-পিক্নিক এসব দিকে ভীষণ ঝোঁক।

কী করবে বল? ওটা হচ্ছে যুগের হাওয়া। চারিদিকে যা দেখছে, তাইতো শিখবে। ও জন্যে ভেবো না। বড় হয়ে নিজেদের অবস্থা যখন বুঝবে, তখন আপনিই শুধরে যাবে।

আরেক দিন ঐ প্রসঙ্গ উঠতে সুহৃদ বলেছিলেন, অত ভাবছ কেন? ঐ একটা তো মেয়ে। ওর মন যা চায়, সেই রকম ঘরে যাতে পড়ে, দেখে-শুনে তাই না হয় করা যাবে। বাড়ি-গাড়ি আজকাল অনেকেই করছে। সেটা এমন কিছু বিশাল ব্যাপার নয়।

এতটা আশ্বাসের পরেও মেয়ের মাকে বিশেষ চিন্তা-মুক্ত বলে মনে হলো না, খুশি তো নয়ই। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মৃদু অন্তরঙ্গ সুরে, স্বামীর কাছে যেন একান্ত মনের কোনো গোপন বাসনা প্রকাশ করছেন, এমনি ভাবে বললেন, কি জানো, আমার একটা মেয়ে, সকলের ছোট, এমন ঘরে গিয়ে পড়বে, যেখানে আমরা ওর নাগাল পাবো না, সেটা আমার ইচ্ছে নয়। আমরা যেরকম, সেই রকম একটি ভদ্র শিক্ষিত পরিবারে যদি যেতে পারে, ও-ও সুখী হবে, আমরাও একঘর এমন কুটুম্ব পাবো, যাকে আত্মীয় করে নেওয়া যায়। বেশী ওপরে উঠতে গেলে, তা হয় না। দেখছ না বড়দির অবস্থা? বাড়ি-গাড়ি দেখে মেতে উঠেছিল, এখন দু'বেলা নিঃশ্বাস ফেলে। একটা বাচ্চা হবার পর মেয়েটাকে আর বাপ-মায়ের কাছে পাঠায় না। বলে, ছেলের কষ্ট হবে। মেয়েটাও কেমন পর হয়ে গেছে।

এর পরে আর তর্ক চলে না। বলা চলে না, বাড়ি-গাড়ি থাকলেই চোখের পর্দা থাকবে না, এটা যুক্তি নয়। বড়লোক মাত্রেই ছোটলোক নয়। মালতীর এটা সংস্কার। সুতরাং সুহৃদকে সেদিন অন্য প্রসঙ্গে চলে যেতে হয়েছিল।

আজও চাকরি ছাড়বার উল্লেখ করতেই স্ত্রীর চোখে-মুখে যে

ভয় এবং দুর্ভাবনার রেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেখলেন, তার পরেও আর এ নিয়ে কোনো যুক্তি-তর্কের অবতারণা বৃথা হবে বলে মনে হলো। সেদিক দিয়ে গেলেন না। মালতীর একটা হাত অলসভাবে টেবিলের উপর পড়েছিল। হাত বাড়িয়ে নিজের বলিষ্ঠ মুঠির মধ্যে টেনে নিলেন। তার উপরে একটি গাঢ় চাপ দিয়ে বললেন, কোনো ভয় নেই। তোমার এই সাজানো সংসার যেমন চলছে, ঠিক তেমনি চলবে। কোথাও এতটুকু আঁচ লাগতে দেবো না।

হাতখানা ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, নিজের ওপর আমার ভরসা আছে, মালতী। আর,···বলে আর একবার তাকালেন স্ত্রীর মুখের পানে, তারপর হাসি মুখে যোগ করলেন, তুমি পাশে থাকলে আমি সব করতে পারি।

এই স্পর্শ, কণ্ঠস্বর এবং সকলের উপরে এই একান্ত নির্ভরতা মালতীর দেহে মনে কোথা থেকে যেন একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ বয়ে নিয়ে এল। স্বামী চলে যাচ্ছিলেন। সেই দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলেন। দেখলেন, এইমাত্র তিনি যে কটি কথা বলে গেলেন, তাঁর প্রতি পদক্ষেপে তারই ধ্বনি অনুরণিত হচ্ছে। দৃঢ়, স্বচ্ছন্দ গতি। তার মধ্যে যৌবনের চাঞ্চল্য নেই, কিন্তু তার প্রতিটি ছন্দ পরিণত বয়সের অবিচল আত্মবিশ্বাসে সজীব।

সেই দিকে চেয়ে নিজের ঝিমিয়ে-পড়া মনটাকে একটা ঝাঁকানি দিয়ে টেনে তুললেন। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সন্দেহগুলোকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন। এক মুহূর্তে যেন অনেকখানি হালকা হয়ে গেছেন মনে হলো। তার সঙ্গে একটা অপরাধ বোধ—স্বামীর এই প্রগাঢ় বিশ্বাস, এই অটল নির্ভরতা তিনি তো কই আয়ত্ত করতে পারেন নি। সে না পারার মূলে রয়েছে তারই ভীরু, দুর্বল মন। স্বামীর এই বলিষ্ঠ প্রাণশক্তি, এই বিপুল কর্মৈষণার উপর তিনি আস্থা স্থাপন করতে পারেন নি। তাঁকে ছোট করে দেখেছেন এতদিন। সঙ্গে সমান কদমে চলতে না পারুন, ওঁকে অনুসরণ করতে তো

বাধা নেই। সেখানে যেন কোনো ত্রুটি না হয়। সহধর্মিণীর কঠোর দায়িত্ব সমস্ত শক্তি দিয়ে যেন পালন করে যেতে পারেন।

কয়েক মুহূর্ত আগে স্বামীর মুখ থেকে যা শুনলেন, মৃদু কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে উচ্চারিত সেই ক'টি কথা তখনো তার অন্তরের মধ্যে রণিত হচ্ছিল –তুমি পাশে থাকলে আমি সব করতে পারি।

তাই হোক, মনে মনে বললেন মালতী, তুমি যেমন আমাকে অভয় দিলে, আমিও তোমাকে আশ্বাস দিলাম, তোমার এ বিশ্বাসের মর্যাদা আমি ক্ষুণ্ণ হতে দেবো না। সুখে-দুঃখে, সকল অবস্থার মধ্যে পূর্ণ আস্থা ও আনুগত্য নিয়ে আজীবন তোমার পাশটিতেই যেন থাকতে পারি, এই আশীর্বাদ করো।

তিন

পর পর দুটো রবিবার প্রবীর বাড়ি আসতে পারেনি। প্রথমটা কেটেছিল দল বেঁধে বাইরে বেরোবার আয়োজনে এবং বেশীর ভাগ রেলপথে। সোমবার সকাল থেকে টাটানগর ইস্পাত শিল্পের কতগুলো বিভাগ শিক্ষানবিশদের ঘুরিয়ে দেখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন ওদের কারখানার কর্তৃপক্ষ। তার জন্যে রবিবারেই বেরোতে হয়েছিল।

মাঝে মাঝে বিভিন্ন শিল্প-কেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে নানা রকম কলকারখানায় উৎপাদন এবং তার জাতি-প্রকৃতি, হার, সমস্যা ইত্যাদি সম্পর্কে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার সুযোগ দেওয়া ওদের কর্মতালিকায় অন্তর্ভুক্ত। কোনো জিনিস দেখে এবং দেখবার পর যে-প্রশ্ন মনে জাগে, সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তর পেয়ে সে সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মে, সাতখানা বই পড়েও ঠিক সে জায়গাটিতে পৌঁছনো যায় না—এই সহজ সত্যটা ওঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সেটা হয়তো অনেকেই করেন। এ বিষয়ে এক কোম্পানীর সঙ্গে আরেক

কোম্পানীর তফাৎ ঘটে তার রূপ দেওয়া নিয়ে। সুবীরদের প্রতিষ্ঠান-পরিচালনার ভার যাঁদের হাতে তাঁরা একে কাজে লাগিয়েছিলেন এবং তার থেকে কাজও পেয়েছিলেন। অ্যাপ্রেন্টিস-দের অভিজ্ঞতা তাদের নিজ নিজ দক্ষতার ঘরে জমা হলেও তার দ্বারা মালিকপক্ষ কম লাভবান হননি।

তরুণ শিক্ষানবিশদের এই দল-বেঁধে-বেড়ানো ব্যাপারটার নাম দেওয়া হয়েছিল এক্‌সকারশন—প্রমোদ-ভ্রমণ। তারাও যাতে একে সেই ভাবেই দেখে, ডিরেকটর বোর্ড সে দিকে সজাগ ছিলেন, এবং ব্যবস্থা-বন্দোবস্তের ব্যাপারে কোনো ত্রুটি রাখেন নি। আসলে এটা ওঁদের ইনভেস্‌ট্‌মেণ্ট। এই বাবদ যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল, তার রিটার্ণ বা মুনাফা প্রত্যক্ষ না হলেও প্রচুর।

যৌবনের যে উপচে-পড়া এনার্জি বা কর্মশক্তি শুধু ভেসে চলে যায়, তাকে তারা সেই বৃথা অপচয়ের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলেন। আমোদ-প্রমোদের বাঁধ দিয়ে তার স্রোতটাকে ফলনের পথে বইয়ে দেবার আয়োজন করেছিলেন। ফল কম হয়নি, তার উপরে একটা উপরি পাওনাও ছিল—এতগুলো ছেলের গুড উইল।

কাজ জিনিসটা তো শুধু হস্ত-সঞ্চালন বা মস্তিষ্ক-চালনা নয়। দৃশ্যত হয়তো তাই, কিন্তু তার পিছনে একটি অদৃশ্য বস্তু আছে। তার নাম মন। তাকেও ওই সঙ্গে পাওয়া চাই। সেও উৎপাদনের একটা উপাদান, যাকে বলে ফ্যাক্টর অব্‌ প্রডাকশন। অন্তরালে থাকে বলে অবহেলার পাত্র নয়।

ওখানকার কর্তৃপক্ষ নিজেদের স্বার্থেই কর্মীদের সেই মনটাকে পাবার দিকেও মনোযোগ দিয়েছিলেন। তার জন্যে ব্যয় কিঞ্চিৎ বেড়েছিল, কিন্তু বাড়তি প্রোডাকশন নিশ্চয়ই সেটা সুদসমেত পুষিয়ে দিয়ে থাকবে। তা না হলে এ স্কিম তাঁরা বন্ধ করে দিতেন।

পরের রবিবারে ছিল পিক্‌নিক। সেটা অবশ্য কর্মীদের নিজেদের

ব্যবস্থা। কারখানা থেকে কয়েক মাইল দূরে একটি ছোট পাহাড়ের ঘা ঘেঁষে মনোরম লেক। আসলে, মানুষের হাতের তৈরী জল-ভাণ্ডার, যার নাম ড্যাম। দুরন্ত পাহাড়ী নদীকে বেঁধে তার সংহার-শক্তিকে মানব-কল্যাণের পথে চালিত করবার চেষ্টা করছিলেন বিজ্ঞানীরা। নিতান্তই প্রয়োজনমূলক পরিকল্পনা। এই সঞ্চিত জলরাশি একদিকে লাগবে সেচের কাজে, আরেক দিকে করবে বিদ্যুৎ-উৎপাদন। উদ্দেশ্য, কৃষি-শিল্পের উৎকর্ষ, মানুষের আর্থিক উন্নয়ন। অর্থাৎ, অন্নবস্ত্র এবং বাসস্থান বলে তার যে তিনটি মৌলিক প্রয়োজন আছে, তারই পরিপূরণের ব্যবস্থা।

কিন্তু প্রয়োজন কথাটার মধ্যে একটা স্থূলতা আছে, যাকে নগ্নভাবে প্রকাশ করতে মানুষের রুচিতে বাধে। তাই তার চারদিকে একটি সৌন্দর্যের আবরণ পরিয়ে দেয়। ইউটিলিটির উপর কিঞ্চিৎ বিউটির আচ্ছাদন। বাড়ির দেয়ালে যেমন-তেমন একটা গর্ত খুঁড়ে দিলেই আলো এবং বায়ু চলাচলের প্রয়োজন মিটতে পারে। তবু বহু পরিশ্রমে কারিগরের হাতিয়ারের সঙ্গে শিল্পীর কল্পনা মিশিয়ে সেই গর্তটাকে সে এমন একটি বিশেষ রূপ দেয়, যাতে করে তার প্রয়োজনের চাহিদাও মেটে এবং রুচিবোধও তৃপ্ত হয়। গর্ত বা ফোকর বললে নিছক প্রয়োজনটাকেই বড় করে কিংবা নগ্নভাবে দেখান হতো বলে তার একটা সুন্দর এবং শ্রুতিমধুর নাম দেয় জানালা কিংবা বাতায়ন।

হয়তো এই শিল্প-বোধ বা সৌন্দর্য-লিপ্সা থেকেই ঐ জলাধারটিকে লোকে বলত লেক। অর্থাৎ ওটি যেন মানুষের তৈরী নয়, প্রকৃতির সৃষ্টি। ড্যাম্ নয়, সরোবর।

ড্যামের জন্যে স্থান-নির্বাচনের ব্যাপারে এঞ্জিনিয়ারদের কাছে ঐ পাহাড়টির একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। ওটা এই সুবৃহৎ চৌবাচ্চার একদিকের দেয়াল। অনেক খরচ বাঁচিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আজ একে সে-চোখে কেউ দেখে না। পর্যটকদের কথা

দূরে থাক, এই ড্যাম যাদের সৃষ্টি, সেই ইঞ্জিনিয়াররা যখন এই পাহাড়ের পাশ দিয়ে নতুন তৈরী পীচঢালা মসৃণ রাস্তায় জীপ ছুটিয়ে যান, তাঁরাও বোধহয় এর সেই আদিম রূপটা দেখতে পান না। সেটা পড়ে আছে তাদের প্ল্যানের পাতায়, স্মৃতিতেও হয়তো কিছুটা আছে, কিন্তু আজকের মনের পাতায় তাকে খুঁজে পাওয়া শক্ত।

এই ক'দিন আগেও সব জায়গাটা জুড়ে ছিল এবড়ো-খেবড়ো মাঠ, আর তার ধার ঘেঁষে ন্যাড়া পাহাড়। আজ তার কোথাও কটিদেশ, কোথাও বা কণ্ঠী বেষ্টন করে এঁকে বেঁকে চলে গেছে স্বচ্ছতোয়া লেক্। চলে গেছে অনেক দূরে, মানুষের দৃষ্টি যেখানে পৌঁছায় না। কোথাও খাড়া পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও বা বিশাল পাথরখণ্ড নিচু হয়ে নেমে গেছে, হারিয়ে গেছে গভীর কালো জলের তলায়। এই জলাধার, ঢেউ খেলানো পাহাড়, তার উপরে ছবির মতো একটি বাংলো এবং দূরের আকাশ— সমস্তটা মিলিয়ে একটি অখণ্ড সৌন্দর্য-লোক, যার সবখানিই মনে হবে প্রকৃতির দান। মানুষের অংশ যেটুকু, তাকে আর আলাদা করে চিনে নেবার উপায় নেই। সে ইচ্ছাও নেই কারো মনে।

ড্যাম যেখান থেকে শুরু, তার উপরে সুদৃশ্য ঘাট। দীর্ঘ সোপান জুড়ে ভিড় লেগেই আছে। ঠিক পাশেই পাহাড়ের পায়ের তলায় অনেকখানি উঁচু-নিচু সবুজ ঘাস-বিছানো জমি। মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঝোপঝাড়। তার পরে শুরু হল ঘন শাল বন। বনভোজনের জন্যেই যেন সমস্ত পরিবেশটি সাজিয়ে রেখেছেন প্রকৃতি।

দূর-দূরান্তর থেকে দলে দলে নরনারী নানা প্রকার এবং নানা আকারের মোটর-যানে করে এইখানটিতে ছুটে আসে। কার, বাস্ এবং ট্রাকের ভিড় জমে যায়। গ্রামোফোন আর ট্রানজিস্টার গলার জোরে একে অন্যকে ছাড়িয়ে যেতে চায়। কখনো বা যন্ত্রের সুরকে ডুবিয়ে দিয়ে উদ্দাম হয়ে ওঠে বহু মানুষের বেসুরো কণ্ঠের উল্লাস।

জনতা থেকে দূরে কোনে. বুনো ঝোপের আড়ালে কিংবা ঘনপত্র শালগাছের ছায়ায় মাঝে মাঝে দু-একটি একক মৃদু কণ্ঠও শোনা যায়। পাশে বসে একটিমাত্র শ্রোতা। যে গাইছে, তার নিভৃত সঙ্গী কিংবা নিরালা সঙ্গিনী।

সুবীররাও দল বেঁধে পিকনিক করতে গিয়েছিল ঐ লেকের ধারে। আগের সপ্তাহে টাটায় যে-দল গিয়েছিল, তার থেকে এটি আলাদা। সেখানে ছিল ক'জন মাত্র শিক্ষানবিশ, সঙ্গে দুজন শিক্ষক—অমিশ্র সার্ট কোট ট্রাউজারস্। এখানকার দলটি মিশ্র—বর্ণহীন, শ্রীহীন সার্ট-প্যান্টের আশেপাশে দু-চারখানি স্নিগ্ধশ্রী রঙীন অঞ্চল। বলগাহীন কর্কশ স্বরের মাঝে মাঝে দু-একটি সংযত সুরেলা কণ্ঠ।

কোম্পানার স্থায়ী স্টাফের কেউ-কেউ সপরিবারে ওদের দলপুষ্ট করেছিলেন। কিংবা বলা যেতে পারে, পিকনিকের আসল উদ্যোক্তা তারাই। অ্যাপ্রেন্টিস্ ছেলে ক'টিকে তারা দলভুক্ত করে নিয়েছিলেন। এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রণী ছিলেন উপর মহলের ক'জন গৃহিণী। তাঁদের স্বামীরা অনেকেই অনুপস্থিত, কিন্তু অনূঢ়া কন্যা, ভগিনী কিংবা ননদেরা বাদ পড়েনি।

দুটো রবিবার বাদ দিয়ে অর্থাৎ পুরো তিন সপ্তাহ পরে সুবীর বাড়ি এসেছে। এরকম বড় একটা হয় না। সকালবেলা পারিবারিক চায়ের আসরটা বেশ জমে উঠেছিল। মামুলি উপকরণের সঙ্গে মালতীর নিজের হাতের দু-একটি বিশেষ টুকিটাকি তাদের স্বাদ ও বৈচিত্র্য দিয়ে উপভোগের মাত্রা এবং কাল দুটোকেই বেশ খানিকটা বাড়িয়ে দিয়েছিল।

স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ের সঙ্গে সুহৃদও যোগ দিয়েছিলেন। প্রতি রবিবারই দিয়ে থাকেন। অন্য দিনগুলোতে সময় হয় না। তিন বেলার আহারপর্ব তাঁকে একাই সেরে নিতে হয়। অবশ্য মালতী উপস্থিত থাকেন, তাও নিছক পরিবেশিকা রূপে। রাত্রি বেলার

খাবার টেবিলে ছেলে বা মেয়ে কখনো হঠাৎ জুটে যায়, এই পর্যন্ত। সেই জন্যে রবিবারের প্রাতঃকালীন চায়ের আসরটা তিনি কখনো হারাতে চান না। ছেলেমেয়েরাও ঐ দিনটির জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকে। বলতে গেলে সপ্তাহান্তে ঐ একটি ঘণ্টা—কখনো তার চেয়ে কম—তারা বাবার কাছটিতে বসতে পায়। তাছাড়া বাবার সঙ্গ অথবা সান্নিধ্য তাদের কাছে দুর্লভ, বিশেষ করে যেদিন থেকে নতুন কারখানাটি কেনা হয়েছে। তারপর থেকে তিনি সর্বদাই ব্যস্ত। ছুটির দিনগুলোও নানা কাজ দিয়ে ঠাসা।

রবিবার সকাল বেলাকার চায়ের আসরে সুহৃদ রুদ্র অন্য মানুষ। ডিম্বাকার টেবিলের লম্বা দিকের একটা ধার জুড়ে জাঁকিয়ে বসেন। ওধারের চেয়ারখানিতে, অর্থাৎ ওঁর ঠিক মুখোমুখি বসতে হয় মালতীকে। অন্য দিন যেমন স্বামী কিংবা ছেলেমেয়েদের খেতে বসিয়ে দিয়ে রান্নাঘর আর খাবার ঘরে ছুটোছুটি করেন, এদিন সেটা হবার জো নেই। সকলেরই ঘোর আপত্তি।

এই নিয়েই সুহৃদ একদিন বলেছিলেন, রোববারের সকালটাও কি তোমার এই টানাপোড়েন বন্ধ রাখতে পার না ?

তাহলে কী করে চলবে ? মৃদু হেসে বলেছিলেন মালতী।

উত্তর দিয়েছিল সুবীর, খুব চলবে। আজ আমাদের তাঁত বন্ধ।

এমনভাবে বলছিল, যেন কোনো কাপড়ের কলের মালিক তাঁর কারখানায় লক্-আউট ঘোষণা করছেন। শিখা ও সুনীতের সঙ্গে সুহৃদও উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠেছিলেন, বিশেষ করে ওর ঐ বলার ভঙ্গীতে। ছেলের কাণ্ড দেখে মালতীও না হেসে পারেননি।

তারপর বলেছিলেন, তোমাদের তাঁত তো বন্ধ বুঝলাম, কিন্তু ওদিকে আমার উনুনের তাত চলে গেলে রান্না বন্ধ হয়ে যাবে। তোমরা বসো, আমি একটা কিছু চাপিয়ে দিয়ে আসি।

আর একদফা উচ্চহাসি। মালতী ফিরে আসতে আসতে শুনলেন. সুনীত সশ্রদ্ধ প্রশংসার সুরে বলছে, পান্‌টা (Pun) কিন্তু

ভারী চমৎকার হয়েছে। মার কথাবার্তার মধ্যে মাঝে মাঝে এমন একটা সহজ মিষ্টি লিটারারী ফ্লেভার পাওয়া যায়—

তার চেয়ে, অনেক মিষ্টি মার রান্নার ফ্লেভার—কথাটা শেষ করবার আগেই বলে উঠল প্রবীর, কাটলেটটা খেয়ে দ্যাখ্।

বলে নিজেই একটা বেশ বড় টুকরো মুখে পুরে দিল। সুনীত বলল, না, ঠাট্টা নয়। আমি সিরিয়াসলি বলছি, মা যদি একটু-আধটু লিখতে চেষ্টা করতেন—

সর্বনাশ! এক বাড়িতে দুজন সেক্সপিয়র—খাওয়া বন্ধ করে রীতিমতো চোখ কপালে তুলল সুবীর।

শিখা তখনো ছোট। তাহলেও এটুকু বুঝতে পারল, বড়দার এই 'দুজন' কথাটার মধ্যে সুনীতের প্রতি একটা বাঁকা কটাক্ষ রয়েছে। জিনিসটা তার পছন্দ নয়। সাহিত্যিক ছোড়দার উপর স্বাভাবিক ভাবেই তার একটু বিশেষ টান ছিল, সেই সঙ্গে বেশ খানিকটা গর্ববোধ। অন্য কেউ কিছু বলবার আগেই বলে উঠল, সেক্সপিয়র বুঝি কেউ চেষ্টা করলেই হতে পারে? আমাদের গ্রামারে আছে, এ নিউটন ক্যানট্ বি এ সেক্সপিয়র বাট এ সেক্স্পিয়র ক্যান্ বি এ নিউটন।

শিখা নিশ্চয়ই ভেবেছিল, তার এই প্রতিবাদ এবং বিশেষ করে তার সদ্যপঠিত ব্যাকরণের উদ্ধৃতি সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবে। তার বদলে গোটা সভাস্থল অট্টহাসিতে মুখর হয়ে উঠল দেখে সে মনে মনে ক্ষুণ্ণ হল। তার মুখের দিকে চেয়ে সুহৃদ সেটা বুঝতে পারলেন। তাঁর একটু উঠবার তাড়া ছিল, কিন্তু উঠলেন না। মেয়ে বসেছিল ঠিক তাঁর ডান পাশটিতে। তার পিঠে হাত দিয়ে বললেন, শোন, একটা গল্প বলি।

সঙ্গে সঙ্গে শিখার সব ক্ষোভ জল। অন্যেরাও হাসিমুখে উৎকর্ণ।

সুহৃদ শুরু করলেন, তোদের মায়ের ঐ তাঁত, আর তাত থেকে

মনে পড়ল। ঐ ছোট্ট চন্দ্রবিন্দুটা নেহাৎ সহজ পাত্তর নয়। আমাদের এক মস্ত বড় প্রফেসারকে একবার রীতিমত ঘোল খাইয়ে ছেড়েছিল।

তোমাদের শিবপুরের প্রফেসর? কৌতূহলী হলো সুনীত।

না, শিবপুরে তখনো ঢুকিনি। এটা তার আগের ব্যাপার, যখন প্রেসিডেন্সিতে পড়ি। ইংরেজির প্রফেসর।

তাই বলো! এ ফোড়নটি প্রবীরের—ঘোল-টোল ওঁরাই খেয়ে থাকেন। শিবপুরে ওসব কারবার নেই। বলে, মুখ না ফিরিয়ে শুধু চোখের কোণ দিয়ে সুনীতের দিকে তাকাল।

সুহৃদ সশ্রদ্ধ কণ্ঠে বললেন, ও কথা বোলো না। ঐ টাইপের লোক আজকাল আর হয় না। আমি তো অন্তত একটিও দেখিনি। যাক, কী হয়েছিল শোন।

সুনীত এবার দাদার টিপ্পনীর উত্তর দেবার চেষ্টা করল, অবশ্য চোখ দিয়ে। কিন্তু ও-তরফের চোখ দুটো ধরা দিল না। অগত্যা নিরস্ত হয়ে বাবার দিকে ফিরল।

ভারী মজার ব্যাপার। বলে, একটু নড়ে-চড়ে বসে সুহৃদ তাঁর গল্পে ফিরে গেলেন—সাহেব প্রফেসর। বেশ সিনিয়র লোক। তাঁর বেশীর ভাগ ক্লাস ছিল থার্ড-ফোর্থ ইয়ারে। সেকেণ্ড ইয়ার আর্টস্-এ বোধ হয় একটা ক্লাস নিতেন। সায়েন্সে কোনো লেকচার ছিল না। শুধু সপ্তাহে একটা করে টিউটোরিয়াল। ঘুরে ঘুরে একবার আমাদের ব্যাচটা পড়ল গিয়ে ওঁর হাতে। তার কিছুদিন আগে থেকে উনি বাংলা শিখতে শুরু করেছেন। শিখবার ধরণটা অদ্ভুত, তার মধ্যে দুঃসাহসও কম ছিল না। অক্ষরগুলো কোনো রকমে চিনে নিয়ে প্রাইমার আর ব্যাকরণের পেছনে সময় নষ্ট না করে একেবারে বড় বড় বই ধরে ফেলেছেন। এক-একটা সেন্‌টেন্স্-এ যতগুলো শব্দ আছে, ডিক্‌শনারী দেখে দেখে তার ইংরেজি মানে বের করেন আর পর পর বসিয়ে যান। তারপর তার থেকে গোটা

সেন্‌টেন্সের অর্থটা বুঝবার চেষ্টা করেন। ঐ সময়ে তিনি শরৎ চাটুজ্যের চরিত্রহীন নিয়ে পড়েছিলেন।

অতবড় একটা বই অমনি করে পড়ছিলেন! বিস্ময় প্রকাশ করলেন মালতী।

তবে আর বলছি কেন? ভদ্রলোকের অসাধারণ সাহস। তেমনি ধৈর্যেরও শেষ নেই। চরিত্রহীনের অনেকগুলো চ্যাপ্টার অমনি করে চালিয়ে এসেছেন। শেষটায় এক জায়গায় এসে আটকে গেছেন।

টিউটোরিয়ালের খাতা-টাতা দেখিয়ে আমরা যখন চলে আসছি, হঠাৎ আমাকে ডেকে ফেরালেন।

তুমি বুঝি সব চেয়ে ভালো ছেলে ছিলে? এ প্রশ্নটা শিখার।

ভালো ছেলে! আরে না, না। তবে হ্যাঁ, সব সাবজেক্‌টে ফার্স্ট ডিভিশন নম্বর রাখতে হতো বৈকি! আমাকে কেন ডাকলেন ঠিক জানি না। বোধহয় এমনিই। হয়তো বোরোবার সময় সকলের পেছনে পড়ে গিয়েছিলাম।

ওসব শুনিসনে, চাপা গলায় মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন মালতী। সায়েন্স পড়লে কি হয়, ইংরেজিতেও খুব ভালো ছিলেন। অনেক নম্বর পেয়েছিলেন আই-এস্‌-সিতে। যার জন্যে তোদের দাদু ওঁকে শিবপুরে দিতে চাননি। বলেছিলেন, বি. এ. পড়।

আই-এস-সি পাস করে বি. এ.! রীতিমত অবাক হলো সুবীর।

সুহৃদ বললেন, আমাদের সময়ে অনেকে তাই পড়ত। তাতে করে কমপিটিটিভ পরীক্ষাগুলোয় খানিকটা সুবিধে পাওয়া যেত। বাবাও ভীষণ জিদ ধরে বসেছিলেন আমাকে বি. এ. পড়াবার জন্যে। তাঁর ইচ্ছা ছিল, ছেলে একটা আই-সি-এস-টাই-সি-এস হবে। কিংবা অন্তত বি-সি-এস। সে যাক। এবার সাহেবের কাণ্ড শোন।

ব্যাগ থেকে 'চরিত্রহীন' বের করে খুলে ধরলেন আমার সামনে। একটা লাইনের নিচে পেন্সিলের দাগ। বললেন, পড়। পড়লাম।

সম্ভবত সতীশের কথা—আমাদের গাঁয়ে যেমন ম্যালেরিয়া তেমনি কলেরা। ঠিক-ঠিক বলতে পারবো না। আইডিয়াটা ঐ রকম। সাহেব তাঁর খাতা খুলে ইংরেজি তর্জমাটা দেখালেন—ইন আওয়ার বডি দেয়ার ইজ এ্যাজ মাচ্ ম্যালেরিয়া এ্যাজ কলেরা।

তারপর মাথা নেড়ে বললেন, ডাজ নট ক্যারী এনি সেন্স। অথচ ভুলও তো কোথাও দেখছি না। কথার মানেগুলো ঠিক-ঠিক বসিয়েছি বলেই মনে হচ্ছে। তুমি একবার গ্যাখো তো রুড্রা।

আমি একনজরে দেখেই বললাম, সবই ঠিক আছে সাহেব। শুধু ঐ লিটল্ হাফমুন্‌টাকে তুমি মিস করেছ।

হাফমুন! বইএর ওপর ঝুঁকে পড়লেন সাহেব। আমি 'গা' শব্দটির মাথার ওপর চন্দ্রবিন্দুটিকে দেখিয়ে দিয়ে বললাম, ও-ই সব গোলমাল করে দিয়েছে।

সাহেব তখনো ব্যাপারটা ধরতে পারছেন না। আমাকে খুলে বলতে হোল—'গা' যদি একা হত, তোমার তর্জমা নির্ভুল। ওর মানে বডি। কিন্তু ঐ পাগড়িটা মাথায় পরবার পর ও আর বডি নয়, ভিলেজ।

আই সী! সাহেবের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। সারা মুখখানা হাসিতে ভরে উঠল। হোয়াট ইজ গ্যাট কল্ড?

বললাম, চন্দ্রবিন্দু।

সাহেব কটমট শব্দটাকে দু-তিনবার মনে মনে আওড়াবার চেষ্টা করলেন। তারপর বেশ গম্ভীর মুখে বললেন, মাস্ট বি এ ভেরী ডেঞ্জারাস্ হাফমুন।

খাবার টেবিলে হাসির রোল উঠল।

ইদানিং সুহৃদের মুখে এই ধরনের সরস গল্প বড় একটা শোনা যায় না। রবিবারের ব্রেকফাস্টে হাজিরা ঠিকই দেন, গল্পও করেন। তার মধ্যে কিছু কিছু মজার কাহিনীও থাকে, কিন্তু সবই যেন ঘুরে ফিরে তাঁর নতুন কারখানা এবং তাকে ঘিরে যে জগৎ, তার মধ্যে

গিয়ে থামে। বোঝা যায়, কাজের ভিতরে যখন থাকেন, তখন তো বটেই, তার ফাঁকগুলোতেও ঐসব চিন্তাই তাঁর মনের মধ্যে আনাগোনা করে। তার ছাপ মুখের রেখাতেও দিন দিন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সেটা আর কেউ ধরতে পারুক আর না পারুক, মালতীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ায়নি।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পাট মিটিয়ে, হেঁসেলের কাজ-কর্ম সেরে ঘরে আসতে তাঁর দেরি হয়। প্রায় দিনই সুহৃদ তখন ঘুমিয়ে পড়েছেন। দেয়ালে টিউব লাইট জ্বলছে, বালিশের পাশে পড়ে আছে কোনো বই বা জার্নাল—কখনো বন্ধ; কখনো বা আধ-খোলা। সারাদিন একটানা খাটনির পর সেই প্রগাঢ় ঘুমের মধ্যেও স্বামীর মুখে উদ্বেগের ছায়া লক্ষ্য করেছেন মালতী। অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছেন। কিছুদিন আগেও এটা ছিল না। এ নিয়ে সোজাসুজি কিছু বলা যায় না। সুহৃদ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বলিষ্ঠ সরল হাসি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়ে দেবেন। আভাসে ইঙ্গিতে বলবার চেষ্টা করে দেখেছেন, আমল দিতে চান না, এড়িয়ে যান। একদিন বললেন, ওসব তোমার চোখের ভুল। আমি যেমন ছিলাম, ঠিক তেমনি আছি।

কখনো কখনো, যখন হয়তো বুঝেছেন, স্ত্রীর কাছে, বিশেষ করে মালতীর মত স্ত্রীর কাছে, সব কিছু এক কথায় হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, দেওয়া উচিতও নয়, তাতে ওকে আরো ভাবনায় ফেলা হবে, তখন যতটা সম্ভব হাল্কা সুরেই বলেছেন. আগের থেকে এখন একটু তফাৎ হবে বৈকি! চাকরিটা পরের। তার সঙ্গে সম্পর্ক দশটা-পাঁচটা। ওদিনের মত ঐখানেই খতম। তাকে ঘাড়ে করে বাড়িতে বয়ে আনবার দরকার নেই। কিন্তু ফ্যাক্টরিটা যে নিজের। তার সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। ওর ওপরে আলাদা টান। ওর জন্যে আলাদা ভাবনা।

এদিক ওদিক চেয়ে কেউ কোথায় আছে কিনা দেখে নিয়ে স্ত্রীকে

কাছে টেনে বলেছেন, এই যেমন তুমি। একান্তভাবে নিজের জিনিস, সারাদিন ছেড়ে থাকতে হয়। তাই বলে কি মন থেকেও দূরে ঠেলে দেওয়া যায় ?

থাক, খুব হয়েছে,—ধমকের সুরে, কিন্তু নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার কোনো রকম চেষ্টা না করে বলেছেন মালতী, সারাদিন ধরে আমার কথা যে কতো মনে থাকে, তা আমার বেশ জানা আছে। কোনো রকমে একবার বেরোতে পারলেই হলো। আর ফ্যাক্টরিতে গিয়ে পৌঁছলে তো কথাই নেই। ও তো ফ্যাক্টরি নয়, আমার সতীন।

এর পরেই সুহৃদ রুদ্রের সেই প্রাণ খোলা হাসির ঝড়।

এবারে তিন সপ্তাহ পরে বাড়ি এসেছে সুবীর। সুহৃদের ইচ্ছা ছিল, আরো কিছুক্ষণ বসবেন। কিন্তু হলো না। দু-চারটা কথা বলেই উঠে পড়তে হলো। আরেক কাপ চা চাই কিনা, জানতে চাইলেন মালতী। এই দিনটাতে সাধারণত পরপর দু-কাপই চলে।

আজ বললেন, না থাক, তোমরা বসো। আমাকে এখনি উঠতে হবে।

বলে, সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেলেন এবং মিনিট কয়েকের মধ্যে বেরিয়ে পড়লেন। মালতীর মুখে একটা চিন্তার ছায়া পড়ল। তখনই ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ছেলেমেয়েদের গল্প-গুজবে যোগ দেবার চেষ্টা করলেন। ঠিক জমল না। কোথায় যেন তাল কেটে গিয়েছিল। ঠিক আগেকার সুরে আর ফিরে যাওয়া গেল না।

সেই মুহূর্তে শিখার এক বান্ধবী এসে ডাকতেই সে উঠে পড়ল। চায়ের সময় ছেলেমেয়েদের বন্ধুরা কেউ এলে মালতী তাকে ডেকে বসান, চা-খাবার দেন, বাড়ি-ঘরের খোঁজ-খবর নেন। আজ কোনোটাই করলেন না! একটু পরে সুনীতও তার ঘরে চলে গেল। সুবীরের তখন তৃতীয় পেয়ালা চা চলছে। আড় চোখে একবার ভাই-এর দ্রুত প্রস্থানের দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বলল, ছোটবাবুর

মাথায় বোধহয় ভীষণ কোনো গভীর ভাব এসে গ্যাছে। যে রকম হন্তদন্ত হয়ে ছুটল, মনে হচ্ছে এখনি বেঁধে না ফেললে পালিয়ে যাবে।

মালতী চায়ের বাসন-কোসনগুলো গুছিয়ে ফেলছিলেন। ছেলের কথায় যোগ দিলেন না। বোধহয় সবটুকু শুনতে পাননি। হঠাৎ খাপছাড়াভাবে প্রশ্ন করলেন. তোর ট্রেনিং শেষ হতে আর কতদিন বাকী ?

ছ' মাসের কিছু বেশী। কেন ?

তারপর ওরাই চাকরি দেবে ?

হ্যাঁ।

কেউ যদি চাকরি করতে না চায় ?

অন্ততঃ দু-বছর করতেই হবে। বণ্ড দিতে হয়েছে তো। কিন্তু কেন এ কথা জিজ্ঞেস করছ ?

না, ভাবছিলাম, ট্রেনিংটা শেষ হতেই যদি চলে আসতে পারতিস, ওঁর এই ডবল খাটনির কিছুটা আসান হতো। এ ভাবে চললে শরীর টিকবে কেমন করে ? বয়স হচ্ছে।

কেন যে সাত-তাড়াতাড়ি একটা ফ্যাক্টরি কিনে ফেললেন ? সুবীরের সুরে বিরক্তির ভাবটা চাপা রইল না, আগে জানলে আমি নিষেধ করতাম। আজকাল টাকা করবার আরো অনেক সহজ পথ আছে। তার জন্যে প্রডিউসার হবার কী দরকার ? তার ঝক্কি কি কম ? তৈরী মাল বাজারে কতটা কাটবে, দরে পোষাবে কিনা, এ সব প্রশ্ন তো আছেই। তার চেয়েও বড় ঝঞ্ঝাট হলো লেবার ট্রাবল। কারিগর-কেরাণী সব এক জোট। তাঁদের নিত্যি নতুন আব্দার। বছর বছর মাইনে বাড়াও, বোনাস দাও, বাড়ি দাও, সপ্তাহে দুদিন ছুটি দাও, তা না হলেই 'আমাদের দাবি মানতে হবে' বলে বেরিয়ে পড়ল ঝাণ্ডা নিয়ে। ব্যস, তোমার কারখানাও লাটে উঠল।

সুবীর যা বলে গেল, কথাটা হয় তো মিথ্যা নয়, কিন্তু তার বলবার ধরণটা কেমন যেন মালতীর ভালো লাগল না। মনে হল, স্বামী যার জন্যে প্রাণপাত করছেন, ছেলে তাকে বড় খেলো করে দেখছে। তাঁর কাছে যেটা অনেক মূল্যবান, এ তাকে সামান্য দাম দিতেও নারাজ। যাই হোক, এ নিয়ে ছেলের সঙ্গে কোনো আলোচনা করতে তাঁর ইচ্ছা হলো না। ততটা জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতাও তাঁর নেই। শুধু বললেন, কোনো একটা কিছু গড়ে তুলতে হলে তার ঝক্কি, ঝঞ্ঝাট তো আছেই। সেটা এড়াবে কেমন করে ?

সুবীর এবার রীতিমত অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, তোমাদের এইসব বড় বড় কথা আমি বুঝতে পারি না। তুমি যাকে গড়ে-তোলা বলে মস্ত বড় গৌরব দিতে চাইছ, আসলে তার উদ্দেশ্য কী ? দুটো পয়সা করা। সেটা যদি অন্য রাস্তায় আরো সহজে পাওয়া যায়, কতকগুলো রিস্‌ক্ ঘাড়ে নেবো কিসের জন্যে ? এই সোজা কথাটা তুমিও স্বীকার করবে, মাল তৈরী করবার দায়িত্ব না নিয়ে, তার পেছনে অজস্র টাকা না ঢেলে, আমি যদি কোনো কারখানার সঙ্গে বন্দোবস্ত করে তাদের তৈরী মালের খদ্দের জোটাবার ভার নিই, তাতে বেশী সুবিধা। এক পয়সা খরচা নেই, মাঝখান থেকে একটা মোটা মুনাফা ঘরে এসে গেল।

ওটাও তো একরকমের ব্যবসা। ওতে টাকা লাগে না ?

লাগে, সামান্য। তাও আমাকে নিজের পকেট থেকে দিতে হবে না। সে টাকা যোগাবার লোক আছে। কত চাও ?

টাকা তো তোমাকে তারা দান করবে না। বড়জোর ধার দেবে।

কে বললে ধার ? তারা দেবে টাকা, আমি দেব আমার জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা, আমরা যাকে বলি, নো—হাউ। সোজাসুজি পার্টনারশিপ।

সুনীতের ঘরটা ঠিক পাশেই। একটা অসমাপ্ত লেখায় হাত

দেবার উদ্দেশ্য নিয়েই সে ঢুকেছিল। কিন্তু একে তো দাদার গলার পর্দাটা এমনিতেই বেশ চড়া, তার উপরে মাকে তার যুক্তিগুলো বোঝাবার জন্যে সেটা আরো খানিকটা উঁচুতে চড়িয়ে দিয়েছিল। তার ফলে লেখার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে সে ঐ কথাগুলোই মন দিয়ে শুনছিল। এবার বেরিয়ে এলো। নেপথ্যে থাকলেও সে যেন শুরু থেকেই এর আলোচনায় যোগ দিয়ে এসেছে, এমনি ভাবে বলল, তার মানে তুমি ব্রোকারদের কথা বলছ, চলতি ভাষায় যাদের বলে দালাল ?

তোমাদের সাহিত্যের ভাষায় কী বলে জানি না। বেশ খানিকটা ব্যঙ্গের সুরে জবাব দিল সুবীর, তবে আসলে এরা হচ্ছে, মাল যারা তৈরী করে আর যারা কেনে, তাদের ভেতরকার লিঙ্ক, যাদের কাজ হলো—

এই দু-তরফ থেকে কিছু লুফে নিয়ে পকেট ভর্তি করা। অর্থাৎ এক ধরনের প্যারাসাইট বা পরগাছা।

যা বুঝিস না, তা নিয়ে কথা বলতে আসিস না। এরা মোটেই প্যারাসাইট নয়, বলতে পার মিডলম্যান, দু-তরফকেই যারা সার্ভিস দেয়। সেটা কারো চেয়ে কম নয়। সব রকম ব্যবসাতেই এদের প্রয়োজন আছে।

হয় তো আছে। তাহলেও যারা ম্যানুফ্যাকচারার, ছোট-বড় নানা রকম শিল্পের ভিতর দিয়ে যারা উৎপাদন বাড়াতে চেষ্টা করছেন, দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি যাদের ব্রত, তাঁদের তুলনায় তোমার এই মিডলম্যানরা অনেক ছোট। রোজগারের দিক থেকে ছোট নয় তা জানি, কিন্তু সমাজে এদের স্থান কোথায়, মর্যাদা কতখানি, সেটা একবার ভেবে দেখো।

তোর ঐ 'সমাজ' কথাটার মানে যদি মান্ধাতার আমলের সমাজ হয়, তাহলে আমার কিছু বলবার নেই, কিন্তু বর্তমান সমাজে এরা কারো চেয়ে ছোট নয়। এখনকার লোকের চোখে কাজটাই বড়

কথা, সেটা কী ধরনের কাজ তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না. তা নিয়ে এর সঙ্গে তার তুলনা করেও দেখে না।

সুনীত এর উত্তরে আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই মালতী শান্ত কিন্তু দৃঢ় স্বরে, বিশেষ করে সুবীরের উদ্দেশ্যে বললেন, ও-সব তর্ক থাক। কোন কাজটা বড় আর কোনটা ছোট তার চুলচেরা বিচারে আমাদের দরকার নেই। পয়সা কোথায় বেশী, আর কোথায় কম, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়েও এখন কোনো লাভ হবে না। ভালো হোক, মন্দ হোক, উনি যখন একটা নতুন কাজে হাত দিয়েছেন, তোমার প্রথম এবং প্রধান কাজ হবে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ানো।

একটু থেমে আবার বললেন, সুনুকেও আসতে হবে: ওর যদি কিছু করবার থাকে। তার আগে তোমার আসা দরকার। কেন না, এটা তোমার লাইন, আর বিশেষ করে তোমার ভরসাতেই তোমার বাবা এত বড় ঝক্কি মাথায় নিয়েছেন।

সুবীরের মুখে গাম্ভীর্যের ছায়া ঘনিয়ে উঠল। যেমন নিচের দিকে তাকিয়ে ছিল তেমনি রইল এবং সেই ভাবেই বলল, বাবা তো আমাকে কিছু বলেননি।

এখনো হয় তো তার সময় হয়নি। যখন হবে, তখন নিশ্চয়ই বলবেন।

এখনি চাকরি ছেড়ে দেবেন, বলছেন নাকি ?

মায়ের দিকে চোখ তুলল। তিনি বললেন, এখন কি করে দেবেন ? তোর একটা কোনো ব্যবস্থা হলো না, ওদিকে কারখানাটাকে দাঁড় করাতেও সময় চাই। তবে ছাড়তে তো একদিন হবেই। তার জন্যে আমাদের সবাইকেই তৈরী থাকতে হবে।

সুবীর আর কোনো কথা বলল না। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসে থেকে বেশ চিন্তান্বিত মুখে উঠে চলে গেল।

চার

সোমবার ভোরবেলা ছেলেকে রওনা করে দেবার আগে জানতে চাইলেন, শনিবার আসছিস তো ? সুবীর বলল, কি জানি ? যদি কোথাও বেরোতে-টেরোতে না হয়, আসবো।

বেরোনো মানে তো গার্ডেন পার্টি, না হয় পিক্‌নিক্।

শিখা যে কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল, সুবীর খেয়াল করেনি। এই টিপ্পনীটুকু কানে যেতেই পিছন ফিরে তার বিনুনি ধরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বলল, নিশ্চয়ই। তুই বুঝি মনে করিস ওগুলো তোদের আর তোদের দিদিমণিদের একচেটে অধিকার !

উঃ, লাগে না বুঝি ! না, সত্যিই এসো দাদা। সবাই মিলে ডায়মণ্ডহারবার যাওয়া যাবে। সেই কবে থেকে ভেবে রেখেছি, একবারও যাওয়া হলো না।

আচ্ছা দেখি তো।

শনিবারে সকালের ডাকে মালতীর নামে একখানা পোস্টকার্ড এসে হাজির—বিশেষ দরকারে আটকে গেলাম, এ সপ্তাহে আর যাওয়া হলো না।

বিশেষ দরকার বলতে এরা বুঝলেন পার্টি পিক্‌নিক্ বা ঐ জাতীয় কিছু নিশ্চয়ই নয়, মালিকদের তরফ থেকে এমন কোনো আয়োজন যাতে যোগ দেওয়া অ্যাপ্রেন্টিসদের পক্ষে কাগজে-কলমে ঐচ্ছিক হলেও কার্যত অবশ্যক। আসলে অন্য ব্যাপার। রবিবার আটটায় চীফ এঞ্জিনিয়ার দত্ত সাহেবের বাংলোয় ব্রেকফাস্টের নিমন্ত্রণ। দুদিন আগেই বেয়ারা মারফত বলে পাঠিয়েছেন মিসেস দত্ত। সুবীরের কাছে সেটা অবশ্যই 'বিশেষ দরকার'।

আটটা পর্যন্ত অপেক্ষা করা পোষাল না। মিনিট পনের বাকী থাকতেই একটু বিশেষ রকমের সাজগোজ করে দত্ত সাহেবের

ড্রইংরুমে পৌঁছে গেল। বেয়ারা সবে তখন আসবাবপত্র ঝাড়ামোছার পাট শেষ করে এনেছে। ওকে বসিয়ে ওদিকের লাইনে বার দুই ঝাড়ন চালিয়ে সেটা কাঁধে ফেলে বলল, আপনি বসুন। আমি মেমসায়েবকে খবর দিয়ে আসি।

সুবীর হাতঘড়ির দিকে একপলক তাকিয়ে বলল, আরেকটু পরে দিলেই হবে। তাড়াতাড়ি কিছু নেই।

দিদিমণিকে ডেকে দেবো? চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ কি মনে করে ফিরে দাঁড়িয়ে জানতে চাইল বেয়ারা।

সুবীর সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। মুহূর্তকাল ইতস্তত করে বলল, তিনি কী করছেন?

পড়বার ঘরে আছেন বোধহয়।

তাহলে থাক। তুমি বরং আজকের খবরের কাগজটা দিয়ে যাও।

বেয়ারা চলে গেল। সুবীর ওপাশে পিতলের টপওয়ালা টিপয়ের উপর থেকে একখানা এঞ্জিনিয়ারিং জার্ণাল টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগল। মিনিট-তিনেক পরে একঝলক স্নিগ্ধ মিষ্টি গন্ধ নাকে যেতেই হঠাৎ চোখ তুলে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এই দেখুন, চাইলাম কাগজ, আর বেয়ারাবাবু শেষ পর্যন্ত আপনাকে টেনে এনে ছাড়ল।

না, আমি নিজেই এলাম। এইটুকু জানাতে, যে আজকের কাগজের জন্য আপনাকে আরো অন্তত আধঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে।

ও, তাইতো! আমারই ভুল। এখানে যে সাড়ে আটটার আগে কাগজ আসে না, হঠাৎ খেয়াল ছিল না।

খেয়াল না থাকাই স্বাভাবিক। আজ এই সময়ে আপনার যেখানে থাকার কথা, সেখানে ছ'টা বাজার আগেই কাগজ এসে যায়। হয়তো মনে মনে সেখানকার কথাই ভাবছিলেন।

না তো।

ভাবেননি? তাহলে এও হতে পারে যে তারা ভাবছিলেন, আর সেই ভাবনাটা আপনার মনে এসে গেছে, ইংরেজীতে যাকে বলে টেলিপ্যাথি।

না, তাদেরও ভাববার কথা নয়। এ সপ্তাহে যেতে পারব না, আগেই লিখে দিয়েছি।

না যাবার কী কৈফিয়ৎ দিলেন?—সামনের সোফাটায় বসে পড়ে মাথাটা এক দিকে হেলিয়ে বিশেষ দৃষ্টিতে তাকাল সুতপা।

কৈফিয়ৎ আবার কী দেব?

দেননি!

একটু যেন শ্লেষের সুর ছিল প্রশ্নটার মধ্যে। সুবীরের তাই মনে হলো এবং বোধহয় তার পৌরুষ কিঞ্চিৎ আহত হয়ে থাকবে। তাই একটু ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, বাঃ! আমি কি ছেলেমানুষ নাকি?

আর ইউ স্যিওর অ্যাবাউট দ্যাট?, বলেই, যে হাসিটি এতক্ষণ বন্দী হয়েছিল শুধু চোখের তারায় এবং ঠোঁটের কোণে, তার বাঁধন খুলে দিল। ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল তার মধুর ঝঙ্কার।

চীফ এঞ্জিনিয়রের এই খর-রসনা কন্যাটির কাছে এলেই সুবীর কেমন যেন মিইয়ে পড়ে, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, কথা বেধে যায়। অথচ দূর থেকে এ যে কি বিপুল বেগে টানে, সেটা জানেন শুধু তার অন্তর্যামী। তবু কেন সহজ হতে পারে না, কী আছে ওর মধ্যে, অনেক সময় ভেবে দেখবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আজও ওটা তার কাছে রহস্যই রয়ে গেছে। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, ঐ দুটো উজ্জ্বল কালো চোখের সুতীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি ওর সম্বন্ধে সুবীরের গোপন মনে যত দুর্বলতা, যত মোহ সবটুকু ধরে ফেলে দিয়েছে। তাই ও উচ্চাসনে বসে রানীর মতো তাকায়, আর সে নিচে দাঁড়িয়ে ধরা-পড়া চোরের মতো জড়সড় হয়ে থাকে।

সুতপার হাসির মধ্যে যে মাধুর্য ছিল, সুবীরকে অভিভূত করে দিল। তেমনি তার প্রচ্ছন্ন একটি সূক্ষ্ম পরিহাসের ধার তার মনের

কোণ স্পর্শ না করে পারল না। সে কি শুধু পরিহাস? তাহলে হয়তো বিঁধত না। তার সঙ্গে জড়ানো একটু যেন বিদ্রূপের বাঁকা টান। ওর ঐ চোখের কোণেও তার আভাস আছে। সুতপা বোধ হয় মনে করে, সুবীরের মধ্যে পুরুষোচিত দৃঢ়তার অভাব। তার কাজে, কথায় বা আচরণে ব্যক্তিত্বের ছাপ নেই। সে যেন বড় বেশী পরিমাণে বাপ-মায়ের ন্যাওটা ছেলে। তাদের ইচ্ছাকে নিজের জীবনে রূপ দেওয়ার মধ্যেই তার সার্থকতা। তার নিজস্ব কোনো পথ নেই, নিজের চিন্তাধারাকে অনুসরণ করবার, নিজের শক্তিকে ইচ্ছামত নিয়োজিত করবার আকাঙ্খা নেই। নিজের স্বার্থকে আলাদা করে দেখতে শেখেনি। সে যেন শুধু পারিবারিক স্বার্থের তল্পিবাহক।

এসব বা এই জাতীয় কোনো কথা সুতপা মুখ ফুটে কখনো বলেনি। সুবীরের সম্বন্ধে এইটাই যে তার ধারণা, তেমন কোন স্পষ্ট ইঙ্গিতও দেয়নি। তার হাসিতে, মুখের ভাবে চালচলনে, ব্যঙ্গ-মেশানো ঠাট্টা-তামাসায়, বিশেষ করে যখনই কোন সূত্রে সুবীরের বাড়ির প্রসঙ্গ উঠেছে, তখনকার ছোট ছোট মন্তব্যে, যাকে ফোড়ন বলাই ঠিক, এই রকম একটা মনোভাবের আভাস পাওয়া গেছে। হয়তো তার মধ্যে অনেকখানিই তার কল্পনা। কিন্তু একে সত্য বলে ধরে নিয়েই সে সুতপার সামনে নিজের স্বতন্ত্র সত্তাকে প্রকাশ করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করে এসেছে। মিসেস দত্তের এই ব্রেকফাস্টের নিমন্ত্রণ যেন তারই একটা সুযোগ। এর দ্বারা একটা কথা অন্তত প্রমাণ করা যাবে, যে ছুটি পেলেই সে বাড়ির পানে ছোটে না, (কথাচ্ছলে একবার কোন পিকনিকে এক ফাঁকে ঐ রকম একটা ছোট্ট টিপ্পনী কেটেছিল সুতপা) ছুটিগুলোর যথেচ্ছ ব্যবহারের স্বাধীনতা তার আছে।

কিন্তু সব চেয়ে বড় বিপদ, সুতপার সান্নিধ্যে এলেই তার ভিতরকার সেই স্বাধীন মানুষটি যেন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। এই মুহূর্তে

ঐ সামনের সোফা থেকে মধুর কণ্ঠে এবং নিখুঁত ইংরেজি উচ্চারিত ঐ ছোট্ট প্রশ্নটি এবং তার পরেই তার মারাত্মক হাসির লহর একেবারে সোজা এসে সুবীরের মেরুদণ্ডের উপর পড়ল। উত্তরে কি যে বলা যায় ভেবে পেল না। হঠাৎ মনে হলো, তাড়াতাড়ি করে নির্দিষ্ট সময়ের খানিকটা আগে এসে পড়াটা তার ঠিক হয়নি। এর মধ্যেও অনেকখানি দুর্বলতা রয়ে গেছে। মনে মনে তারই একটা যুৎসই কৈফিয়ৎ বের করতে গিয়ে হঠাৎ খাপছাড়া ভাবে বলে ফেলল, একটু আগেই এসে পড়লাম।

তাই তো দেখছি, নিজের ছোট্ট হাত-ঘড়িটার দিকে চোখ রেখে বলল সুতপা, আটটা বাজতে এখনো মিনিট চারেক বাকী। এই সময়টা একটু ঘুরে আসতে চান না নাকি?

কে ঘুরে আসবে? বলতে বলতে মিসেস দত্ত ঘরে এসে ঢুকলেন এবং সুবীরকে একটা কঠিন অবস্থা থেকে উদ্ধার করলেন। সুতপার প্রস্তাব মতো হয়তো সত্যিই তাকে ঘুরে আসবার জন্যে উঠে পড়তে হতো।

মায়ের কথার উত্তরে সুতপা ছদ্ম গাম্ভীর্যের সুরে বলল, সুবীরবাবু।

কেন, ঘুরে অসতে যাবে কিসের জন্যে?

বড্ড আগে এসে পড়েছেন কিনা?

কোথায় আগে এসে পড়েছে? এলেই বা কী? তুই বুঝি তাই বলছিলি?

না-না, আমি কেন বলতে যাবো। উনিই ভাবছিলেন। তাই আমি বললাম, চান তো কিছুক্ষণ ঘুরে আসতে পারেন।

ছ্যাখ দিকিনি কাণ্ড, বলে হেসে ফেললেন মিসেস দত্ত। তারপর বললেন, তুমি কিছু মনে করো না, সুবীর। ওর কথাবার্তাই ঐরকম। বাজে কথা রেখে ছ্যাখ তো ওদিকে ওরা কী করছে? আর কত দেরি করবে?

যেতে যেতে স্বতপা একবার স্ববীরের দিকে তাকাল। সেই মুহূর্তে স্ববীরও তাকে দেখছিল। চোখে চোখ পড়তেই বুকের ভিতরটা আড়ষ্ট হয়ে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিল।

মিসেস দত্ত চোখের কোণ দিয়ে দুজনকেই দেখলেন। তিনি জানেন, তাঁর কন্যাটি রূপসী নয়, কিন্তু সে অভাব পূর্ণ করেছে তার লীলা-চাতুর্য। তার মুখের ঐ অর্ধস্ফুট হাসিটিকে এদিকের এই প্রিয়দর্শন আনত মুখখানার সঙ্গে মিলিয়ে দেখে অনেকটা আশ্বস্ত হলেন। মনটা মেয়ের উপর খুশি হয়ে উঠল। সত্যিই তার কৃতিত্ব আছে। এতদিন ধরে যে স্থযোগ তাকে দিয়ে এসেছেন, সেটা সার্থক হতে চলেছে। স্বতপার ঐ হাসি শুধু একটা অর্থহীন হাসি নয়, মেয়েদের মুখে সাধারণত যা লেগে থাকে, ওটা তার বিজয়-চিহ্ন।

তাঁর তরফ থেকে এখনো অনেক কিছু করবার আছে, অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। সেই দিকেই নজর দিলেন মিসেস দত্ত। প্রথমেই স্ববীরের বাপ-মা ভাই-বোনের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খোঁজখবর নিলেন। তার বাবার কাজকর্ম সম্পর্কেও দু-একটা প্রশ্ন করলেন। তারপর বললেন, ওঁর কাছে শুনছিলাম তোমাদের ট্রেনিং শেষ হতে আর দেরি নেই। তারপর তো এরাই তোমাদের অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দেবে।

হ্যাঁ, অন্তত দু-বছর তো থাকবেই হবে এদের ফার্মে। তার আগে মুক্তি নেই।

সে কথা বলছ কেন? এখানটা কি তোমার ভালো লাগছে না? এত বড় নাম-করা ফার্ম, মাইনেপত্তরও অন্য অনেক জায়গার চেয়ে ভালো দেয়, ব্যবহারও ভালো। তারপর উনি রয়েছেন মাথার ওপর। তোমায় যদি কোথাও কোনো অস্থবিধা থাকে—

না, না, অস্থবিধা কিচ্ছু নেই। চাকরি হিসেবে এখানকার সঙ্গে কোনো জায়গার তুলনা চলে না। সব চেয়ে বড় কথা, এ রকম

সি, ঈ, কোথায় ? ওঁর কাছে কাজ করা সত্যিই ভাগ্যের কথা। সে-সব দিক থেকে কিছুই বলবার নেই। আমার ব্যাপারটা একটু আলাদা।

ও, তুমি তোমার বাবার ফ্যাক্টরীর কথা বলছ ? তিনি কি তোমাকে সেখানে নিয়ে যেতে চাইছেন ?

না। এখনো সে-সব বিষয়ে কোনো কথা হয়নি। আরো দু-বছর যে এখানে আমাকে থাকতেই হবে তা তিনি জানেন। অবিশ্যি, আমাদের কাছ থেকে যে বণ্ড নেওয়া হয়েছিল, তাতে একটা ক্লজ আছে—অ্যালাউন্সের পুরো টাকাটা দিয়ে দিলে ওদের ছাড়তে আপত্তি নেই।

সেটা কি ঠিক হবে ?

মিসেস দত্তের কণ্ঠে রীতিমত দুশ্চিন্তার আভাস পাওয়া গেল। সুবীর আশ্বাস দিল, খুব সম্ভব বাবা তা করতে যাবেন না। তাঁর নিজেরই এখন টাকার দরকার। তবে দু-বছর পরে হয় তো চাইবেন, চাকরি ছেড়ে দিতে। নিজেদের ফার্ম, কাজেই আমার তরফ থেকে তখন বলবার কিছু থাকবে না।

মিসেস্ দত্ত সঙ্গে সঙ্গে কোনো কথা বললেন না। নিবিষ্টভাবে ভাবতে লাগলেন। তাঁকে বেশ চিন্তান্বিত দেখাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলে বললেন, তুমি কিছু মনে কোরো না, সুবীর। কারো পারিবারিক ব্যাপারে বাইরের লোকের নাক-গলানো অন্যায়, তাতে সন্দেহ নেই! এর পরে আমার কিছু না বলাই উচিত ছিল। তবে কি জান? তোমাকে কবে থেকে দেখছি, আমাদের সকলেরই তোমার ওপর একটা মায়া পড়ে গেছে। তুমি আসছ যাচ্ছ, বাড়ির ছেলের মতো মিশছ, আমরাও তোমাকে ঠিক সেই চোখেই দেখি। তোমার ভাল-মন্দ, তোমার ভবিষ্যৎ একেবারে না ভেবে পারি না। তুমিও নিজের সম্বন্ধে এমন অনেক কথা আমাদের কাছে বলেছ, যা শুধু আপনজনকেই বলা চলে। সেই জোরে

তোমাকে শুধু একটি কথা বলতে চাই। তোমার বাবা যা বলবেন, অবশ্যই মানতে হবে। তবে তিনি হয় তো আজকাল এই রকম বড় বড় ফার্মে যারা কাজ করছে, সেই সব এঞ্জিনিয়ারদের চাকরির ধরন-ধারন, তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, এ সব ব্যাপারে ততটা অভিজ্ঞ নন। কাজেই কিছু একটা স্থির করবার আগে তুমি ওঁর সঙ্গে একবার আলোচনা করতে ভুলো না। উনি তো তোমার কাছে শুধু সি-ঈ নন, তার চেয়ে অনেক বেশী।

সুবীর অভিভূত হয়ে শুনছিল। মিসেস্ দত্ত তাকে যে কত স্নেহ করেন, তার শুভাশুভের সঙ্গে কতখানি জড়িত, সবই সে জানে এবং কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করে। এইমাত্র তাঁর মুখ থেকে যে কথাগুলো সে শুনল, তার প্রতিটি শব্দ তার অন্তর স্পর্শ করল। উপদেশ হিসাবেও সেগুলো অত্যন্ত মূল্যবান। উত্তরে সেও যদি অমন সুন্দর করে, সাজিয়ে তার মনের ভাবগুলোকে বাইরে আনতে পারত! কিন্তু বিধাতা সে দিক দিয়ে তাকে বঞ্চিত করেছেন। গুছিয়ে কথা বলার আর্ট তার জানা নেই। বিশেষ করে এঁদের কাছে সে মুখ খুলতে পারে না। কেবলই মনে হয়, মনে যা ছিল সেটা ঠিকমতো বলা হলো না।

এই মুহূর্তে তার সেই নিদারুণ অক্ষমতা সে অতি তীব্রভাবে অনুভব করছিল। অথচ চুপ করে থাকাটা শুধু অশোভন নয়, মিসেস্ দত্ত হয় তো তাকে ভুল বুঝবেন, এ আশঙ্কাও ছিল। তাই নড়ে-চড়ে বসে গলাটা সাফ করে নিয়ে শুরু করল, আপনাদের দয়া, শুধু দয়াই বা বলি কেন, স্নেহ, বিশেষ করে—

এই পর্যন্ত আসতেই, সহসা ঝড়ো হাওয়ার মতো চারদিকে একটা প্রাণময় চাঞ্চল্যের ঢেউ তুলে ঘরে ঢুকল সুতপা। মায়ের পিছনে দাঁড়িয়ে দু-হাতে তাঁর সোফার পিঠে নাড়া দিয়ে বলল, চল, চল, সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

মিসেস্ দত্ত হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, তাই তো, কথায় কথায় অনেক দেরি হয়ে গেছে। উনি কোথায়?

বাবাকে ডাকতে পাঠিয়েছি। এতক্ষণে বোধহয় নেমে পড়েছেন।

চলো বাবা, সুবীরের উদ্দেশে বললেন গৃহিণী। এগিয়ে যেতে যেতে যোগ করলেন, তপা, ওকে নিয়ে আয়।

সুবীর উঠতেই তার একান্ত কাছটিতে সরে এলো সুতপা। ফিসফিস করে বলল, স-রি, আপনার বক্তৃতায় বাধা দিলাম। কী আর করা যাবে? বাকীটা না হয় ব্রেকফাস্টের পরে সেরে নেবেন। কি বলেন?

উত্তরে যা হোক কিছু একটা বলবার চেষ্টা করল সুবীর। কিন্তু মনে মনে তোড়জোড় করতে করতেই খাবার টেবিলে পৌঁছে গেল। বলা আর হলো না।

পাঁচ

শিক্ষানবিশি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সুবীর যথারীতি ওখানকার চাকরিতেই বহাল হলো। অ্যাসিট্যান্ট এঞ্জিনিয়ার। থাকবার কোয়ার্টার্সও পেয়ে গেল কারখানার বিস্তীর্ণ হাতার মধ্যে। দু-রকমের বাড়ি আছে ওদের জন্যে। যারা বিবাহিত, তাদের দুখানা শোবার এবং একটা বসবার কামরা, তার সঙ্গে রান্নাঘর, স্নানের ঘর ও খাবার জায়গা, ওঁদের ভাষায় ডাইনিং স্পেস। সামনে খোলা বারান্দা, তারপরে একফালি জমি—বাগান করবার জন্যে। অবিবাহিত এঞ্জিনিয়ারদের বাড়িগুলো আর একটু ছোট। শোবার ঘর একখানা, বাকী সব একই রকম। শুধু ঘরগুলো বোধহয় মাপে কিছু কম।

নিয়মমতো সুবীরের ঐ ছোট ধরনের (কোম্পানীর খাতায় যার নাম বি-টাইপ) বাড়িই প্রাপ্য ছিল। কিন্তু চীফ এঞ্জিনিয়ার ব্যবস্থা

করে ওকে একটা বড় অর্থাৎ 'এ টাইপ' বাংলো পাইয়ে দিলেন, অবশ্য আর একজন সহকর্মীর সঙ্গে। সেও ব্যাচিলর। একজনের পক্ষে আলাদাভাবে রান্না-খাওয়ার বন্দোবস্ত করায় অনেক অসুবিধা, খরচও বেশী পড়ে। তার চেয়ে দুজনে মিলে মেস করে থাকা, (ওদের ভাষায় চার্মিং) সব দিক দিয়েই ভালো। কোম্পানী কোনো আপত্তি করেনি। নতুন এঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে অনেকেই অবিবাহিত। বড় বাড়ির চেয়ে ছোট বাড়ির চাহিদাই বেশী।

প্রথম দিকের অবস্থা তাই থাকে, কিন্তু ক্রমশ উল্টে যায়। চাকরি-বাকরি পাবার পর অবিবাহিতের সংখ্যা দ্রুত কমতে থাকে, সেই সঙ্গে 'এ-টাইপ' কোয়ার্টাসের প্রয়োজন বাড়ে, কখনো কখনো দুর্ঘট হয়ে পড়ে। তখন বিবাহিত হলেও ছোট বাড়িতে গিয়ে উঠতে হয়। সেই সব সম্ভাবনার কথা ভেবেই মিসেস দত্ত স্বামীকে দিয়ে সুবীরের জন্য একটি বড় বাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

স্ত্রীর কাছ থেকে প্রস্তাবটা যখন এলো, এর পিছনে যে নিগূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত আছে, সেটা ঠিক ধরতে পারেননি মিঃ দত্ত। বলেছিলেন, একা মানুষ, অত বড় বাড়ি দিয়ে কী করবে?

আহা, আজ না হয় একা, বরাবর তো একা থাকবে না।

ও, সেই কথা! কিন্তু ভবিষ্যতে কি হবে না হবে, তা দিয়ে তো আর বর্তমান ব্যবস্থা বদলে দেওয়া যায় না। কোম্পানী শুনবে কেন?

শুনবে এই জন্যে, যে ওর ভবিষ্যতের সঙ্গে তাদের সি-ঈ-র স্বার্থ জড়িয়ে আছে। সেটা অবিশ্যি উহ্য রাখতে হবে।

এবার বুঝতে পারলেন মিস্টার দত্ত। এই ছেলেটির সম্পর্কে স্ত্রীর মনের ইচ্ছাটা তিনি জানতেন এবং তার পিছনে তাঁর নিজেরও সমর্থন ছিল। সুবীর ও সুতপার হাবভাব চালচলনেও তার প্রতিফলন লক্ষ্য করেছিলেন।

গৃহিণীর দূরদৃষ্টি দেখে চমৎকৃত হলেন। বললেন, তাই তো, এসব

আমার একেবারেই মাথায় আসেনি। ঠিক বলেছ। এর পরে বাড়ি পাওয়া মুশকিল হতে পারে।

মিসেস দত্ত মনে মনে পুলকিত। বাইরে বিস্ময় প্রকাশ করলেন,

এই মাথা নিয়ে কী করে যে এতবড় একটা ফ্যাক্টরী চালাও, আমি তো ভেবে পাই না, বাপু।

কেন, মাথাটা তো একা নয়, তার পাশে এটি আছে কী করতে? বলে, ব্ল্যাকউড অ্যাণ্ড সনস্ কোম্পানীর অতবড় রাশভারী প্রবীন চীফ এঞ্জিনিয়র বীরেশ্বর দত্ত পার্শ্ববর্তিনীর একান্ত কাছটিতে এগিয়ে গিয়ে তাঁর শুধু মাথা নয়, সেই সঙ্গে চিবুকটা ধরে নেড়ে দিলেন।

একজনের জন্যে একটা 'এ-টাইপ' বাড়ি সুপারিশ করা নেহাৎ দৃষ্টিকটু এবং সি-ঈ-র মতো ব্যক্তির পক্ষে শোভন নয়। তার উপরে যাকে সেখানে বসানো হচ্ছে ওঁদের কাছে সে যে-কোনো একজন নয়, বিশেষজন, একথা যখন জানাজানি হয়ে যাবে, তখন কর্মীদের মধ্যে শুধু কানাকানি শুরু হবে না, কোম্পানীর কাছেও তাঁর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। তাই সুবীরের সঙ্গে আর একটি ছেলেকে জুড়ে দেবার পরামর্শ মিসেস দত্তই দিয়েছিলেন। এখানেও তাঁর বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া গেল। এই কৌশলটুকু প্রয়োগ না করলে কোম্পানীকে রাজী করানো হয়তো কঠিন হতো।

গোড়াতে সুবীরের কাছে কথাটা পাড়তে গিয়ে মিসেস দত্ত তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কোনো আভাস দেননি। শুধু বলেছিলেন, এতদিন কাটিয়েছ হস্টেলে। বাজার থেকে কী আসবে, কী রান্না হবে, এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়নি। এখন একা বাড়িতে একটা চাকর নিয়ে কী করে যে চালাবে, তাই ভাবছি।

ও ঠিক চালিয়ে নেবো। আর সবাই যদি পারে আমাকেও পারতে হবে।

সবাইয়ের কথা ছেড়ে দাও। ওদের তো আমি জানি। অতি

সাধারণ পরিবারের ছেলে। অনেকেই কষ্টে মানুষ হয়েছে। ওরা ছেলেবেলা থেকেই সংসারী। তুমি তো বাবা ওদের দলে পড় না।

এই কটি কথায়, বিশেষ করে শেষের দিকে তাঁর কণ্ঠে যে গভীর দরদ ফুটে উঠল, আড়-চোখে তাকিয়ে শ্রোতার উপরে তার ফলাফলটা একবার দেখে নিলেন। দেখলেন, সবটাই সফল। সুবীরের সমস্ত মুখখানা বেশ একটু গর্ব-মেশানো খুশিতে উজ্জ্বল।

যারা আমার সমকক্ষ এবং সমশ্রেণী তাদের থেকে আমি স্বতন্ত্র, আমার একটা বৈশিষ্ট্য আছে, একথা শুনলে কে না খুশি হয়? বিশেষ করে, সেটা যদি এমন একজনের মুখ থেকে শোনা যায়, যাকে আমি শ্রদ্ধা করি, যার মতামতের মূল্য আমার কাছে অসামান্য।

মিসেস দত্ত যেন হঠাৎ একটা সমাধান খুঁজে পেয়েছেন, এমনিভাবে বললেন, আচ্ছা, এক কাজ কর না কেন? তোমার সঙ্গে মিশ খায়, বেশ ভাব আছে এমন এক বন্ধু জুটিয়ে নিয়ে দুজনে মিলে একটা 'এ-টাইপ' বাড়ি নাও না কেন?

তাহলে তো খুব ভাল হয়। কিন্তু 'এ-টাইপ' আমাদের দেবে কি?

দেবে কিনা, সে ভাবনা তোমার নয়। সেটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও। তোমাকে খালি ভাবতে হবে এ রকম একটি বন্ধু তোমার আছে কিনা।

তা আছে বৈকি! ঐ তো নিলয় রয়েছে। আমার জন্যে ও সব করতে পারে। এদিকে বেশ চৌকস ছেলে। যাকে বলে পাকাপোক্ত।

মিসেস দত্ত যখন ছেলেটিকে মনে করবার চেষ্টা করছেন, সুবীর তাঁকে সাহায্য করল, ওকে আপনি দেখেছেন, রোগা লম্বা। ভাল ভায়োলিন বাজাতে পারে। আমাদের ক্লাবে ফ্যাংশান-ট্যাংশানে কয়েকবার বাজিয়েছে।

ও-ও, সেই ছেলেটি? ওকে তো আমি চিনি। আমার এখানে এসেছে দু-একবার। ও তোমার খুব বন্ধু বুঝি?

খু-উ-ব। নিলয় যা ক'রে এ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে, শুনলে আশ্চর্য হবেন। বাবা ভাল চাকরি করতেন, হঠাৎ মারা গেলেন। তখন ও খুব ছোট, স্কুলে পড়ে। টাকাকড়ি যা ছিল, কাকারা সব ফাঁকি-টাকি দিয়ে নিয়ে নিল। রইল খালি ছোট্ট একখানা একতলা বাড়ি। তারই খানিকটা ভাড়া দিয়ে, সন্ধ্যাবেলা ছেলে পড়িয়ে, নানা কাণ্ড করে ওকে পড়াশুনা করতে হয়েছে। রেজাল্ট আগাগোড়া ভাল। গেল বছর ওর মা-ও মারা গেছেন। এখন একেবারে একা।

থাক সুবীর। ও-সব কথা শুনলে আমার কষ্ট হয়। আমাদের দেশে এ-রকম পরিবার যে কত আছে!

মিসেস্ দত্তের এই উক্তিটিও বড় করুণ শোনাল, এবং সুবীরের মনকে স্পর্শ করল। কিন্তু বক্তার মনের ভিতরটা যদি সে দেখতে পেত, তাহলে দেখত যে, সেখানে বেশ নির্ভাবনার ভাব জেগে উঠেছে। নিলয়ের কাহিনী থেকে তাঁর যেটুকু পাবার তিনি পেয়ে গেছেন। এটুকু বুঝে নিয়েছেন যে, ভবিষ্যতে, ঈশ্বর-ইচ্ছায় অদূর ভবিষ্যতে, ঐ বাড়িখানা যখন সুবীরের পুরোপুরি দখল করবার প্রয়োজন হবে, এই পার্টনারটিকে অনায়াসে সরিয়ে দেওয়া যাবে। সকলের বেলায় হয় তো সেটা সহজসাধ্য হত না। কিন্তু এই ছেলেটির সঙ্গে সুবীরের যে সম্পর্ক, ও নিজে থেকেই সরে যাবে।

কথা হচ্ছিল সকালবেলা, মিসেস্ দত্তের সুসজ্জিত ড্রইংরুমে। সুবীরকে তিনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন। এবার ওর ওঠা দরকার। কাজে বেরোবার সময় হলো। উঠতে গিয়েও মনে হচ্ছিল, একবার কোনো সুযোগে যদি আরেকজনের সঙ্গেও দেখাটা হয়ে যেত! মিসেস্ দত্ত অন্তর্যামী নন। তবু বোধহয় তাঁর তরুণ অতিথির অন্তরের কথাটা জানতে পারলেন। বললেন, সুবীর, তুমি বসো। আমার একটু কাজ আছে।

সুবীর আর হাত-ঘড়ির দিকে চেয়ে বলল, আমিও এখন চলি।

দু-মিনিট বসো। একটু কফি খেয়ে যাও। ওঁর এক বন্ধু বাঙ্গালোর থেকে পাঠিয়েছেন। তাঁর নিজের বাগানের কফি।

কফি এলো এবং তার পিছনেই সেই প্রার্থিত জন। সুবীরের কাছে শুধু 'জন' নয়, আরো অনেক কিছু, যাকে কথার ছাঁচে ফেললে নেহাৎ জোলো কবিত্বের মতো শোনায়, (এই যেমন—এক ঝলক আলো, কিংবা একরাশ চঞ্চল হাওয়া) অথচ মনের ভিতরে যে রূপটি রয়েছে তার সামান্য আভাসও দেওয়া যায় না। আরো মুস্কিল, সুবীরের ভাষা এ-সব ব্যাপারে শুধু আড়ষ্ট নয়, পঙ্গু।

ও-তরফের ভাবে বা ভাষায় কোনোরকম গভীরতার লক্ষণ প্রকাশ পেল না। সুবীর যে কৌচটায় বসেছিল, তার পাশের সোফায় ধপ করে বসে পড়ে স্প্রিংএর দোলায় দুলে ওঠে সুতপা। প্রথমে একটা মস্ত বড় হাঁফ ছাড়ল, তারপর বলল, যাক, একটা কঠিন সমস্যা মিটে গেল।

কিসের সমস্যা? সুবীরের চোখে-মুখে প্রচুর বিস্ময়।

সত্যি, চাকরি পেয়ে কী আতান্তরেই না পড়েছিলেন!

সুবীর তখনো কিছুই বুঝতে পারছে না, তেমনি অবাক হয়ে চেয়ে আছে।

সুতপা, যেমন তার নিয়ম, ঘাড়টা একপাশে একটু নুইয়ে তার দিকে তাকাল। সেই সঙ্গে একটি মধুর হাসি উপহার দিয়ে বলল, এবার খুব খুশি তো? কেমন একজন মনের মতো চৌকস গার্জেন পেয়ে গেলেন। তা না হলে কী যে হত আপনার, তাই ভাবছি।

'চৌকস' শব্দটা এমন জোর দিয়ে উচ্চারণ করল, বোঝা গেল ওটা উদ্ধৃতি।

সুবীর আকাশ থেকে পড়ল, গার্জেন! সে আবার কে?

ঐ যে, আপনার ভীষণ বন্ধু, কি নাম যেন, বিলয়, না প্রলয়!

ও-ও, নিলয়? বলে, হেসে উঠল সুবীর।

সুতপার হাসি ও দুষ্টুমি-ভরা চোখ দুটি তখনো তার মুখের

দিকে চেয়ে আছে। সুবীরের মনে হলো, এত সুন্দর এবং এমন দুর্দান্ত সুন্দর ওকে আর কখনো দেখায়নি। সেই মুহূর্তে, কেমন করে কে জানে, তার জিহ্বার সেই জড়তা হঠাৎ কোথায় মিলিয়ে গেল। বেশ সহজ সুরে বলে উঠল, গার্জেন হলেও, ও তো টেম্পোরারী। পার্মানেণ্ট গার্জেনটি যদ্দিন না আসছেন, তদ্দিন ভাবনা কাটছে কই?

পার্মানেন্ট গার্জেন মানে? একটু বোধহয় সচকিত হলো সুতপা।

সুবীর এবার পূর্ণ দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, সব কথার কি আর মানে থাকে, সুতপা। না, থাকলেই তা বলা যায়। যাক্, এবার আমি উঠি।

এক লাফে উঠে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। এদিকে আর ফিরে তাকাল না। তাকালে দেখতে পেত, যার উদ্দেশ্যে বলা, তার মুখের সেই প্রগলভ হাসিটি আর নেই, চোখের সে চঞ্চল দৃষ্টিও হঠাৎ চলে গেছে। তার বদলে দেখা দিয়েছে ভীরু, কোমল, রক্তিমাভায় জড়ানো একটি প্রশান্ত গাম্ভীর্য।

এমন স্পষ্ট, সহজ, সাবলীল অথচ গভীর উক্তি সুবীরের মুখে আজ সে প্রথম শুনল। কোথা থেকে যেন একরাশ অকারণ আনন্দ এবং তার সঙ্গে একটি মধুর লজ্জার আবেশ এসে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

সুবীর ভাবতে ভাবতে যাচ্ছিল, এই কথাগুলো সে এমন করে বলতে পারল কেমন করে। সে হয়তো তখনো জানে না, সব মানুষের অন্তস্থলেই একটি নিভৃত গোপন মণিকোঠা আছে। তার মধ্যে অতর্কিতে একদিন কোথা থেকে একটি বিশেষ পরশমণির আবির্ভাব ঘটে। সেই আশ্চর্য লগ্ন যখন আসে, তখন সে সব পারে। সেই পরশমণি তার জাদুস্পর্শ দিয়ে অসাধ্য সাধন করায়। অন্ধকে যেমন চক্ষুষ্মান করে, তেমনি মূকং করোতি বাচালং। মুখ ফুটে

যে মনের কথা কোনোদিন বলতে পারেনি, তাকেও সহসা বাঙ্ময় করে তোলে।

ছয়

সুবীরের চাকরি হবার খবর পেয়ে মালতী প্রথমেই ভাবলেন, একটা ভাল দিন দেখে কালীঘাটে গিয়ে পূজো দিয়ে আসতে হবে। তারপরেই যে কথাটি মনে এল, সেটা তাঁর পুরনো ভাবনা, এতদিন ধরে যা ভেবে এসেছেন, যার অপেক্ষায় একটি একটি করে দিন গুণছেন—আরেকজনকে এবার চাকরি ছাড়তে হবে। আর দেরি নয়। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। এতদিন তিনি জোর পাননি। বলতে গিয়েও থেমে গেছেন। সুহৃদ যে উত্তর দেবেন তা তো তাঁর অজানা নয়। মুখে সেই হাসিটি ঠিকই থাকবে, কিন্তু কণ্ঠে যে একটি নিরুপায়ের সুর বেজে উঠবে, শত চেষ্টাতেও তাঁর কাছে সেটা চাপা থাকবে না। বলবেন, ছাড়বো তো বুঝলাম। তারপর? একটুখানি থেমে হয় তো যোগ করবেন, চলবে কেমন করে? মালতীর আর কোনো জবাব নেই। তিনি জানেন, কারখানাটা এখনো পুরোপুরি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেনি। যা দিচ্ছে তার থেকে অনেকখানি আবার তার পিছনেই ঢালতে হচ্ছে।

ব্যাপারটা সেদিন চমৎকার করে বুঝিয়েছিলেন সুহৃদ, গরু বাচ্চা দেবার পর প্রথম কিছুদিন গয়লারা কি করে জান তো?

মালতী বলেছিলেন, জানি, দুধটা ঐ গরুকে খাইয়ে দেয়।

আমাকেও এখন তাই করতে হচ্ছে। বাঁট থেকে যা পাচ্ছি, তখনি নিয়ে মুখের কাছে ধরছি।

এর পরে কেমন করে চলবে, সে প্রশ্নের আর কী জবাব থাকতে পারে? কিন্তু এবার আর জবাবের জন্যে ভাবতে হবে না। সুবীর যা-ই তাঁর হাতে তুলে দিক তাই দিয়েই তিনি চালিয়ে নিতে

পারবেন। দরকার হলে দুটি ঝি-এর একটিকে ছাড়িয়ে দেবেন। একজন শুধু বাসন ক'খানা মেজে রান্না আর খাবার ঘরটা ধুয়ে দিয়ে যাবে। বাকী সব কাজ নিজেদের। পরনের ক'খানা কাপড় কেচে মেলে দেওয়া, তোলাপাড়া, ঘরদোর ঝাড়া-পোছা তিনি আর মেয়ে মিলে হাতে-হাতে করে নেবেন। মেয়ে সেদিক দিয়ে বড় ভাল। গোড়াতে যে-আশঙ্কা ছিল, স্বামীর কাছে একদিন যেটা প্রকাশও করেছিলেন—বড় বেশী বড়লোক ঘেঁষা হয়ে দাঁড়াচ্ছে শিখা—একটু বড় হতেই দেখা গেছে সেটা অমূলক। উনি ঠিকই বলেছিলেন, ওটা কিছু নয়, নিজেদের অবস্থা যেদিন বুঝতে শিখবে সেদিন দেখো ওসব আর থাকবে না। তা-ই দেখছেন এখন। দাদাদের মতো পড়াশুনায় ভাল, তবু সংসারের কাজেও সমান দৃষ্টি। যখনই সময় পায় মায়ের সঙ্গে ঘুরছে। চালচলনেও কোনো চাল নেই। ওকে দিয়ে তিনি সব কিছু সামলে নিতে পারবেন।

তাঁর ভাবনা শুধু সুবীরকে নিয়ে। আর কিছু নয়। ছেলের বড় খরচে হাত। টাকাগুলোকে যেন যেমন-তেমন করে বিদায় করতে পারলেই বাঁচে। হিসাব-পত্তরের বালাই নেই। ওখানে এতদিন যে অ্যালাউন্স পেত, একজন মানুষের সচ্ছলভাবে চলবার পক্ষে শুধু যথেষ্ট নয়, তার চেয়ে বেশী। ওর কাছেই শুনেছেন, ঐ টাকা থেকে ওঁদের কেউ কেউ মাঝে মাঝে কিছুটা করে বাড়ি পাঠায়। নিলয় বলে ওর কে এক বন্ধু আছে, তার কথা প্রায়ই বলে। যদ্দিন মা ছিলেন, তাঁকে নিয়মিত টাকা দিতে হত। এখন জমায়। ব্যাঙ্কে একটা এস. বি. অ্যাকাউন্ট্ খুলে নিয়েছে, মাসের গোড়াতেই বেশ খানিকটা করে পাঠিয়ে দেয়। আত্মীয়-স্বজনদেরও কিছু কিছু করে দেয়।

তুইও তো দু-চার টাকা করে রাখলে পারিস—ঐ সূত্রেই একদিন বলেছিলেন মালতী।

আমি! সর্বনাশ! এমনিতেই কুলোতে পারি না, তার ওপরে আবার জমানো। বলে, এমন ভাবে লাফিয়ে উঠেছিল, যেন মা তাকে ভয়ঙ্কর একটা কিছু করতে বলেছেন।

সত্যিই কুলোতে পারত না। মাঝে মাঝে কতবার এসে হাত পেতেছে মায়ের কাছে। আর একটা সার্ট করাতে হবে, কলমটা কোথায় ফেলেছে, খুঁজে পাচ্ছে না, একটা পার্কার চাই, বন্ধুরা একদিন খাইয়েছিল, একটা রিটার্ণ-ভোজ না দিলে মান থাকে না··· এমনি ধারা একটা না একটা প্রয়োজন লেগেই ছিল বরাবর।

আজ সেই কথাই ভাবছিলেন। সে যে কতটা কি দিতে পারবে, সে সম্বন্ধে ঠিক নিশ্চিত হতে পারছিলেন না।

চাকরি পাবার পর প্রথম যেবার বাড়ি এলো, সুযোগ মতো ছেলেকে আলাদা ডেকে নিয়ে প্রথমেই ঐ কথা পাড়লেন মালতী। মাইনের অঙ্কটা, কোয়ার্টার্সের দরুণ কত কাটবে, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে কত ফেলতে হবে, সব জেনে নিয়ে বললেন, ওঁর অবস্থা তো দেখছিস। চাকরি আর রাখা চলে না।

সুবীর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। মালতীর সাগ্রহ দৃষ্টি ছিল ছেলের মুখের উপর। সে মায়ের দিকে তাকাল না। জানালার বাইরে চোখ রেখে বলল, ফ্যাক্টরী থেকেও তো বিশেষ কিছু আসছে না, শুনলাম।

মালতী এ ধরনের উত্তর আশা করেননি। ভেবেছিলেন, ছেলেও তাঁরই সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলবে, বেশ তো, ছেড়ে দিতে বল না। এখন আর এই ডবল খাটনির দরকার কী? কিন্তু সে মোটেই সে দিক দিয়ে গেল না। মালতী শুধু নিরাশ হলেন না, মনে মনে কিছুটা বিরক্ত হলেন। পরের কথায় তার আভাস পাওয়া গেল, তুই কি ভাবছিস আমি ফ্যাক্টরীর ওপর ভরসা করে চাকরি ছাড়বার কথা তুলেছি?

জানি। কিন্তু আমাকেও তো একটু গুছিয়ে-টুছিয়ে নিতে হবে। তাছাড়া, এখানে-ওখানে আমার কিছু দেনাও আছে।

ফেলা। সবিস্ময়ে শুধু ঐ একটি শব্দই বেরোল ওঁর মুখ থেকে।

ভয় পাবার মতো কিছু নয়। তবু শোধ তো দিতে হবে। তাতে সময় লাগবে।

একটুখানি থেকে আবার বলল, তাছাড়া, ওখানে আলাদা বাড়ি নিয়ে থাকার খরচও অনেক।

মালতী ঐখানেই থেমে গেলেন। এসব কথা আর কেউ জানল না, স্বামীকেও জানতে দিলেন না। রাত্রে বিছানায় গিয়ে অনেকক্ষণ ঘুম এলো না। ছেলের মুখের প্রতিটি রেখা, তার কণ্ঠ, তার সেই অপ্রত্যাশিত উক্তি এবং যা অনুক্ত থাকলেও অস্পষ্ট ছিল না,—তার হাবভাব থেকেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল—সব মিলিয়ে একটা হতাশাময় ছবি তাঁর দু-চোখের উপর ভেসে উঠতে লাগল। একটা দুরন্ত অভিমানে বুক ভরে উঠল, এই তাঁর ছেলে! তাঁর প্রথম সন্তান! কত আশা ভরসা নিয়ে ওকে তাঁরা মানুষ করেছেন। সামান্য মাইনে তখন সুহৃদের। তার বেশীর ভাগই গেছে ওর পিছনে। তিল পরিমাণ অভাব কখনো টের পেতে দেননি। যখন স্কুল-কলেজে পড়ত তখন থেকেই ও উড়নচণ্ডে। ওর বহু অপব্যয়ের বোঝা ওঁরা নিঃশব্দে বহন করে এসেছেন। তিনি যদি বা দু-এক কথা বলতে গেছেন, স্বামী বাধা দিয়েছেন—থাক, ওসব ছোটখাটো ব্যাপারে খিটমিট করলে ছেলেমেয়েদের মন খিচড়ে যায়। একেবারে ছেলেমানুষ। বুদ্ধিশুদ্ধি হয়নি। বড় হলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

এই তো ঠিক হল!

পাশের খাটে সুহৃদ অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছেন। এদিকে ফিরে শুয়ে আছেন। ঘরের বাইরে বারান্দার আলোটা জ্বালা রয়েছে, জ্বেলেই রাখেন সারারাত। জানালা দিয়ে তার খানিকটা ঘরেও এসে পড়েছে। সেই অস্পষ্ট আলোতেও বেশ বোঝা যায়, দিন দিন আরো শীর্ণ হয়ে পড়েছেন সুহৃদ। কণ্ঠার হাড় ঠেলে উঠেছে,

চোখের কোলে বলি রেখাটা কত গভীর! এই তিন চার বছরে যেন দশ বছর বেড়ে গেছে মানুষটার। এইভাবে চললে শুধু সর্বনাশকেই ডেকে আনা হবে। ভাবতে গিয়ে মালতীর সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

অনেকক্ষণ স্বামীর দিকে চেয়ে থেকে মনটা ক্রমশ দৃঢ় হয়ে উঠল। কিসের অভিমান, কার উপরে অভিমান করছেন তিনি! যে ছেলে অসুস্থ বাপের মুখের দিকে তাকাল না, মায়ের দুর্ভাবনার অংশ নিতে চাইল না, সংসারের প্রতি তার যে অত্যাজ্য দায়িত্ব তার কথা ভেবে দেখল না, তার কাছে দুঃখ জানাতে যাওয়া অর্থহীন। তাই বলে তাকে সব ভার থেকে মুক্তি দেওয়াও যায় না। তাহলে তো সে বেঁচে যায়। 'চাই না' বলে মুখ ভার করে সরে এলে, ও কি তার মর্ম বুঝবে, না মর্যাদা দেবে? মনে মনে বরং নিশ্চিন্ত হবে, ভালোই হলো, তোমাদের দায় আর বইতে হলো না। সে সুযোগ তাকে দেওয়া হবে না।

ছেলের উপর কঠোর হবার চেষ্টা করলেন মালতী। ওকে বোঝাতে হবে, তোমার ভার যেমন আমরা এতদিন ধরে বয়েছি, তোমাকে তেমনি আমাদের ভার বইতে হবে। সংসারে কিছু পেতে হলে তার বদলে কিছু দিতে হয়। এটা তোমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সুবিধা-অসুবিধার প্রশ্ন নয়, এটা তোমার দায়, তোমার অবশ্য কর্তব্য। তোমার কাছে আমরা করুণা ভিক্ষা করছি না, মায়া-মমতা স্নেহ-ভালবাসার দাবি তুলছি না, এ আমাদের ন্যায্য পাওনার দাবি। এতকাল তুমি অক্ষম ছিলে, আমরা দিয়েছি, আজ তুমি সক্ষম, তার কিছুটা অন্তত ফিরিয়ে দাও। তোমার সঙ্গে এই আমাদের সম্পর্ক।

এই কথাগুলো যখন মনে মনে আউড়ে যাচ্ছিলেন, তখন অন্তরের একটা দিক [illegible] ভেঙে পড়ছিল। তাঁর অত আদরের খোকা! তরুণ বয়সে প্রথম মাতৃত্বের স্বাদ যে এনে দিয়েছিল, তার

সঙ্গে জড়ানো কত সাধ, কত স্বপ্ন, কত আনন্দ, কত উৎকণ্ঠা। তাকে কখনো এমন করে বলা যায়? মা কখনো এত রূঢ়, এত নির্মম হতে পারে?

কেন পারবে না? পরক্ষণেই সব দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নিজেকে শক্ত করে তুললেন মালতী। ছেলে যখন মুখ ফুটে এই সামান্য কথাটা বলতে পারল না—তুমি ভেবো না মা, আমি তো আছি, তখন মা-ই বা এই সহজ, সরল, সঙ্গত কথাটা তাকে জানিয়ে দিতে পারবে না কেন?

ভিতরে ভিতরে একটা দৃঢ় সংকল্প নেবার পর অনাবশ্যক দেরি করলে তার তাতটা পাছে জুড়িয়ে যায়, তাই সুবীর রওনা হয়ে যাবার পরেই একটা সুযোগ করে নিয়ে স্বামীর কাছে কথাটা পেড়ে ফেললেন। প্রথমে জানতে চাইলেন, ওখানে তো তোমার অনেক ছুটি পাওনা আছে?

কিছুদিন আগেও এমনি হঠাৎ করে ছুটির কথা তুললে সুহৃদ মনে মনে বিস্ময় বোধ করতেন, মুখেও হয়তো জিজ্ঞেস করতেন, সে কথা কেন। আজ কোনোটাই করলেন না। তাঁর সম্বন্ধে স্ত্রীর ক্রমবর্ধমান দুশ্চিন্তা তাঁর দৃষ্টি এড়াই নি, চিন্তাধারাটা কোন্ পথে চলেছে, তাও মোটামুটি আঁচ করতে পেরেছিলেন। তাই প্রশ্নটা যেন প্রত্যাশিত, এমনি ভাবেই উত্তর দিলেন, তা আছে। তবে প্রাইভেট ফার্ম তো। ওখানে পাওনা আর পাওয়া—এ দুটোতে অনেক তফাৎ।

একবার বলে স্থাখ। দেয় ভাল, না দেয় এমনি বেরিয়ে চলে এসো।

সুহৃদ এতখানির জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। তবু বললেন, দিলেও চার মাসের বেশী দেবে না। এদিকে আমার ফ্যাক্টরী ভালো করে চালু হতে মানে, আমাদের প্রয়োজন মেটাবার মতো অবস্থায় আসতে এখনো কিছুটা দেরি আছে। তাই ভাবছিলাম—

মালতী কথাটা শেষ করতে দিলেন না, তার আগেই বলে উঠলেন, তদ্দিন খোকা চালাবে।

খোকা তো সবে ঢুকল।

তাহলেও, মাইনেটা তো প্রথম মাস থেকেই পাবে।

সুহৃদ একটু কি ভেবে নিয়ে বললেন, খোকাকে কিছু বলেছ?

মালতীর পক্ষে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মুস্কিল। যদি বলেন, হ্যাঁ, তার পরেই সুহৃদ হয়তো জানতে চাইবেন, কী বলল সে। ছেলের সেই কথাগুলো এবং সেই সঙ্গে যে মনোভাব তার প্রকাশ পেয়েছে, সে-সব তিনি নিজের কাছেই রাখতে চান। তাই সরাসরি জবাব না দিয়ে বললেন, সে তো নিজেই সব দেখতে পাচ্ছে।

সুহৃদ প্রসঙ্গটা আর না বাড়িয়ে সংক্ষেপে শুধু বললেন, একবার আঁচ নিয়ে দেখি, কী বলে ওরা।

মালতী একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। কথাটা হঠাৎ ধরতে না পেরে বললেন, কারা?

আমার প্রভুদের কথা বলছি।

আমার তো মনে হয় জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করতে গেলেই ওরা নানারকম ফ্যাকড়া বের করবে। তার চেয়ে সোজাসুজি দরখাস্ত পাঠিয়ে দেওয়া ভালো। আমার শরীর খারাপ, আমি পেরে উঠছি না, এর পরে আর কথা নেই।

'শরীর খারাপ' কথাটা সুহৃদ এ পর্যন্ত কোনদিন আমল দিতে চাননি। কদিন আগেও চোখ-মুখের চেহারা নিয়ে মালতী একটু উদ্বেগ প্রকাশ করতে, বলেছিলেন, বয়স হয়েছে, সেটা ভুলে যাও কেন? এবং সঙ্গে সঙ্গে বেশ জোর দিয়ে জুড়ে দিয়েছিলেন, শরীর আমার ঠিক আছে।

আজ আর স্ত্রীর কথার প্রতিবাদ করলেন না। ভিতরে ভিতরে নিজেও বুঝতে পারছিলেন, দৈহিক সামর্থ্য কমে আসছে। চাকরি শেষ করে রোজ বিকালের দিকে যখন ফ্যাক্টরীতে গিয়ে বসেন,

কোন কোন দিন হাত-পাগুলো চলতে চায় না। তখনি অবশ্য জোর করে চালিয়ে দেন, কিন্তু সেটা মনের জোর। দেহের কলকজাগুলো আগেকার মতো কাজ করছে না, অতি-ব্যবহারে যা হয়। পুরনো হয়ে পড়ছে তো। তার উপরে চাপও পড়ছে বেশী। ক্রমশই বোঝা যাচ্ছে, তাঁর ঐ কারখানার যন্ত্রগুলোর মতো দেহযন্ত্রেরও নিয়মিত এবং উপযুক্ত বিশ্রাম দরকার। ছুটির কথা তিনি নিজেও ভাবছিলেন। তার পরের ব্যাপারটা মালতীর ভাষায় বেরিয়ে চলে আসা, সে সম্পর্কে মনস্থির করতে পারেন নি। ছুটি নেবার প্রশ্নটাও সেই কারণে পিছিয়ে যাচ্ছিল। ছুটির মেয়াদ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে চাকরির মেয়াদও শেষ হয়ে যাবে, মনে এই রকম একটা সংকল্পই করে রেখেছিলেন। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, পুরো মাইনের ছুটি খুব বেশী হবে না, বড় জোর মাস চারেক। তাও দেবে কিনা সন্দেহ। এমনিতেই কারখানাটা কিনবার পর থেকে মালিক পক্ষের মনোভাব বদলে গেছে। ওঁর উপরে তাঁরা তেমন প্রসন্ন নন। সে জন্যে তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। তার কোন বেতনভূক কর্মচারী আলাদা ব্যবসায়ে নেমেছে, এটা বোধহয় কোন ব্যবসায়ী পছন্দ করে না। এ ক্ষেত্রেও তাঁদের অসন্তুষ্টির আসল মূলটা সেইখানে। তার থেকে এখানে-সেখানে ডালপালা ছড়িয়ে উঠেছে। কিন্তু সুহৃদের বিবেক এখানে একেবারে পরিষ্কার। তাঁর তরফ থেকে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য বা ত্রুটি কোথাও দেখা দেয় নি। যদি কিছু ঘটে থাকে, সেটা তার অক্ষমতা। আগেও ঘটতে পারত, তার সঙ্গে তাঁর কারখানার কোনো সম্পর্ক নেই।

যা-ই হোক, সুহৃদ ভেবে রেখেছিলেন, ছুটিটা এমন সময়ে নেবেন যে তাঁকে আর ফিরে যেতে না হয়, অর্থাৎ ছুটি অবসানের সঙ্গে সঙ্গে চাকরির উপরে তাঁর যে নির্ভরতা তারও অবসান ঘটবে। সেটা আবার নির্ভর করছিল তাঁর নতুন ব্যবসার উপর। তাই দেরি করছিলেন।

সুবীরের চাকরিও তিনি হিসাবের বাইরে রাখেন নি। এ ব্যাপারে তারও একটা প্রধান স্থান রয়ে গেছে। তাঁকে এবং তাঁদের সবাইকে একমাত্র ফ্যাক্টরীর মুখ চেয়েই বা• থাকতে হবে কেন? ছেলেও তো দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু ছেলের উপর শুরু থেকেই সংসারের চাপ পড়ে, এটা তিনি এড়াবার চেষ্টায় ছিলেন। সেই জন্যে ভেবেছিলেন, যাক কয়েক মাস, একটা ভালো অর্ডার পেয়েছিলেন, সে মালগুলো তৈরী হতে থাক, ওদিকে সুবীও খানিকটা গোছগাছ করে নিয়ে, যাকে বলে সেটেল্‌ড হয়ে বসুক। তখন ছুটির ব্যবস্থা করা• যাবে। শুধু ছুটি নয়, একেবারে বেরিয়ে চলে আসা—স্ত্রীর যেটা একান্ত ইচ্ছা এবং তাঁরও যেটা বরাবরের প্ল্যান।

কিন্তু মালতী যে-রকম অস্থির হয়ে উঠেছে, এ ব্যাপারে তাঁকে আরো খানিকটা তৎপর হতে হলো। নিজের শরীর এবং স্বাস্থের কথাটাও না ভেবে পারলেন না। কিছুদিন থেকে কোমরে একটা ব্যথা টের পাচ্ছিলেন, গ্রাঁহ্যের মধ্যে আনেননি। বাত-টাত হবে হয় তো। কদিন হলো বুকের বাঁ দিকটাও মাঝে মাঝে খচ্‌ করে ওঠে। তাকেও বিশেষ আমল দেননি। আজ ভাবলেন, কোনটাকেই বোধহয় একেবারে তুচ্ছ করা উচিৎ নয়। মালতীকে অবশ্য বলা হবে না। এমন ভয় পেয়ে যাবে যে, ওকে নিয়েই আবার নতুন সমস্যা দেখা দেবে। তবে বিভূতিকে একবার বললে হয়। ছেলেবেলাকার বন্ধু, বিচক্ষণ ডাক্তার। তাকে বলতে দোষ নেই।

ঠিক দুদিন পরে রাত্রে শুতে যাবার আগে মালতী বললেন, দিয়েছ?

কি? প্রশ্নটা হঠাৎ ধরতে পারলেন না সুহৃদ।

ছুটির দরখাস্ত।

ও, তাই তো। কি করবো, একেবারে সময় পাইনি। একটা মেসিন এমন বিগড়ে বসল, দুটো দিন যে কোথা দিয়ে চলে গেছে টেরই পাইনি। তারপর আবার—

থাক। বলে, মালতী জোরে জোরে পা ফেলে ওদিকে কোথায় গিয়ে ঢুকলেন।

সুহৃদ হাসতে হাসতে ঘরে চলে গেলেন এবং পরদিন অফিসে গিয়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ঘরে ঢুকে প্রথম কথা যেটা পাড়লেন, সেটা তাঁর ছুটি। ও তরফে বেশী কিছু আপত্তি উঠল না। শরীরটা ভালো যাচ্ছে না শুনে ভদ্রলোক বরং যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব ছেড়ে দেবেন বলে আশ্বাস দিলেন এবং ডাক্তার দেখাবার পরামর্শ দিয়ে শেষের দিকে বললেন, ইউ লুক এ বিট্ রান্ ডাউন। কিছুদিন বিশ্রাম নেওয়া দরকার।

একটু সকাল সকাল বেরিয়ে ওখান থেকে প্রথমেই গেলেন বিভূতি সেনের চেম্বারে। মোটামুটি পরীক্ষার পর ডাক্তার যা বললেন, একেবারে তাঁরই কথা। এই মাত্র সেদিন মালতীকে তিনি নিজেও ঠিক এই কথা কটিই বলেছিলেন—বয়স হয়েছে, ভুলে যাও কেন?

প্রেস্‌ক্রিপশন্ লিখতে লিখতে ডাক্তার সেন বললেন, অত খাটুনি চলবে না। ছুটি নাও।

সেই ব্যবস্থা করেই আসছি তোমার কাছে। গিন্নীর প্রেস্‌ক্রিপশন। উনি তোমার চেয়েও বড় ডাক্তার।

আসল ডাক্তারী ওঁরাই করেন, আমরা তো সাকরেদ মাত্র। ছুটি নিয়ে এই মহানগরী ছেড়ে মাস তিনেকের মত যদি পালাতে পার, আরো ভালো হয়।

সেটা পারবো না ভাই।

কেন?

ছুয়োরাণী রয়েছে যে।

ছুয়োরাণী!

মানে, আমার ঐ কারখানাটা। আহা, বেচারা! ওর দিকে মোটেই নজর দিতে পারি না।

ডাক্তার হো-হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, বেশী নজর দিতে গেলে সুয়োটি যে চটে যাবেন।

যাবেন কি? গোড়া থেকেই চটে আছেন। তবে এতদিনে অনেকটা সয়ে গেছে।

খানিকক্ষণ গল্প-সল্প করে সুহৃদ যখন উঠতে যাবেন, ডাক্তার সেন বললেন, শোন, তোমার ঐ "দুয়ো" নিয়েও বেশী মাতামাতি কোরো না। ছুটি বলতে আমি কিন্তু পুরোপুরি ছুটির কথাই বলছিলাম। না, ভাবনার কিছু নেই, তবে একটু সাবধান হতে দোষ কি?

দিন পনের পরে আবার আসবার নির্দেশ দিয়ে ডাক্তার বন্ধুকে বিদায় করলেন।

সুহৃদ একটু ভাবনা নিয়েই ফিরলেন। রাস্তা থেকে ওষুধটা কিনে নিলেন। মনে করেছিলেন, ছুটির বন্দোবস্ত হয়ে গেছে, এই খবরটা ছাড়া মালতীকে আর কিছু জানাবেন না। কিন্তু ওষুধের সূত্র ধরে খানিকটা বলতেই হলো। ডাক্তারের উক্তির প্রথমাংশ—অর্থাৎ ভাবনার কিছু নেই, সুরুতেই জানিয়ে দিলেন; শেষের অংশ যেখানে সাবধান হবার পরামর্শ দিয়েছেন, অনুক্ত রয়ে গেল। তা হলেও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে স্বামীর মুখ থেকে আরো কিছু সংগ্রহ করলেন মালতী এবং সেই অনুসারে তাঁর খাওয়া-দাওয়া পরিচর্যা সম্পর্কে একটা কার্যক্রমও মনে মনে স্থির করে ফেললেন।

পরের দিনটা আর কারখানায় যাওয়া হয়নি। দারোয়ান কিছু চিঠিপত্র বাড়িতে রেখে গিয়েছিল। সুহৃদ এদিকের কথাবার্তা সেরে কফির পেয়ালা হাতে করে বসবার ঘরে গিয়ে একটা ইজি চেয়ারে বসে সেইগুলো দেখছিলেন।

শিখা এসে একটা খাম তাঁর কাছে পৌঁছে দিয়ে বলল, বাবা, তোমার চিঠি।

কে দিল?

ডাকে এসেছে, মার কাছে ছিল। কি রকম মোটা, বড় খাম দেখেছ? ঠিকানাটা আবার টাইপ করা।

তাই তো দেখছি। বাড়ির ঠিকানায় আবার টাইপ করে চিঠি লিখলে কে? - বলতে বলতে একটা ধার ছিঁড়ে ফেললেন।

শিখার কৌতূহল তখন খাম থেকে তার ভিতরকার বস্তুটি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। সে দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করল, বাবার মুখখানা ক্রমশ গম্ভীর হয়ে উঠছে। চিঠিটা বিশেষ বড় নয়।

পড়া শেষ করে মুখ তুলতেই শিখা বলল, কার চিঠি বাবা? তার কণ্ঠে উৎকণ্ঠার সুর সুস্পষ্ট।

সুহৃদ সে কথার জবাব দিলেন না, বললেন, তোর মা কী করছে? মা রান্না ঘরে।

বোধহয় বলতে যাচ্ছিলেন, একবার আসতে বল— শিখার সেই রকম মনে হল—কিন্তু বললেন না। চিঠিখানা খামে ভরে পকেটে রাখতে রাখতে বললেন, আচ্ছা এখন থাক। তুই যা।

শিখার কৌতূহল তখন আশঙ্কার স্তরে পৌঁছে গেছে, এবং সেটি মায়ের কাছে পৌঁছে দিতে তার একটুও বিলম্ব হলো না। তিনি প্রায় ছুটতে ছুটতে এলেন,কার চিঠি গো?

সুহৃদ জবাব দিলেন না, হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা স্ত্রীর হাতে দিলেন। মালতী প্রথমেই মাথার দিকের ছাপানো অংশটা দেখে নিলেন। নামটা অপরিচিত, ঠিকানা. স্বামীর যেখানে কাজ করে, সেখানকার। বললেন, কে ইনি?

পরিচয়টা নামের সঙ্গেই আছে।

মালতী পড়লেন, চীফ এঞ্জিনিয়ার। জিজ্ঞাসা করলেন. কী লিখেছেন?

পড়ে দ্যাখ।

চিঠিটা বাংলায় লেখা, এবং তার কৈফিয়ৎ স্বরূপ চমৎকার একটি ভূমিকা দিয়ে শুরু করেছেন দত্তসাহেব। লিখেছেন, 'বাংলা ভাষায়

আমার দখল অতি সামান্য। সেই কারণে এ চিঠি ইংরেজিতে লিখতে উদ্যত হইয়াছিলাম, যাহাতে মনের ভাব উত্তম রূপে প্রকাশ করিতে পারি, কিন্তু আমার স্ত্রী তাহাতে আপত্তি জানাইলেন। তাঁহার মতে এই জাতীয় শুভ কার্যের প্রস্তাব দেশীয় ভাষাতে করাই বাঞ্ছনীয়। যদিও এ-বিষয়ে তিনি আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, তথাপি ভুল-ত্রুটি থাকিতে পারে। আশা করি ক্ষমা করিবেন।'

আসল বক্তব্য কয়েক লাইনেই শেষ করিয়াছেন মিষ্টার দত্ত।

সুবীর এবং সুতপা দুজনেরই মন জানতে পেরে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তাদের আকাঙ্খিত মিলনে সম্মতি দিয়েছেন এবং তাঁদের বিশ্বাস, মিস্টার ও মিসেস রুদ্রও খুশি হয়ে সম্মত হবেন।

শেষের দিকে রুদ্র দম্পতিকে সাদর আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে—'আপনারা আসিয়া আমার কন্যাটিকে আশীর্বাদ করিলে বাধিত হইব। সেই সুযোগে আমরাও আপনাদের সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিব।'

তাঁর নিজের আসবার একান্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কতগুলো জরুরী কাজে আটকা পড়ে যাওয়ায় আসা হল না, বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

চিঠি পড়তে মালতীর বেশী সময় লাগল না। তারপর দুজনেই নীরব। ওদিকের ইজিচেয়ারে তেমনি নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন সুহৃদ, আর এদিকের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইলেন মালতী। শিখাও এসে মায়ের পিছনে দাঁড়িয়েছিল, যদিও ব্যাপারটা কিছুই আঁচ করতে পারেনি। রান্নাঘর থেকে একটা কি পোড়া গন্ধ নাকে যেতেই ছুটে চলে গেল।

অনেকক্ষণ পরে মালতী অনেকটা যেন আপন মনে বললেন, এ আমি জানতাম।

সুহৃদ হঠাৎ সচকিত হলেন, খোকা কিছু বলেছিল নাকি?

না। না বললেও এই রকম একটা কিছু ঘটবে আমার মনই আমাকে বলে দিয়েছিল। কিন্তু চাকরি পেতে না পেতেই—

বাকীটুকু আর শেষ করলেন না। সুহৃদ বললেন, থাক, ওসব ভেবে আর লাভ নেই। এখন অন্য ভাবনা। চিঠির শেষ দিকটা দেখেছ?

দেখেছি।

একবার তাহলে যেতে হয়।...অবিশ্যি না গেলেও কিছু আটকাবে না। আমাদের সম্মতি বা আশীর্বাদের জন্যে ওঁরা বসে থাকবেন, সেই সম্ভাবনা নেই। তবু বিয়েটা তো শুধু বিয়েতেই শেষ নয়। তার পরেও যে অনেকখানি। না যাওয়া মানে হয়তো গোটা জীবনের সবটা থেকে সরে আসা, এবং সরিয়ে দেওয়া।

তুমি কি আশা কর, গেলেই ঐ ছেলে-বৌ আমাদের কাছে সরে আসবে? এই কি তার লক্ষণ?

না, সে আশা আমি করি না। তবু নিজেদের আমরা এই কথা বলে বোঝাতে পারবো, আমাদের দিক থেকে যা করবার আমরা করেছি। তবে, তোমাকে আমি যেতে বলি না। এ তো কনে পছন্দ করতে যাওয়া নয়। এক্ষেত্রে আমি একা গেলেই চলবে।

তার চেয়ে এক কাজ করলে হয় না? উনি যেমন করেছেন, তেমনি একটা চিঠি লিখে জানিয়ে দাও, আমাদের অমত নেই।

শেষ দিকটায় গলাটা একটু কেঁপে গেল। সঙ্গে সঙ্গে যেন কারো কোনো কথার প্রতিবাদ করছেন, এমনি ভাবে বললেন, না, না, অমত করবো কেন? খোকা যদি একবার এসে বলত, মা, একটি মেয়েকে আমি পছন্দ করেছি, তার সঙ্গে আমার বিয়ে দাও, আমি কি বলতাম আমার মত নেই?

বলতে বলতে মালতীর গণ্ড বেয়ে জল গড়িয়ে এলো। তাড়াতাড়ি আঁচলে মুছে ফেললেন।

সুহৃদ বললেন, আমিও ভাবছিলাম। বলতে কী বাধা ছিল?

ছেলেটা ভিতরে ভিতরে বড় দুর্বল, বুদ্ধিসুদ্ধিও কম। হয়তো সেই জন্যেই···যাকগে। তুমি যা বলছ, তা করা যেত, যদি মেয়েটিকে আমরা আগে একবার দেখতাম বা তার সম্বন্ধে কিছু জানতাম। উনি তো আমাদের ছেলেকে অনেক দিন ধরে দেখেছেন, চিনেছেন, তারপর পছন্দ করেছেন।

মালতী স্বামীর যুক্তিটা বুঝলেন। কিছু না দেখে বা জেনে মত দেওয়া মানে প্রকারান্তে বলা—কী প্রয়োজন ছিল আমার মত চাইবার? আসল কথাটা যদিও তাই, কিন্তু বলতে গেলে সভ্য সমাজের সৌজন্যে বাধে।

পরের সপ্তাহেই সুহৃদ গিয়ে 'কনে দেখে' এলেন। যদিও জানতেন, 'বর কনে আশীর্বাদ' বা 'পাকা দেখা' বলে যে প্রচলিত অনুষ্ঠান তার এখানে কোনো অবকাশ নেই, 'আশীর্বাদ' বলতে মিষ্টার দত্ত সেটা বোঝাতে চাননি, তবু একটা জড়োয়া নেকলেস নিয়ে গিয়েছিলেন। মেয়েটির সঙ্গে কথা বলে কেসটা তার হাতে তুলে দিলেন।

জলযোগান্তে ছেলের নতুন বাসায় গিয়ে তার স্বাস্থ্য এবং কাজ-কর্ম সম্বন্ধে সামান্য দু-একটা প্রশ্ন করে গাড়ি ধরবার জন্যে উঠে পড়লেন, আর কোনো কথা হলো না।

গেট পেরিয়ে রাস্তায় নামতেই একটি ছেলে হাসি মুখে এগিয়ে এসে তাঁকে প্রণাম করল, এবং উনি জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতে বলল, আমার নাম নিলয়, সুবীর আমার বন্ধু!

হ্যাঁ, হাঁ, তোমার কথা ওর মুখে শুনেছি। একবার এসো না আমাদের বাড়ি? আমরা সবাই খুব খুশি হবো।

যাবো। আপনি কি এখনি চলে যাচ্ছেন?

হ্যাঁ।

কোলকাতায় ফিরতে বড় অসময় হয়ে যাবে। তার চেয়ে এখানে দুটো খেয়ে দেয়ে—

না বাবা, ওখানে আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।

নিলয়ের কাঁধে ডান হাতটা রাখলেন। সে বলল, চলুন আপনাকে ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসি।

সম্মতির অপেক্ষা না করেই ওঁর হাত থেকে গ্ল্যাড্‌ষ্টোন ব্যাগটা তুলে নিল। সুহৃদ আর আপত্তি করলেন না। কাছেই ষ্টেশন, কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেলেন।

গাড়িতে উঠবার পর আরেকবার ওকে যাবার কথাটা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

প্রথম এবং এত সামান্য পরিচয়ে ছেলের বন্ধুকে এমন করে বারংবার আমন্ত্রণ জানাবার আগ্রহ অন্য সময়ে অন্য পরিবেশে প্রকাশ করতেন কিনা, সন্দেহ। কিন্তু এই মুহূর্তে এর জন্যে ভিতরে যেন একটা তাগিদ বোধ করেছিলেন। হয়তো তার কারণ, প্রথম দেখেই, ছেলেটিকে ভাল লেগেছিল। অথবা নিজের ছেলেকে আশ্রয় করে তাঁর মনে যে ক্ষোভ এবং বেদনা অজ্ঞাতসারে সঞ্চিত হয়ে উঠেছিল, একটি পরের ছেলের এই সামান্য একটু অমায়িক ব্যবহার তার উপরে যেন একটা স্নিগ্ধ প্রলেপ মাখিয়ে দিয়ে গেল।

ফেরবার পর মালতী ওখানকার সম্বন্ধে কোনো কিছুই জানতে চাইলেন না। সুহৃদ ভেবেছিলেন, মেয়েটি কেমন দেখলে—এ কথাটা হয়তো জিজ্ঞাসা করবেন। তাও করলেন না। মায়ের অগোচরে শিখা একবার জানতে চেয়েছিল। উত্তরে সুহৃদ বলেছিলেন, ভালোই তো দেখলাম।

বিয়ের তারিখ পাত্রীপক্ষ আগেই স্থির করেছিলেন, এবং মিসেস দত্ত সেটা ওখানেই ভাবী বৈবাহিককে জানিয়ে দিয়েছিলেন। সবাইকে নিয়ে যাবার অনুরোধও করেছিলেন। পরে ডাক যোগে ইংরেজী ছাপা একখানা কার্ডও এসেছিল। কিন্তু কারোই যাওয়া হয়নি। সুহৃদের কর্তব্যবোধ তাঁকে যে কথাই বলুক, স্ত্রীর দিকে চেয়ে, তাঁর মনের অবস্থা উপলব্ধি করে ওকথা আর তোলেননি।

তাছাড়া, দত্তদম্পত্তির সঙ্গে কথাবার্তায় এটা বুঝেছিলেন, তাঁদের সমাজের যে রীতিনীতি এবং বিবাহের কর্মসূচী যে-ভাবে নির্ধারিত হয়েছিল, তার কোনখানে পাত্রের পিতার বা আত্মীয়-স্বজনের কোনো বিশেষ স্থান নেই। অন্য দশজন নিমন্ত্রিত অতিথির মধ্যে তিনিও একজন। তাঁদের অনুপস্থিতি উৎসবের কোথাও কোনো অঙ্গহানি ঘটাবে না। কেউ সেটা বোধও করবে না। বরং ঐ অস্বাভাবিক এবং অনভ্যস্ত পরিবেশে বাবা কিংবা ভাইবোনের উপস্থিতি সুবীরকে হয়তো একটু বিব্রত করে তুলত। তারা কেউ না থাকলেই সে, ইংরেজীতে যাকে বলে ফ্রী, অর্থাৎ স্বচ্ছন্দ বোধ করবে।

এ বিষয়ে সুনীতের মনোভাবও অনেকটা তার বাবার মত। দাদা এবং ভাবী বৌদির মধ্যে যদি কোনো পূর্বরাগ হয়ে থাকে, সেটা অন্যায় নয়, তাতে আপত্তি করারও কিছু নেই। কিন্তু শুরু থেকেই সমস্ত ব্যাপারটা যে রূপ নিয়েছে, যে ভাবে অগ্রসর হয়েছে, কোনোটাই সে সমর্থন করতে পারে না। সমর্থন-যোগ্য যদি কিছু থাকত, তাহলেও সে দিকটা সে দেখত না। এর থেকে মা যে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছেন, যে বেদনা নিঃশব্দে বহন করে বেড়াচ্ছেন, সেইটাই তার কাছে সব চেয়ে বড়। সেই বিশেষ কোণ থেকেই সে এই বিবাহ-সংক্রান্ত সমস্ত অধ্যায়টাকে বিচার করে দেখেছিল। এতে যোগ দেওয়া দূরে থাক, এর সঙ্গে কোনো সংশ্রবও ছিল তার বিবেচনার বাইরে।

বৌভাতের কোনো আয়োজন এঁরা করেননি। সে মনের অবস্থা কারো ছিল না। তাছাড়া সামান্য কিছু করলেই কিছু আত্মীয়-স্বজন অন্তত ডাকতে হয়। তাঁদের প্রকাশ্য সমালোচনা যদি বা সওয়া যায়, সান্ত্বনা বা সহানুভূতি একেবারে অসহ্য। একেই তো নিউ সাউথ পার্কের বড় লোকের পাড়ায় বাড়ি নিয়ে এঁরাও যে বড় লোক হয়ে গেছেন, গরীব আত্মীয়দের দূরে ঠেলে দিয়েছেন,

এই রকম ঘটনা প্রায়ই কানে আসত, (আসলে যদিও মালতীই মাঝে মাঝে উত্তরে গিয়ে তাঁদের খোঁজ-খবর নিতেন, তাঁদের কেউ দক্ষিণাভিযান করতেন না।) তার উপরে এই বৌ দেখে, বিয়ের ইতিহাস খানিকটা শুনে, বাকীটা আন্দাজ করে শুভানুধ্যায়ীরা ইনিয়ে-বিনিয়ে যে-সব বাক্যসুধা বিতরণ করতে থাকবেন, সেধে যেচে সেটা পান করবার আগ্রহ কারোই থাকতে পারে না। সুহৃদ বা মালতীরও ছিল না। এখানকার প্রতিবেশীদের সঙ্গে তাঁদের আলাপ হয়নি, অগ্রণী হয়ে আলাপ করা এ পাড়ার রীতি নয়, এরা কারো সাতে-পাঁচে থাকেন না। সেই বদ্ধ-ওষ্ঠ আভিজাত্যকে মালতী এতদিন সুনজরে দেখেননি, আজ প্রাণ-ভরে অভিনন্দন জানালেন। কারো সরব কৌতূহলের সামনাসামনি হতে হবে না।

বাড়িওয়ালাদের কথা আলাদা। শিখার কাছ থেকে অঞ্জলি, এবং অঞ্জলির মুখ থেকে তার মা যে-টুকু শুনেছিলেন, সেটা খুব বেশী কিছু নয়। ভিতরে ভিতরে যাই ভাবুন, প্রকাশ্যে বলেছিলেন, 'ও-রকম আকছার হচ্ছে আজকাল। এই তো সেদিন—' বলে দু-তিনটি দৃষ্টান্তও দিয়েছিলেন যেগুলো অন্যের মুখে শোনা নয়, তাঁর প্রত্যক্ষ গোচর। এ সম্পর্কে মালতীর কাছে নিজের মতামতও ব্যক্ত করেছিলেন সরকার গৃহিণী—'যে যাই বলুক ভাই, আমার মনে হয়, ছেলে যে নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছে, এটা একদিক দিয়ে ভালো। ঠাকুর না করুন, এরপর যদি বনিবনাও না হয়, কাউকে দুষতে পারবে না। বাপ-মা যাকে ধরে এনে দেয়, যতই দেখে-শুনে আনুক, সকলের কপালে ওৎরায় কি? এই আমার অবস্থা দ্যাখ না। কত বড় বনেদি ঘরের মেয়ে আমি, দেখতেই বা এমন কী খারাপ ছিলাম বয়সকালে, কী করলেন আমার বাবা? কত খোঁজাখুঁজি করে ঠিকুজি-কুষ্ঠী মিলিয়ে এই তো হলো! সারাটা জীবন—'

কে একজন এসে পড়াতে কথাটা আর শেষ করতে পারলেন না।

বিশ্বনাথ তাঁর ভাড়াটে পরিবারটিকে আরো একটু অন্তরঙ্গ দৃষ্টি দিয়ে দেখতে চেষ্টা করেছিলেন। বিশেষ করে মালতীর আশা-আকাঙ্খা, সাধ-অভিলাষ তাঁর অজানা ছিল না। স্বামী-পুত্র-কন্যার মধ্যে যিনি নিজেকে প্রায় বিলীন করে দিয়েছেন, তাঁর কাছে এযে কত বড় বিপর্যয় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তাই এ প্রসঙ্গে একেবারে নীরব ছিলেন। মালতীর সঙ্গে কখনো কখনো তাঁর সাক্ষাৎ হতো। ইদানীং ইচ্ছা করেই এড়িয়ে গেছেন। ভাড়াটা বরাবর তিনি নিজে এসে নিয়ে যেতেন। সুহৃদ অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ। তাঁর উপরে পাঠাবার ভার না চাপিয়ে এ ব্যবস্থা তিনিই করেছিলেন। বলেছিলেন, আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না। আমার যখন দরকার পড়বে ওপরে গিয়ে চেকটা নিয়ে আসবো। আপনার অবসর বুঝেই যাবো। এমনিতে তো দেখাশুনো বড় একটা হয় না। তবু ঐ উপলক্ষে দুটো কথাবার্তা হবে।

পরের মাসে ভাড়া নিতে যেদিন এলেন, এ-কথা ও-কথার পর বললেন, ছেলেকে লিখে দিন, বৌ নিয়ে একদিন আসুক। আপনি তো আগেই দেখেছেন, আমরা একবার দেখবো না ?

সুহৃদ মৃদু হেসে বললেন, দেখবেন বৈকি ! আমি লিখে দিয়েছি।

আপনি বিচক্ষণ এঞ্জিনীয়ার। প্রতিটি সূক্ষ্ম জিনিসে নজর আছে। যদি অনধিকার চর্চা বলে মনে না করেন তো আরেকটা কথা বলতে চাই।

নিঃসঙ্কোচে বলুন। আমাদের আপনি যে চোখে দেখেন, সেখানে অনধিকারের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না।

ভবিষ্যতের একটা প্ল্যান্ সকলের মনেই থাকে। আপনারও একটি ব্লু-প্রিণ্ট তৈরী হয়ে আছে, জানি। তার কিছুটা আভাস আমি পেয়েছি। এই যা ঘটে গেল, তার জন্যে কি সেখানে কোনো রকম অদল-বদলের কথা ভাবছেন ?

না। আমার তরফে এখনো তার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

এই উত্তরই আপনার কাছে আশা করেছিলাম, মিস্টার রুদ্র। প্রার্থনা করি যেন কোনোদিনই সে প্রয়োজন না দেখা দেয়।

সাত

বিভিন্ন দেশের কবিরা জীবনকে গানের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁদের মতে এ দুয়ের মিল বা ঐক্য শুধু ভাবগত নয়, গঠনগত। সঙ্গীতের মত জীবনও নানাসুরে গাঁথা—কখনো লঘু, কখনো রাগ-প্রধান। বিভিন্ন তার স্বরগ্রাম—কোথাও কড়ি, কোথাও কোমল। মিল রয়েছে গতি এবং লয়েতেও।

রুদ্র-পরিবারের জীবন-ছন্দে এমনিধারা কোনো মিল যদি দেখানো যায়, সেটা ঐ লয়ের মিল। প্রথম দিকটা ছিল 'বিলম্বিত', উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে যেমন আলাপ, হঠাৎ সেটা 'দ্রুত' স্তরে গিয়ে পৌঁছল, এবং সে পরিবর্তন দেখা দিল সুধীরের বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে। সুনীত এম-এ-তে ফার্স্ট ক্লাশ পেয়ে একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপকের অধীনে রিসার্চ শুরু করেছিল। আরো অন্তত বছরখানেক নিয়মিত কাজ করতে পারলে তার থিসিস শেষ হবার কথা, এবং অধ্যাপক ধর আশা প্রকাশ করেছিলেন, ডক্টরেট্ পাওয়া তার পক্ষে কঠিন হবে না। গবেষণাকে অগ্রাধিকার দিয়ে তার সাহিত্য-চর্চাকেও ইদানিং কিছুটা পিছিয়ে আসতে হয়েছিল।

নিজের অভিপ্রেত পথে ছেলেকে আনতে পারেননি বলে সুহৃদের মনে গোড়াতে যে ক্ষোভ ছিল, সেটা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। সে যা, তা-ই হোক। তার নিজের পথেই কৃতী ও সার্থক হয়ে উঠুক।

এবারে প্রথম ঘা পড়ল সেই সুনীতের উপর। বাবা-মা বা অন্ত

কারো হাত থেকে নয়, সম্পূর্ণ স্বয়ং দত্ত। বাবার স্বাস্থ্যের অবনতি সে-ও লক্ষ্য করেছিল। তার উপরে দাদার বিবাহ সংক্রান্ত ঘটনাবলী যে ছাপ ফেলেছিল, সেটা যতই তিনি লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করুন না কেন, তার দৃষ্টি এড়ায় নি। সুবীরের উপর অনেকখানি নির্ভর করেই যে মা তাঁকে ছুটি নেবার জন্যে বারংবার পীড়াপীড়ি করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত রাজী করাতে পেরেছেন, সেটা সে জানত। সে খুঁটি যখন টিকল না, সুনীত দেখতে পেল, সংসারকে খাড়া রাখবার জন্যে আগের মত চাকরি এবং ফ্যাক্টরীর ডবল ভার অনিবার্যভাবে আবার সেই বাবার কাঁধে এসে পড়ছে। এ অবস্থায় তার আর নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকা চলে না। বাবা-মা হয় তো চান না তার কার্য-সূচীর কোনো পরিবর্তন হোক, তবু এক্ষেত্রে তার অবশ্যই কিছু করণীয় আছে, এবং সে বিষয়ে সে অবিলম্বে মন স্থির করে ফেলল। বাড়ির কাউকে কিছু জানতে দিল না, শুধু অধ্যাপক ধরকে গিয়ে সব কিছু খুলে বলল এবং সেই সঙ্গে তার সংকল্পটাও জানিয়ে দিল—রিসার্চ বন্ধ রেখে আপাততঃ একটি চাকরি।

এই রকম একটি মেধাবী ছাত্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সাফল্যের মুখে এসে ওলট-পালট হয়ে যাবে, এটা ডক্টর ধরের কাছে বেদনাদায়ক। কিন্তু তার কর্তব্য-জ্ঞানকেও তিনি মনে মনে প্রশংসা না করে পারলেন না। বললেন, আচ্ছা, আমি তোমার চাকরির চেষ্টা করছি, তবে এক শর্তে—যখনই দেখবে, তোমার রোজগার ছাড়াই মোটামুটি ভাবে সংসার চলে যাচ্ছে, তখনই এখানে ফিরে আসবে।

ডক্টর ধর তাকে স্নেহ করেন, তার পরম শুভাকাঙ্খী, এটুকু সুনীতের অজানা ছিল না, কিন্তু সেটা যে কত গভীর এবং সুদূর-প্রসারী, এর আগে এমনভাবে কখনো অনুভব করেনি। কিছুক্ষণ অভিভূত হয়ে রইল। তারপর বলল, আমি যত শীগগির পারি চলে আসবো স্যর।

অধ্যাপকের আনুকুল্যে চাকরি পেতে দেরি হলো না। বেহালা অঞ্চলে একটা নতুন বেসরকারী কলেজের লেকচারার। নতুন বলে মাইনে তেমন ভালো নয়—দেড়শ' টাকা। কলকাতার বাইরে যেতে পারলে আরো কিছু বেশী পাওয়া যেত, কিন্তু তাতে ওর কোনো সুবিধা নেই। আপাতত এতেই সে খুশি। দাদাও হয়তো এর চেয়ে বেশী কিছু দিতে পারত না।

নিয়োগপত্র পেয়েই মাকে গিয়ে বলল, মা, আমি একটা চাকরি পেয়েছি।

চাকরি! চমকে উঠলেন মালতী।

হ্যাঁ। বেহালা-কলেজে। এখান থেকে বেশী দূর নয়।

তোর রিসার্চ কী হল?

ডক্টর ধর অন্য কতগুলো কাজে এমন জড়িয়ে পড়েছেন যে, এদিকে বিশেষ নজর দিতে পারছেন না। তাই কিছুদিন বন্ধ রাখতে বললেন। চাকরিও উনি করে দিয়েছেন।

চাকরির খবর জানালেই মা যে রিসার্চের কথা জিজ্ঞাসা করবেন, এটা অনুমান করতে পেরেছিল সুনীত এবং সেইজন্যে আগে-ভাগে তার একটা উত্তরও মনে মনে তৈরি করে রেখেছিল। রিসার্চ তার বহু দিনের স্বপ্ন, মা তা জানতেন। এ সম্পর্কে প্রায়ই তাঁর সঙ্গে কথা উঠত। তাই নিয়ে একদিন তিনি হাসতে হাসতে বলেছিলেন, বাপ-ব্যাটায় মিলেছে বেশ। একজনের মুখে শুধু ফ্যাক্টরী, আরেকজনের মুখে তেমনি রিসার্চ। সুনীতের আশঙ্কা ছিল, মা তার এই বানানো গল্পটা বিশ্বাস করবেন কিনা। অন্য সময়ে হলে হয়তো এ নিয়ে আরো কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। কিন্তু এখন তাঁর মন অহরহ শুধু একটা কথাই ভাবছিল, স্বামীর ছুটি ফুরিয়ে গেলে তারপর? তিনি নিশ্চয়ই চাকরিতে ফিরে যেতে চাইবেন। তখন তাঁকে বাধা দেবেন কোন্ জোরে? সুনীতের চাকরি সেই মহা সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে। আপাতত এই ভেবেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

সুহৃদ যখন শুনলেন, মনে মনে সন্দিগ্ধ না হয়ে পারলেন না। ছেলেকে ডেকে দু'চারটি প্রশ্ন করে সন্দেহ আরো বাড়ল। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার নিয়মকানুন সম্পর্কে তাঁর কোনো প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকলেও সুনীত তার রিসার্চ বন্ধ হবার যে কারণ দেখাল, সেটা বড় অবাস্তব বলে মনে হলো। অধ্যাপকের যত কাজই থাক, যে-ছাত্রকে তিনি এতদিন ধরে সাহায্য করে এসেছেন, সেটা মাঝপথে এমন করে বন্ধ করে দিতে পারেন না। সুনীত নিশ্চয়ই দাদার দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে চায়। তার পরের কথাতেই সেটা আরো পরিষ্কার হল। বলল, কোম্পানীকে লিখে দিয়েছ, তুমি আর জয়েন করছ না?

এখনো দিইনি।

আমার মনে হয় আর দেরি না করে এখনই জানিয়ে দেওয়া উচিত। ওদের আবার নতুন লোক খুঁজতে হবে তো।

এই বলেই নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। সুহৃদের একবার ইচ্ছা হল, ওকে ডেকে ফিরিয়ে বলেন, তুই তোর রিসার্চে ফিরে যা। অন্নের জন্যে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করিস না। আমি যেমন করে হোক চালিয়ে নেবো। বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। নিজের মধ্যে জোর পেলেন না। না দেহে, না মনে। দু'দিন আগেই ডাক্তার সেন তাঁকে আরেকবার সাবধান করে দিয়েছেন। বলেছেন, তোমার কারখানার জন্যে একজন ভালো লোক রাখো, যে তোমার কাজের ভারও খানিকটা নিতে পারে। সুহৃদ 'দেখি' বলে চলে এসেছেন, কিন্তু সেদিকে কোনো চেষ্টাই করেননি। একজন এঞ্জিনীয়ার পুষবার মতো অবস্থায় তিনি এখনো পৌঁছতে পারেননি। এদিকে কাজের চাপও বাড়ছে।

সুনীতের কথা যখন ভাবছেন, তখন শিখা এসে তাঁকে আরো অবাক করে দিল। তার আই. এ. পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। ফার্ষ্ট ডিভিসন পেয়েছে। বাংলায় অনার্স নিয়ে বি এ পড়বে, এই কথাই

জেনে এসেছেন বরাবর। ও নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাননি। যা খুশি পড়ুক। এদিকে বিয়ের চেষ্টা চলতে থাকবে। মালতীরও সেই মত। কোন্ দিকে কতটা খরচের সাশ্রয় করা যায় ভাবতে গিয়ে একবার তাঁর একথাও মনে হয়েছিল, আর পড়িয়ে দরকার কী বরং তাড়াতাড়ি করে বিয়েটাই দিয়ে দিলে হয়। এ-ই সময়। যত বয়স বাড়ে আর সেই সঙ্গে একরাশ পড়াশুনোর চাপ পড়ে, মেয়েদের চেহারায় যে একটি স্নিগ্ধ কমনীয়তা আছে, তার অনেকটা চলে যায়। তাঁর মেয়ের অবশ্য সে বয়স হয়নি। মুখখানা লাবণ্যে ভরপুর দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। ওটা থাকতে থাকতেই একটি যোগ্য পাত্রের সন্ধান করা ভালো।

কিন্তু পরীক্ষার ফল বেরোবার পর পড়া ছাড়িয়ে দেবার কথা আর ভাবেননি। পড়তে চাইছে পড়ুক। সুহৃদও বললেন, নিশ্চয়ই পড়বে বৈকি।

কোন্ কলেজে দেওয়া যায় সে সম্বন্ধে যখন খোঁজ-খবর নিচ্ছেন সে এসে বলল, আমাকে লেডী ব্রাবোর্নে ভর্তি করে দাও বাবা। বি-কম পড়বো।

বি. কম. !

হ্যাঁ। অনার্স নেবো কমার্সে।

পারবি ? বড় কঠিন আর নীরস সাবজেক্ট। খাটতে হবে।

খাটবো।

বাংলা কিংবা ইংরেজি নিলেই তো ভালো হত। কমার্স-টমার্সে তো তার কোনো ঝোঁক ছিল না। কোনো উদ্দেশ্য আছে, না, এমনিই পড়তে চাইছিস্ ?

শিখা মাথা নিচু করে সলজ্জমুখে আঁচলের একটা কোণ আঙুলে জড়াতে লাগল, জবাব দিল না। সুনীত ছিল পাশের ঘরে। বেরিয়ে এসে বোনকে তাড়া দিল, চুপ করে আছিস কেন ? বল না।

তুমি বল। সঙ্গে সঙ্গে অনুনয়ের সুরে সে ভারটা সে দাদার উপর

চাপাল। সুনীত হাসিমুখে বলল, ওর প্ল্যান্ হচ্ছে বি-কম পাস করে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি পড়বে, তারপর তোমার ফার্মে অ্যাকাউন্ট্যান্ট্ হবে।

সুহৃদ হেসে উঠলেন, এইবার ঠিক হয়েছে।

তারপর ছদ্ম গাম্ভীর্যের স্বরে মাথা নেড়ে বললেন, না বাপু, আমার গরীব ফার্ম অতবড় অ্যাকাউন্ট্যান্ট্ পুষতে পারবে না। মাইনে দেবো কোত্থেকে?

তোমার ফার্ম কি বরাবরই গরীব থাকবে না কি?

তা বটে! তুমি যদ্দিনে পাস করে বেরোবে—

কে কী পাস করে বেরোবে? বলতে বলতে মালতী এসে ঢুকলেন।

তিনি এতক্ষণ নিচে ছিলেন। সরকার-গিন্নী কয়েকবার ঘুরে গেছে, ওঁরও একবার যাওয়া উচিত, তাই গিয়েছিলেন। সুহৃদ তাঁর প্রশ্নের উত্তরে বললেন, আমাদের শিখারাণী।

কী পাস করবে?

এবার জবাব দিল সুনীত, অনেক বড় ব্যাপার—চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি। পাস করে আবার আর্টিকলড্ থাকতে হয়।

মালতী মেয়ের দিকে চেয়ে হাসলেন—ওসব আর্টিকল-ফার্টিকল যাদের ঘরে যাবে, তাদের খরচায় পড়ুক গে। আমাদের ক্ষমতায় কুলোবে না।

তোমার কাছে চাইছি নাকি? আমার পড়ার খরচা ছোড়দা আলাদাভাবে দেবে।

মালতী বললেন, আলাদাভাবে মানে?

মানে, মাইনে থেকে নয়, রয়্যালটি থেকে।

সে আবার কী? কথাটা নতুন শুনলেন মালতী।

গল্প-টল্প লিখে যা পায়।

মালতী এবার জোরে হেসে উঠলেন, ও, তার নাম বুঝি রয়্যালটি? কত টাকা জানো?

স্বামীর দিকে ফিরলেন।

কত ?

কাগজ বুঝে। কেউ দেয় দশ, কেউ আবার কিছুই দেয় না। তাই না ?—স্বয়ং লেখকের কাছেই সমর্থন চাইলেন।

সুনীত হাসিমুখে চুপ করে রইল। সুহৃদ বললেন, টাকা যা-ই হোক, পায় তো রয়্যালটি—রাজকীয় ব্যাপার। আসলে ওটা লেখার দাম নয়, লেখকের দক্ষিণা। যা-ই হোক, ও দিয়ে শিখারাণীর পাউডার-টাউডারগুলোর ব্যবস্থা হতে পারে, তার বেশী—

শিখা প্রথমে একটু অপ্রস্তুতে পড়েছিল, কিন্তু দমে যাবার পাত্রী সে নয়। বাবার কথা শেষ না হতেই বলে উঠল, বাকী টিউশনী করে চালাবে। ওর সঙ্গে আমার প্যাক্‌ট হয়ে গেছে।

প্যাক্‌ট !

হ্যাঁ, আমি ওর লেখা-টেখাগুলো কপি করে দেবো।

ব্যস্ ! মজুরিটা তুমি যেন বড্ড বেশী চাইছ, মা-মণি।

মোটেই না। ওর হাতের লেখা দেখেছ ? কে বলবে বাংলা অক্ষর ? একেবারে ফার্সী। দু-লাইন পড়তেই মাথা ধরে যায়। তার ওপরে—

পিছন থেকে ঝুলন্ত বেণীতে টান পড়তেই ধমকে উঠল, কী হচ্ছে, ছোড়দা ?

আচ্ছা, তোরা এখন যা দেখি, বলে মালতী এগিয়ে এসে স্বামীর সামনে একটা চেয়ার নিয়ে বসলেন। উদ্বেগের সুরে বললেন, ব্যথাটা কেমন আছে ?

এখন আর টের পাচ্ছি না। একবার ঘুরে এলে হতো। একটা নতুন অর্ডার আসবার কথা ছিল।

না। আজ আর গিয়ে কাজ নেই। একদিনের মতো নিশিবাবুই সামলে নিতে পারবে। খুকুর বিয়ের চেষ্টা এখন থেকেই শুরু করা দরকার। বন্ধু-বান্ধবদের বলে রাখো।

সিঁড়ির মুখে ইলেকট্রিক বেলটা বেজে উঠল। নিচের গলি থেকে কেউ সুইচ টিপেছে। মালতী ঝি-এর উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বললেন, দ্যাখতো কে?

কথা হচ্ছিল বসবার ঘরে। বাইরের কেউ হলে এইখানেই আসবে। সুতরাং মালতীকে উঠে পড়তে হলো। ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে দেখলেন. বেশ খানিকটা লম্বা ছিপছিপে গড়নের একটি শ্যামবর্ণ ছেলে বিনীত ভঙ্গিতে ঝি-এর পিছন-পিছন বাইরের ঘরের দিকে চলে গেল। মুখের ডৌলটা যেটুকু দেখা গেল, বেশ মিষ্টি। পরক্ষণেই স্বামীর উচ্চ কণ্ঠের সাদর অভ্যর্থনা কানে গেল, আরে নিলয় যে! এসো, এসো। বলতে বলতে বাইরে এসে হাঁক দিলেন, কই. কোথায় গেলে? দ্যাখো কে এসেছে।

মালতী তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন। ছেলেটি সলজ্জ নত মুখে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। তিনি তার চিবুক স্পর্শ করে আঙুল কটি ওষ্ঠে ঠেকিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললেন, তুমি নিলয়! ...বলে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তার মধ্যে হয়তো কিছুটা বেদনার স্পর্শ জড়িয়েছিল। ঐ মুখের পাশে আর একখানা মুখ তাঁর চোখের উপর ভেসে উঠেছিল। ওরা এক সঙ্গেই থাকে।

আট

নিলয় তারপর অনেকবার এসেছে। প্রথম দিকে অনির্দিষ্ট ব্যবধানে, তারপর প্রায় নিয়মিত কখনো সপ্তাহান্তে, কখনো বা মাঝখানে একটা সপ্তাহ বাদ দিয়ে। আগেকার দিনে সুবীর যেমন আসত। বন্ধুর সম্বন্ধে 'চৌকস' বিশেষণটা মিসেস দত্তের কাছে সুবীর হয়তো না ভেবে-চিন্তে অনেকটা মুখে-এসে-গেল হিসাবে ব্যবহার করে থাকবে। কিন্তু কথাটা যে যথাযথ, তার প্রমাণ সুবীর আর

কত পেয়েছে? সুতপার ভাষায় বন্ধুর 'গার্জেনগিরি' তাকে বেশীদিন করতে হয়নি। সে-প্রমাণ পাওয়া গেল এখানে—নিউ সাউথ পার্কের বাড়িতে। 'এ ছেলেটি এসে বাড়ির বড় ছেলের অভাব পূরণ করল' —ভাড়াটেদের প্রসঙ্গে স্ত্রীর কাছে মন্তব্য করেছিলেন বিশ্বনাথবাবু। স্বামীর খুব কম কথাই সরকার গৃহিণীর সমর্থন লাভ করত। এখানে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিলেন. তার সঙ্গে যোগ করেছিলেন, 'তার চেয়েও বেশী।' শেষের উক্তিটাই আরো সত্য। নিলয়ের আসনটা কোনদিকে বেশী বিস্তৃত—রুদ্র পরিবারের যেটা অন্তরের দিক, যেখানে সে চারটি বিভিন্ন প্রকৃতির প্রাণীর সঙ্গে বিভিন্ন বন্ধনে জড়িত, সেখানে? না, সেটা তার বাইরের দিক, যেখানে সংসার তার ছোট-বড় নানা সমস্যার সমাধান চাইছে, সেইখানে? এ প্রশ্ন কারো মনে আসেনি। এলে তার উত্তর দেওয়া কঠিন ছিল।

মালতী হয়তো একটা কিসে আটকে গিয়ে বললেন, ওটা থাক. আসছে রোববারে নিলয় এসে করবে।

সুহৃদ কি একটা ভাবতে ভাবতে রেখে দিয়ে বললেন. নিলয় আসুক, ওর সঙ্গে একবার পরামর্শ করে দেখি।

সুনীত অধীর হয়ে বলে উঠল, নাঃ. নিলয়দাকে নিয়ে আর পারা গেল না। এত করে বললাম, আমার ভীষণ দরকার, যাবার সময় দেখা করে যাবেন। কোন্ ফাঁকে যে চলে গেল!

শিখা এসে ঠোঁট ওল্টালো মায়ের কাছে, তোমাদের নিলয়বাবু বুঝি নিউ সাউথ পার্কের পথটা একেবারে ভুলে গেলেন?

এ বাড়িতে এই হলো নিলয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

একদিন তার ছেলেবেলাকার গল্প শুনতে শুনতে মালতী একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, এ রকম কোথাও দেখা যায় না। মাথার ওপর কেউ-না-কেউ থাকেন! তোমার যে একেবারে শূন্য।

সে কি বলছেন মাসিমা! অত বড় সি-ঈ আছেন কী করতে? তার ওপরে ম্যানেজিং ডিরেক্টর, তারও ওপরে—

আহা, ওদের কথা কে বলছে? বাপ-মা ভাই-বোন—এদের কথা বলছি।

নিলয়ের সুরে হঠাৎ গভীরতার স্পর্শ লাগল—এতদিন যা-ই থাকি না কেন, এখন তো আর সেদিক দিয়ে নিজেকে বঞ্চিত বলতে পারি না।

পরক্ষণেই আবার হাল্কা সুরে বলল, মাথার ওপর না থাকুন ঘাড়ের ওপর যারা আছেন, তাদের দলটি নেহাৎ ছোট নয়।

তারা আবার কারা?

কেন, আমার স্নেহময় কাকারা কাকীরা, সঙ্গে বেশ কিছু এবং···

শিখা ছিল মায়ের পাশে। তিক্তকণ্ঠে বলে উঠল, আপনি বলে এখনো তাদের টানছেন। আমি হলে ওরকম কাকা-কাকার মুখও দেখতাম না।

সে তো আমিও দেখি না। তাঁরাও আমার মুখ দেখবার জন্য মোটেই ব্যস্ত নন। তবে মাসের গোড়াতে একজনের মুখ না দেখতে পেলে মুষড়ে পড়েন।

সে আবার কে?

মনি-অর্ডার পিওন।

বলে, হেসে ফেলল নিলয়। তার বলবার ধরণে মালতীও না হেসে পারলেন না। শিখা রাগ করে উঠে চলে গেল। নিলয়ের কাকাদের কীর্তি-কাহিনী মার মুখে যেটুকু শুনেছে তারপর তাদেরই জন্যে ওর এই দরদ বা কর্তব্য যাই বলুক, সে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। ক্ষমতা থাকলে এই অত্যাচার সে এখনই বন্ধ করে দিত।

শিখা এখন আর সেই ছেলেমানুষটি নেই। সকলের চোখের আড়ালে সহসা কখন বড় হয়ে গেছে। সুগঠিত দেহের কানায় কানায় পূর্ণতার আভাস। দু'চোখে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে একটি প্রদীপ্ত শিখার মতো যখন সে ঝড়ের বেগে ঘরে গিয়ে ঢুকল, নিলয় কিছুক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে রইল। অনুরাগ নারীকে একটি বিশেষ সৌন্দর্য দান

করে, একথা সে শুনেছে। রাগও যে কত সুন্দর, আজ নিজের চোখে দেখল।

নিলয় সুবীরের সহকর্মী এবং বন্ধু, ঘটনাচক্রে হঠাৎ দেখা হবার পর সুবীরের বাবা তাকে একদিন আসবার অনুরোধ জানিয়ে এসেছিলেন, কেবল মাত্র এই কারণেই রুদ্র-পরিবারের সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটেছিল, একথা বলা চলে না। তার পিছনে আর একটি ইতিহাস আছে। সেটা একটু বিশদভাবে বলা প্রয়োজন।

সুতপা কোয়ার্টার্সে এসে উঠবার পরেও তাকে কিছুদিন বন্ধু-দম্পতির সঙ্গে কাটিয়ে আসতে হয়েছিল। দুজনেই সাংসারিক ব্যাপারে আনাড়ি। একটু গোছগাছ করে না বসা পর্যন্ত তারা ওকে ছাড়েনি। সুতপা চেয়েছিল, সে ওখানেই থেকে যাক। নিলয় তাতে রাজী নয় দেখে বলেছিল, আমি আসতেই বুঝি আপনাদের বন্ধু-বিচ্ছেদ ঘটল?

তাই তো নিয়ম। বলে, মহাকবি কালিদাসের নজিরও দেখিয়েছিল নিলয়, আপনি তো এই ব্যক্তিটির শুধু গৃহিণী এবং সচিব নন, প্রিয় সখীও বটে।

বেশ তো। তাই বলে কি তার একটি প্রিয়সখা থাকতে নেই?

সেটা বাহুল্য মাত্র।

'বি-টাইপে' উঠে যাবার পর নিলয় মাঝে মাঝে দু-একটা সন্ধ্যা এবং রবিবারের সকাল কাটিয়ে আসত ও-বাড়িতে। প্রায় দিনই মিসেস দত্তের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। তিনি কন্যা-জামাতার তদারক করতে আসতেন, বেশীক্ষণ বসতেন না। যেটুকু থাকতেন, তাতেই প্রকারান্তরে বুঝিয়ে দিতেন, নিলয়ের এই আসা-যাওয়াটা তিনি বিশেষ সুনজরে দেখছেন না।

তার কারণ অবশ্যই ছিল। সুবীর চাকরির দিক দিয়ে তার সমস্তরের হলেও জামাতা হিসাবে বহু ঊর্ধ্বে। সেই পদে যাঁরা তাকে বসিয়েছেন, তার উচ্চতা রক্ষার দিকে তাঁদের নজর না দিলে চলে না।

'জামাতার' শ্বশুর হয়তো এ সব নিয়ে মাথা ঘামান না, কিন্তু শ্বশ্রূ অতিশয় সজাগ। বেচারা সুবীর নিরুপায়। তাকে বিপন্ন করে কী লাভ? সুতরাং নিলয়কে নিজে থেকেই সরে আসতে হল।

তারপর এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। সি-ঈ সাহেবের কন্যা-জামাতা, বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ একদিন তার 'বি-টাইপে' এসে হাজির! নিলয় ভীষণ বিব্রত হয়ে পড়ল। না আছে সোফা-সেট, না আছে কিছু। বাইরের ঘর একটি আছে বটে, তার শোভা বর্ধন করছে একখানা নিরালা তক্তপোষ। তার লজ্জা নিবারণ করবার জন্যে যে চাদরের সাহায্য নেওয়া হয়েছে, সেটিও অনেকদিন হল রজক-দর্শনে বঞ্চিত। ভিতরে যে আরেকটি কামরা আছে, তার অবস্থাও সভ্যসমাজে মুখ দেখাবার মতো নয়। ঝাড়নের অভাবে একটা পায়জামা টেনে নিয়ে তাকে যখন নিজে হাতে ভদ্রস্থ করবার আয়োজন করছে, সুতপা বলে উঠল, খুব হয়েছে, দয়া করে এবার বাইরে গিয়ে বসুন তো।

নিলয় বেঁচে গেল।

তারপর তার অদ্বিতীয় অনুচরটিকে ডেকে, ধমকে, কোথায় কেটলি, কোথায় প্যান, কোথায় স্টোভ ইত্যাদি সংগ্রহ করে চা এবং কিছু খাবার করে ফেলল সুতপা, দু-বন্ধুকে খাওয়াল, নিজেও খেল এবং কিছুক্ষণ হৈ-চৈ করে, যাবার সময় বলল, অন্যের সংসার তো বেশ সাজিয়ে-গুছিয়ে দিতে পারেন, নিজের এ হাল কেন?

নিলয় সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, কারণ অতি সোজা। যেখানে যেটা মানায়।

বন্ধু ও বন্ধুপত্নীর এই আকস্মিক অভিযানের প্রেরণা যে দ্বিতীয় ব্যক্তির, প্রথম জন শুধু নীরব সঙ্গী, এটুকু সহজেই বোঝা গিয়েছিল, কিন্তু সেই প্রেরণার উৎসটা কোথায়, নিলয় তৎক্ষণাৎ ধরতে পারেনি। দু-একদিনের মধ্যেই পারল।

সেটা আর কিছুই নয়, মায়ের আচরণে কন্যার নীরব প্রতিবাদ। প্রতিবাদের পিছনে জটিল কারণ ছিল, তাও তার কাছে অস্পষ্ট রইল না।

মেয়েদের মধ্যে দুটো দল আছে। এক, যারা বিয়ের পরেও মায়ের মেয়েই থেকে যায়, যাদের জীবনে পত্নীত্বটা অপ্রধান, ইংরেজিতে যাকে বলে সেকেণ্ডারী। দুই, যারা বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীর স্ত্রী, অর্থাৎ সেইটাই মুখ্য, মায়ের স্থান সেখানে স্বভাবতই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। সুতপা এই দ্বিতীয় দলভুক্ত। মিসেস দত্ত অত বুদ্ধিমতী হয়েও মেয়ের চরিত্রের এই দিকটা বুঝতে পারেননি, কিংবা পারলেও, একমাত্র কন্যার উপর এতদিন যে একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার করে এসেছেন, তারই দিকে চেয়ে সেটা তৎক্ষণাৎ গুটিয়ে আনতে পারেননি। তাঁর স্বভাবের মধ্যেও একটা প্রভুত্ব বিস্তারের আকাঙ্খা আছে, স্বামীর প্রশ্রয় পেয়ে যা ক্রমশ প্রবল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সুতপা যদি বিয়ের পর শ্বশুরঘর করতে চলে যেত, বেশীর ভাগ মেয়ে যেমন যায়, মিসেস দত্ত আপনা থেকেই নিজেকে অনেকখানি সরিয়ে না এনে পারতেন না। কিন্তু সে তাঁর ঘরের পাশেই রয়ে গেল। শুধু তাই নয়, শ্বশুর-ঘর বলে কোনো বস্তু সে পেলেই না, (তার জন্যেও প্রধানতঃ দায়ী মিসেস দত্তের প্রভুত্ব বিস্তারের প্রবণতা) ভবিষ্যতে যে পাবে তেমন সম্ভাবনাও দেখা গেল না। সুতরাং বিয়ের আগে মেয়ের জীবনে তিনি যে জায়গা জুড়ে ছিলেন, বিয়ের পরেও সেইখানেই রয়ে গেলেন। কিংবা বলা যেতে পারে, তাঁর স্থান আরো কিছুটা বিস্তৃত হলো। মায়ের সঙ্গে আবার শাশুড়ীর দায়িত্ব এসে

ঘটনা-চক্রের এই যে পরিবর্তন, তার মধ্যে সুবীরের স্থানও কম নয়। তার মেরুদণ্ডটিকে যদি আর একটু শক্ত করে গড়তেন তার বিধাতা পুরুষ, তাহলে সমস্ত ব্যাপারটা শুরু থেকেই অন্য রূপ নিত।

নেয়নি তার প্রধান কারণ, বিয়ের অনেক আগে থেকে তার ভাবী শ্বশ্রূ তার উপরে এমন একটি মোহজাল বিস্তার করেছিলেন, যাকে ইন্দ্রজাল বললে অত্যুক্তি হয় না। কেমন করে কখন যে সে এই মহিলাটির হাতের পুতুল হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সুবীর জানতে পারেনি। তারপর থেকে প্রতি পদক্ষেপে তিনিই তাকে চালিয়ে নিয়ে এসেছেন। নিজস্ব মতামত বলে তার কিছুই ছিল না। থাকলেও সেটা প্রকাশ করবার মতো সাহস ছিল না। বিয়ের প্রস্তাবটাকে চূড়ান্ত রূপ দেবার আগে একদিন কোনো রকমে বলে ফেলেছিল, বাড়িতে এখনো কিছু বলিনি। আপনাদের কাছ থেকে চিঠি যাবার আগে আমি বরং—

এই পর্যন্ত শুনেই বিস্ময়ে যেন থ' হয়ে গিয়েছিলেন মিসেস দত্ত, সে কি! তুমি না বলেছ বাবা-মা তোমাকে কোনো কাজে বাধা দেন না, তোমার ওপর তাঁদের অখণ্ড বিশ্বাস? তাই যদি হয়, এত বড় একটা ব্যাপারে অমত করবেন, এ রকম আশঙ্কা করছ কেন?

সুবীরের মুখে এর পরে আর কোনো কথা যোগায়নি। আসলে আশঙ্কা ছিল মিসেস্ দত্তের নিজের মনে। ভাবী জামাতাটিকে তিনি বিলক্ষণ চিনতে পেরেছিলেন। তাই, সব কিছু মিটে যাবার আগে তাকে কাছ ছাড়া করতে চাননি। নিউ সাউথ পার্কের আওতায় গিয়ে পড়লে এই নরম শিরদাঁড়াটা কোন্ দিকে বেঁকে যাবে কে জানে?

বিয়েটা চুকে যাবার পর নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন মিসেস্ দত্ত। জামাতাটি যখন তার সম্পূর্ণ করায়ত্ত, মেয়ের সংসারে তার প্রভাব প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রইল, সে বিষয়ে তার শ্বশুর-বাড়ির দিক থেকে যে কোনো বাধা সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকল না, এতেও তিনি মনে মনে খুশি হয়েছিলেন। স্বপ্নেও কখনো ভাবতে পারেননি, সে বাধা আসবে এমন একটা কোণ থেকে যেখানে তার পূর্ণ কর্তৃত্ব জন্মসূত্রেই কায়েম হয়ে আছে।

কিন্তু অন্ধকার ছিল প্রদীপের ঠিক নিচেই। নিজের মেয়েকেই তিনি চিনতে পারেননি।

সুতপাকে তার নির্দিষ্ট বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে প্রত্যহ একবার

করে তাদের দেখে যেতেন মিসেস দত্ত। কোনো কোনো দিন দুবারও আসতেন এবেলা ওবেলা। একমাত্র কন্যা ও জামাতার প্রতি এই প্রবল টান সম্পর্কে বলবার কিছু নেই, কিন্তু তার আতিশয্যটা মেয়ে বিশেষ সুনজরে দেখত না।

মেয়ে-জামাই কখন কোথায় যাবে, কার সঙ্গে মিশবে এ সবও তিনি স্থির করতেন। সুতপার অসন্তোষ বাড়তে লাগল, কিন্তু মুখ ফুটে প্রকাশ করতে পারল না। সুবীরের তরফ থেকে সামান্য আপত্তি এলেও সে জোর পেত। তা এলো না। তারপর যেদিন তিনি, নিলয় কেন এখনো এখানে পড়ে আছে, এই নিয়ে একটু রূঢ় মন্তব্য প্রকাশ করলেন, তখন আর সে চুপ করে থাকতে পারল না। স্বামীর কাছে গিয়ে বলল, নিলয়বাবু চলে যাবেন কেন? আমাদের তো কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

সুবীরেরও মনোগত ইচ্ছা, সে থেকে যাক, কিন্তু শাশুড়ীর ইচ্ছাও সে জানে, তাঁর সরব আপত্তিও তার কানে এসেছে। তাই উভয় কুল বজায় রেখে বলল, তাতো ঠিকই, আমি বললে কি ও থাকবে? তার চেয়ে তুমি বললে ভালো হয়।

সুতপা জানত, নিলয় সুবীরের কোনো আত্মীয় নয়, বন্ধু। অতটা ঘনিষ্ঠ না হলেও তার আরো বন্ধু ছিল। তবু কোন্ এক অজ্ঞাত কারণে একে তার স্বামীর পিতৃকুলের একজন বলে মনে হতো। যে শ্বশুর-ভাশুর-দেওরকে সে পেলো না, এ যেন তাঁদেরই প্রতিনিধি। তাছাড়া এ রকম দরদী শুভাকাঙ্খী তাদের আর নেই। এ তাদের সঙ্গেই থাকবে। এই মনোভাব থেকেই তাকে রাখতে চেষ্টা করেছিল। সে চেষ্টা যখন ব্যর্থ হলো, তখন এই অনুরোধ করেছিল, সে যেন আপনজনের অধিকার নিয়ে এ বাড়িতে আসে যায়। তাই আসছিল নিলয়। সেটাও মায়ের মনঃপূত হল না, এবং তাঁর এই মনোভাবটা নিলয়ের কাছেও তিনি অস্পষ্ট রাখতে চাইলেন না। এর পরে আর সে আসে কেমন করে?

সুতপা ভিতরে ভিতরে গুমরে উঠতে লাগল। তার নিজের সংসারে তার এতটুকু স্বাধীনতা নেই। তার স্বামীর বন্ধু, যাকে তারা দুজনেই চায়, তাদের কাছে আসতে পারবে না, এলে অন্যের হাতে লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে যাবে—এত বড় অত্যাচার কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না।

একদিন সুবীর আফিস থেকে ফিরবার কিছু পরেই পরনের শাড়িটা শুধু পালটে নিয়ে সোজা গিয়ে বলল, তাড়াতাড়ি জামা পরে নাও। বেরোতে হবে।

কোথায়?

কাছেই। চল, নিলয়বাবুকে দেখে আসি।

কী হল তার? এই আধঘণ্টা আগেও তো—

কিছু না হলে বুঝি কারো বাড়ি যেতে নেই? উনি এতবার এসেছেন, আমাদের অন্তত একবারও তো যাওয়া উচিত।

সুবীর ভিতরকার ব্যাপারটা জানে। বোধহয় সারাদিনের খাটুনি কিংবা ঐ জাতীয় একটা কোনো অজুহাত দেখাতে যাচ্ছিল। সে সময় আর পেল না। সুতপা একরকম জোর করেই ধরে নিয়ে গেল এবং চায়ের ব্যবস্থা করল ওখানে গিয়ে।

উলুখড় বেচারার বিপদ সর্বত্র। যুদ্ধ করেন রাজারা, এদিকে তার প্রাণ নিয়ে টানাটানি। মাতা-পুত্রীর এই 'ঠাণ্ডা লড়াই' এর জের গিয়ে পড়ল নিলয়ের উপর। মিসেস দত্ত তার উপরে প্রসন্ন ছিলেন না, এবার রুষ্ট হলেন। সে রোষ সি-ঈ-র, মধ্যেও সঞ্চারিত করে ছাড়লেন। অ্যাসিস্ট্যান্ট এঞ্জিনীয়র নিলয় মিত্রের কাজ-কর্মে মাঝে মাঝে দোষ-ত্রুটি আবিষ্কৃত হতে লাগল। সহকর্মিমহলও তাকে নায়ক করে মুখে মুখে একটি ছোটখাটো নাটক জমিয়ে তুলল। তাদের দোষ দেওয়া যায় না। নাটকীয় উপাদানের অভাব ছিল না। চীফ এঞ্জিনীয়ারের অনুগ্রহে তাঁর ভাবী জামাতার সঙ্গে এ 'টাইপ' কোয়ার্টার্সে প্রমোশন; কিছুদিন পরেই মিসেস সি, ঈ,

কর্তৃক সেখান থেকে বহিষ্কার ; তা সত্ত্বেও উপর মহলে ঘনঘন আনাগোনা ; সি, ই, কন্তার বিশেষ অনুগ্রহ লাভ ; শেষ পর্যন্ত পুনর্মুষিক—রীতিমত জমাট নাটক, এবং তার মধ্যে 'ফান' বা মজার অন্ত নেই।

সমবৃত্তির একদল লোক নিয়ে যখন একটা বসতি গড়ে ওঠে, তাদের মধ্যে সদ্ভাব এবং সম্প্রীতির বন্ধনও গড়ে উঠবে, এ আশা যারা করেন, তারা বড় বেশী আশাবাদী। উল্টোটাই বরং দেখা যায়। মৌখিক সৌহার্দ্যের একটা প্রলেপ হয় তো রাখতে হয়, তার আড়ালে থাকে হিংসা, দ্বেষ, নিন্দা, কলহ এবং কে কাকে কেমন করে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবে, তারই ষড়যন্ত্র। ব্ল্যাকউড অ্যাণ্ড সন্‌স্ কোম্পানীর কলোনীতেও তার অভাব ছিল না। সুতরাং নিলয় বিস্মিত হয়নি। তাকে নিয়ে মজাটা যারা বেশী উপভোগ করছে, তাদের কেউ কেউ তার কাছে নানাভাবে উপকৃত, এতেও সে তেমন কিছু অশ্চর্য বোধ করল না। কিন্তু নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হলো, আর সুতপার জন্যেও একটা সমবেদনা অনুভব করতে লাগল। তার এই লাঞ্ছনার জন্যে নিজেকে খানিকটা দায়ী না করে পারল না। সুবীর বেচারাও এসব নিয়ে প্রচুর অশান্তি ভোগ করছে। অথচ কোনো দিক দিয়ে তার কিছু করবার নেই।

দিন কয়েক বেহালাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করল। তাতেও মন বসাতে পারল না। আপনজন বলতে কেউ নেই, যাদের কাছে গিয়ে ছুটো দিন কাটিয়ে আসা যায়। হঠাৎ মনে পড়ল, সুবীরের বাবা তো তাকে বারবার করে যেতে বলে গিয়েছিলেন। তাঁর সেই স্নেহ-গভীর আন্তরিকতার সুরটি কানে লেগে আছে। সুবীরের মায়ের কথাও অনেক শুনেছে তার মুখে। একবার ঘুরে এলে কেমন হয় ?

ছুদিন পরেই ছিল রবিবার। সকালে উঠেই ছোট্ট সুটকেসে নিত্য প্রয়োজনের টুকিটাকি জিনিস ক'টা ভরে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল নিউ সাউথ পার্কের উদ্দেশ্যে।

পরের কথা আগেই বলা হয়েছে।

মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে নিলয় এই নিউ সাউথ পার্কের বাড়িতে যে স্থানটিতে এসে দাঁড়াল, সেটা যে অনেকাংশে তার স্বোপার্জিত, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবু সুবীরের বন্ধু হিসাবেই এখানে তার প্রথম পরিচয় এবং সেই পরিচয়েই সে এঁদের কাছে এসে উঠেছিল। তার আগে থেকেই এই পরিবারে তার জন্যে একটি অনুকূল আবহাওয়া তৈরী হয়েছিল। তার মূলেও সুবীর। বাপ-মা ভাই-বোনের কাছে তার শিক্ষানবিশি জীবনযাত্রার কোনো প্রসঙ্গ যখনই উঠত, নিলয়ের কথা প্রায় বাদ পড়ত না। বলত, নিলয় শুধু আমার ফ্রেণ্ড নয়,—ফ্রেণ্ড্, ফিলজফার অ্যাণ্ড গাইড্।

এই স্বজনহীন ছেলেটির উপর মালতীর মনে একটি সাগ্রহ মমতার সৃষ্টি হয়েছিল। বারবার বলেছেন, ওকে একবার আনতে পারিস না? সুবীর বলত, সে চেষ্টা কি করিনি মনে কর? কিন্তু সে কোথাও যায় না। ভীষণ মুখচোরা।

নিলয়ের সঙ্গে সুহৃদের যেদিন প্রথম দেখা, তিনি তার প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাকে স্টেশনে বাড়িতে আসবার অনুরোধ করেছিলেন। তাঁর তখনকার মানসিক অবস্থায় এই ছেলেটির সহৃদয় মধুর অন্তরঙ্গ ব্যবহার সুহৃদকে অবশ্যই প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু এর উপর তাঁর সুগভীর এবং সস্নেহ আকর্ষণের প্রধান কারণ, সে সুবীরের অকৃত্রিম বন্ধু। ছেলের কাছ থেকে আঘাত পেয়ে তিনি যেন অজ্ঞাতসারে তার এই একান্ত সুহৃদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

নিলয় প্রথম দিন এসেই রুদ্র পরিবারের মনটিকে বুঝতে পেরেছিল। বুঝেছিল, এ বাড়ির প্রথম সন্তান এবং প্রধান নির্ভর এখানে একটি গভীর শূন্য রেখে গেছে, কিন্তু কেউ সেই নির্মম সত্যটি স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। কারো মুখে তার কোনো উল্লেখ নেই, যেন সুবীর বলে এদের একজন কেউ ছিল, এখনো আছে, সে কথা এরা

জানে না। তার সম্বন্ধে ঔৎসুক্য দূরে থাক, সামান্য কৌতূহলও কারো কথায় প্রকাশ পায় না। একটা প্রচণ্ড অভিমান সমস্ত পরিবারের কণ্ঠ রোধ করে রেখেছে।

কিন্তু প্রকৃতি যেমন শূন্য সহ্য করে না, যেখান থেকে যেমন করে পারে তাকে পূর্ণ করে দেওয়াই তার ধর্ম, মানব প্রকৃতিও তাই। মানুষের মন 'নেই'-কে আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকতে পারে না, চেষ্টা করলেও না। একজন যে ফাঁক রেখে গেল, নিজের অজান্তে আর একজনকে দিয়ে সেটা ভরে তোলে। নিলয় বুঝতে পারছিল, তার বেলায় ঠিক তাই ঘটছে। দিনের পর দিন সে তার বন্ধুর শূন্যস্থান পূরণ করে চলেছে। হয়তো সেটাই তার একমাত্র ভূমিকা নয়। এঁদের কাছে তার একটা নিজস্ব স্থানও আছে এবং দিন দিন সেটা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। তবু মূলতঃ সে সুবীরের বিকল্প।

মাঝে মাঝে মনে হত, এ বাড়ির জ্যেষ্ঠপুত্র যে এখান থেকে বিলুপ্ত হতে চলেছে, তার জন্য সে-ই দায়ী। সে এসে যেন সুবীরের জায়গাটা দখল করে নিয়েছে। আর নয়, এবার নিঃশব্দে সরে যাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু যত দিন যাচ্ছিল, ততই সেটা তার নিজের দিক থেকে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এরই মধ্যে সে এখানকার প্রতিটি মানুষের সঙ্গে নানা বাঁধনে জড়িয়ে পড়েছে। তবু সেই বন্ধন-পাশ সে ছিন্ন করে চলে যেতে পারত, তার জন্যে যত বেদনাই লাগুক। কিন্তু সে সরে গেলেই কি সুবীরের ফিরে আসবার পথ সুগম হবে? যে ভুলের প্রাচীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেটা ভেঙে পড়বে? উভয় দিকের বিমুখ-মন উন্মুখ হয়ে উঠবে? সে সম্বন্ধে নিলয় কোনো ভরসাই দেখতে পাচ্ছিল না।

তার চেয়ে বরং আর একটা কাজ সে করতে পারে। যে সূত্রটি ছিঁড়ে গেছে, তাকে জোড়া লাগাবার চেষ্টা করতে পারে। এতদিন সেটা ছিল অতিমাত্রায় দুরূহ। তাজা ক্ষতের উপর মানুষের হাত সইত না। কিন্তু কালের প্রলেপ যখন তাকে আপনা থেকেই

উপ্‌শমের পথে এগিয়ে নিয়ে এসেছে, তখন হয়তো সে ব্যর্থ হবে না। কেবলমাত্র সুবীর এবং তার বাবা-মা ভাই-বোনের দিকে চেয়েই যে এ কাজ তাকে করতে হবে, তাই নয়, এর পিছনে তার নিজের গরজও কম নয়। শুরু থেকে যে অপরাধবোধ যখন তখন তার মনের মধ্যে খচ্‌খচ্‌ করে বিঁধছে, তার থেকেও সে মুক্ত হতে পারে।

সুবীরের বিবাহ-সংক্রান্ত ব্যাপারে নিলয়ের কোনো হাত ছিল না। চীফ এঞ্জিনীয়ারের বাড়িতে সে যায় আসে, মিসেস্‌ দত্ত তাকে একটু বিশেষ স্নেহ দৃষ্টিতে দেখেন—অন্যান্য অ্যাপ্রেন্টিস্‌দের তুলনায়—এটুকু সে জানত, কিন্তু তাঁর কন্যার সঙ্গে বন্ধুর বিশেষ সম্পর্কটা ঠিক বুঝতে পারেনি। ওখানে তার কিঞ্চিৎ দুর্বলতা আছে, সেটা আঁচ করতে পেরেছিল, তার উপরে কোনো গুরুত্ব আরোপ করেনি। সুবীরও এ বিষয়ে মাঝে মাঝে হালকা ধরনের উল্লেখ ছাড়া আর কিছু খুলে বলেনি। হয় সে নিজের মনকে বুঝতে পারেনি, কিংবা এই একান্ত নিজস্ব অনুভূতিটুকু বন্ধুর কাছে চেপে রেখেছিল।

নিলয়ের দৃষ্টি সংসারের অন্য সব দিকে যতই তীক্ষ্ণ হোক, এই প্রেমঘটিত ব্যাপারে রীতিমত ঝাপসা। তাছাড়া নিজের অবস্থা সম্বন্ধে সে অতিমাত্রায় সজাগ ছিল বলে ঐ জগৎটা বরাবর এড়িয়ে চলত। তার বেহালার সূত্র ধরে এখানকার নানা অনুষ্ঠানে এবং পার্টি পিকনিক ইত্যাদি সমাবেশেও তার ডাক পড়ত। পারতপক্ষে যেত না। গেলেও নিজের নির্ধারিত কাজটুকু সেরে চলে আসত।

সুতরাং প্রিয়বন্ধুর আর সব ক্রিয়া-কলাপ, চিন্তাধারা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকলেও, পঞ্চশরের এলাকাভুক্ত অংশটুকু নিলয়ের দৃষ্টির অগোচরেই থেকে গিয়েছিল। কেউ কেউ অবশ্য নানা কথা তার কানে তুলেছিল, সেগুলোকে সে আমল দেয়নি। কোনো খোঁজখবর পর্যন্ত নেয়নি। সুবীর সম্পর্কে তার এই অমনোযোগ,

অবহেলা, অথবা নিষ্ক্রিয়তা—যে নামই দেওয়া যাক—নিলয় শুধু ত্রুটি হিসাবে দেখেনি, অপরাধ বলে মনে করেছিল। বন্ধুর মনোবল তার অজানা ছিল না। তার শিরদাঁড়াটি যে বড় বেশী নমনীয়, তাও জানত। ওদিকে মিসেস্ দত্ত নামক মহিলাটির যে সামান্য পরিচয় পেয়েছিল, তার থেকে বোঝা উচিত ছিল, তিনি বিনা স্বার্থে, বিনা উদ্দেশ্যে এই ছেলেটির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেননি। এত সব জেনেও সে কেমন করে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসেছিল, নিলয় ভেবে পায় না। এই তার বন্ধুপ্রীতির নমুনা!

চীফ্ এঞ্জিনিয়ারের জামাতার পদ গ্রহণ যে অবাঞ্ছনীয়, এরকম কোনো গোঁড়ামি নিলয়ের মধ্যে ছিল না। কন্যাটি দেখতে মন্দ নয়. ওখানকার কোনো কোনো পদস্থ অফিসারের বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যাদের নিয়ে তার সহকর্মী মহলে যেসব চটুল আলোচনা হত, তার মধ্যে সুতপার নাম তার কানে আসেনি। বধূ-নির্বাচনের দিক থেকে সুবীর কোনো ভুল বা অন্যায় করেছে বলে নিলয়ের মনে হয়নি। যে পদ্ধতি অনুসরণ করে শুভকার্যটি সম্পন্ন হল, সেইখানেই আপত্তি। সব কিছু স্থির হয়ে গেল, অথচ সুবীর বাবা-মার সম্মতি নেওয়া দূরে থাক, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ পর্যন্ত করল না, এমনকি তাকে পর্যন্ত জানাল না, এটাই অত্যন্ত বিস্ময়কর। নিলয় পরে জেনেছিল, কেন সেটা করেনি, অর্থাৎ করে উঠতে পারেনি। অন্যের পক্ষে যেটা ছিল সহজ ও স্বাভাবিক, সুবীরের কাছে সেটাই কঠিন ও দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এইখানেই নিলয় তাকে সাহায্য করতে পারত, যদি ঘটনার গতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাবার আগে তার দৃষ্টিগোচর হত। তার জন্যে সুবীর যতটা দোষী, নিলয়ের দোষ তার চেয়ে কম নয়।

সুবীরের মা-বাবা ভাই-বোনের সঙ্গে মিশবার পর সে আরো বুঝতে পেরেছিল, তাঁদের তরফ থেকে কোনো বাধা আসত না। ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় হাত দিতে পারলে, এতবড় একটা মর্মান্তিক

পরিণতি অতি সহজে এড়ানো যেত। সেই সুযোগ সে হেলায় হারিয়েছে। তার জন্যে নিলয়ের মনে ক্ষোভ এবং আফসোসের অন্ত ছিল না।

আজ সুবীরের আপনজনেরা যখন তার শূন্য আসনে একটি অনাত্মীয় এবং প্রায় অপরিচিত আগন্তুককে সাদরে আহ্বান করে বসিয়ে দিল, তার অন্তর্নিহিত বেদনাটুকু উপলব্ধি করে নিলয়ের একমাত্র চেষ্টা হল, বন্ধুর সেই জায়গাটি তাকে ফিরিয়ে দেওয়া। কিন্তু এখন আর সেটা সহজ নয়। তার জন্যে একটি অনুকূল আবহাওয়ার প্রয়োজন। যখন-তখন যেমন-তেমন করে কথাটা পাড়লেই হবে না। আঘাত যে কত গভীর একটি মাত্র লক্ষণেই সেটা সুস্পষ্ট। এঁদের কারো মুখে সুবীরের নাম পর্যন্ত নেই, অথচ তার বন্ধু বলেই এখানে তার যাতায়াত এবং এখনো তারা একই জায়গায় থাকে, একই কারখানায় কাজ করে। নিলয় অপেক্ষা করছিল সেই শুভ মুহূর্তের, যখন মালতী কিংবা সুহৃদের কাছ থেকে এমন কিছু পাবে, কোনো আভাস বা ইঙ্গিত, যার সুযোগ নিয়ে সে এই বেদনাময় অধ্যায়টা খুলে ধরতে পারে।

সেই ক্ষণটিই বোধহয় এল একদিন।

বিকেল বেলা। সুহৃদ তখনো ফ্যাক্টরী থেকে ফেরেননি, সুনীত শিখাও বাড়ি ছিল না। শুধু নিলয় বসেছিল মালতীর ঘরে। হাতে চায়ের পেয়ালা, সামনে একটা টিপয়ের উপর টী-পট্। তার থেকেই চা-টা ঢেলে নিলয়ের হাতে দিয়ে মালতী এইমাত্র খাটের উপর গিয়ে বসেছিলেন। তাঁর মুখের উপর একটি গভীর ম্লান ছায়া। সেটা লক্ষ্য করেই নিলয় চুপ করে ছিল। মাথা নিচু করে চামচে দিয়ে চিনিটা মিলিয়ে নিচ্ছিল। সেইদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে মালতী হঠাৎ বললেন, ওর সঙ্গে তোমার দেখা হয়?

কার সঙ্গে, বলবার প্রয়োজন ছিল না। নিলয় তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, তা হয় বৈকি! একই তো আফিস।

আফিসে ছাড়া অন্য সময়? বেড়াতে-টেড়াতে যাঁও না তোমরা?

নিলয়কে এবার সত্য গোপন করতে হল, যাই মাঝে মাঝে।

কিছু বলে-টলে? •

কোন্ বিষয়ে, প্রশ্ন করতে যাওয়া যেমন অর্থহীন, উত্তর দেওয়াও তেমনি কঠিন। নিলয় চুপ করে রইল। মনে করল, সেই নীরবতার মধ্যেই তাঁর জিজ্ঞাসার জবাব পেয়ে যাবেন মালতী। হয়তো তাই পেলেন, কিন্তু তার সাগ্রহ চোখ দুটির দিকে চেয়ে নিলয় একেবারে নীরব থাকতে পারল না। অপরাধীর মতো মাথা নত করে ধীরে ধীরে বলল, আপনি তো সবই বুঝতে পারেন মাসিমা। সে মুখ যদি থাকত—

এর বেশী আর কী বলবে নিলয়? মালতী অনেকটা যেন স্বগতোক্তির মতো বললেন, একবার আসতেও তো পারত।

একটু থেমে নিলয়ের দিকে চোখ তুলে যোগ করলেন, তুমি বোধহয় জানো না, উনি তাকে বৌ নিয়ে আসতে লিখেছিলেন।

জানি মাসিমা, সে চিঠি আমি দেখেছি। অন্য কেউ হলে হয়তো ছুটে আসত। কিন্তু আপনার ছেলেকে তো আপনি জানেন।

কী চায় সে?

তা জানি না। তবে এতদিন তাকে দেখে, তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে মিশে যা বুঝেছি, সুবীর বোধ হয় আপনার কাছ থেকেও কিছু একটা—, সেটা যে চিঠি লিখেই জানাতে হবে. এমন কোনো কথা নেই।

অর্থাৎ সে নিজেই সেটা এই মুহূর্তে বয়ে নিয়ে যেতে প্রস্তুত, নিলয়ের কথায় এবং ইঙ্গিতে সেটুকু অস্পষ্ট রইল না।

মালতী নত মুখে নীরবে বসে রইলেন। তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে চোখ তুলে বললেন, তুমি কি আর একটু চা নেবে।

দিন না।

নিলয়ের চা-এর কোনো প্রয়োজন ছিল না। প্রয়োজন ছিল আর

একটু সময় নেবার, ছিন্ন সূত্রের ধারটা আবার যদি তুলে নেন মালতী, এই আশায়। কিন্তু সে আশা অপূর্ণ রয়ে গেল।

টী-পটের ঢাকনা খুলে নিলয়ের পেয়ালাটা ভরে দিয়ে তিনি নিঃশব্দে উঠে গেলেন।

নয়

অন্যের ভালো করতে যাওয়ার মতো মহৎ প্রচেষ্টা আর কী হতে পারে? সে 'অন্য' যদি নেহাৎ পর হয়, কারো কারো মনে হয়তো সন্দেহ জাগতে পারে, পিছনে কোনো মতলব নেই তো? কিন্তু যার ভালো করতে যাচ্ছি সে যেখানে একান্ত আপনজন, সেখানে সে-কথা উঠতে পারে না। তবু সেখানেও পরোপকার প্রবৃত্তির মুখে একটা বলগা থাকা দরকার। তা না হলে, উপকৃত ব্যক্তি যতই আপন হোক, একদিন সে মনে মনে বলবে, আর নয়, এবার আমার নিজের ভালো নিজেকেই করতে দাও।

সুতপার বারবার সেই কথা মনে হচ্ছিল। কিন্তু মিসেস দত্ত ওদিকে পণ করে বসেছেন, কন্যা-জামাতার কল্যাণই তার ধ্যান-জ্ঞান, সাধনা, তার জন্যে তিনি করতে পারেন না, এমন কিছু নেই। হুট করে নিলয়ের বাড়ি গিয়ে তাকে চা-খাবার করে খাওয়ানো যে কতখানি অন্যায় হয়েছে, সে সম্বন্ধে মেয়েকে সানুযোগ জ্ঞানদান করেই ক্ষান্ত হলেন না, ভবিষ্যতে তারা কার বাড়ি যাবে, আর কার বাড়ি যাবে না, তার একটা তালিকাও তৈরি করে দিলেন। মেয়ে গুম হয়ে রইল। আর কেউ হলে তার মুখ দেখেই বুঝতে পারত, সেখানে আর যাই হোক, মায়ের আদেশ-নির্দেশ নত শিরে মেনে নেবার কোনো লক্ষণ ফুটে ওঠেনি। কিন্তু দত্তজায়া বুঝলেন না, অথবা বুঝেও সে সব গ্রাহ্যের মধ্যে আনলেন না। তাঁর একটা মোক্ষম যুক্তি ছিল, তোরা ছেলে মানুষ, তোরা কী বুঝিস? আর বলতেন, তুই আমার পেটে হয়েছিস, না আমি তোর পেটে হয়েছি?

একদিন সন্ধ্যাবেলা মেয়ের সংসারের সমস্ত খুঁটিনাটি স্বচক্ষে তদারক করে চাকর-বাকরদের যথারীতি ধমক-ধামক দিয়ে, ওদের দুজনের উপরেও কিছু মূল্যবান উপদেশ বর্ষণ করে সবে যখন গাড়িতে গিয়ে উঠলেন, সুতপা গম্ভীর মুখে স্বামীর ঘরে গিয়ে কোনো রকম ভূমিকা না করে বলে ফেলল, চল, আমরা এখান থেকে চলে যাই।

সুবীরের চমকে উঠবার কথা, কিন্তু এখন আর উঠল না। ইদানীং সেও ভিতরে ভিতরে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিল। ধীর ভাবে বলল, কোথায় যাবো ?

কোথাও একটা চাকরি যোগাড় করতে পারবে না ?

তা হয়তো পারবো। কিন্তু এরা যে ছাড়বে না।

কেন ছাড়বে না ? ওদের টাকা চুকিয়ে দিলেই হলো।

সেটাও তো নেহাৎ কম নয়। কোত্থেকে দিই ?

সে জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। ও-টাকা আমি দেবো। তুমি চাকরির চেষ্টা ছাখ।

সুবীর স্ত্রীর কথাটাকে একেবারে উড়িয়ে দিল না। টাকাটা সংগ্রহ করাও ওর পক্ষে এমন কিছু কঠিন নয়, তাও বুঝল। তার পরের ব্যাপারটা যখন ভাবছে, সুতপা আবার এসে বলল, চাকরি তো ফস্ করে পাওয়া যাবে না। তার চেয়ে এক কাজ কর না কেন ? আমি এখানেই কিছুদিন থাকি, তুমি বরং কোলকাতা চলে যাও। তোমার নিজের বাপ-মা-ভাই-বোন, নিজেদের ফার্ম। আমার জন্যে সব কিছু ছেড়ে দেবে কেন ?

এবার সুবীর চমকে উঠল। স্ত্রীর মুখের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। বুঝতে পারল না, কী বলতে চায় সে। সুতপা আরো কাছে সরে এসে, ওর চেয়ারের পাশটিতে দাঁড়িয়ে কাঁধের উপর একটা হাত রেখে হালকা সুরে বলল, ভয় নেই, এখনি ডিভোর্স করতে বলছি না। বলছিলাম, প্রথমটায় একা গিয়ে ছাখ। ছেলেকে

ওঁরা ফেলবেন না, তা জানি। সেই সঙ্গে বৌকেও যদি চান, তার দিক থেকে কোনো বাধা নেই। যেদিন ইচ্ছে, এসে নিয়ে যেও।

'আমি জানি,' সুতপার যে আঙুল কটি ওর কাঁধের উপর ছিল নিজের হাতে নিয়ে গাঢ় স্বরে বলল সুবীর, 'আমার বাবা-মাকেও আমি চিনি। গোড়াতে যা-ই ঘটে থাকুক, আমাকে আর তোমাকে তাঁরা কখনো আলদা করে দেখবেন না।

সুতপা আর কোনো কথা না বলে নত হয়ে স্বামীর অন্য কাঁধের উপর চিবুকটা নামিয়ে দিল। সেই নিবিড় স্পর্শের ভিতর দিয়ে যে কথা বলা হল, সুবীর সমস্ত চেতনা দিয়ে অনুভব করল। চাঁপার মতো কোমল, দীঘল আঙুলগুলো ওর বুক পর্যন্ত নেমে গিয়েছিল। তার উপর মৃদু আঘাত করে বলল, যদি যেতে হয়, আমরা দুজনে এক সঙ্গেই যাবো।

যদি কেন বলছ? স্নিগ্ধ স্বরে বলল সুতপা। সুবীর সে কথার জবাব দিল না। স্বামীর হাত থেকে নিজেকে ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে নিয়ে সুতপা এবার সোজা হয়ে দাঁড়াল। বলল, এ তোমার অন্যায় অভিমান, সুবীর। এ তরফের ব্যাপারগুলো ভুলে যাচ্ছ কেন? তা সত্বেও তোমার বাবা আমাদের যাবার জন্যে লিখেছিলেন।

তা লিখেছিলেন, অতি নিস্তেজ ভাবে কথাগুলো যেন শুধু আউড়ে গেল সুবীর। তারপর বলল, কি জানো সুতপা, আমার মাকে তো আমি সেই এতটুকু থেকে দেখছি। আত্মীয়-স্বজনদের কত অন্যায়, ছেলেমেয়েদের কত অত্যাচার যে মা মুখ বুজে সয়ে গেছে, শুনলে তুমি মনে করবে বানিয়ে বলছি। সেই মা আমাকে একটিবার ডাকল না!

সুতপা বলতে গিয়েছিল, তোমার অভিমান আছে, আর তাঁর বুঝি থাকতে নেই? পারল না। মনে হল, স্বামীর নিগূঢ় অন্তরের এই গভীর বেদনাটুকু একান্ত ভাবে তারই, এখানে শুধু দুজন মানুষের স্থান আছে—মা আর ছেলে, আর কেউ নয়। স্ত্রীও এর অংশ নিতে পারে না। তার পক্ষে কোনো সান্ত্বনা দিতে যাওয়াও প্রগলভতা।

মিসেস দত্তের একটা মহিলা সমিতি ছিল। মাঝে মাঝে দু-একটা সন্ধ্যায় সেখান থেকে ডাক আসত। সেই সুযোগ নিয়ে সুতপাও বাড়ি গিয়ে কোনো রকম ভূমিকা না করে বলল, বাবা আমাকে কিছু টাকা দাও।

দত্তসাহেব একটু অবাক হলেন। মেয়ে তো এভাবে কখনো টাকা চায় না। বললেন, কী করবি ?

দরকার আছে।

কত টাকা ?

তা তো জানি না। কত হলে কোম্পানী ওকে ছেড়ে দেবে, সেটা তুমি বলতে পার।

মিস্টার দত্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকালেন। কপাল রেখাময় হল। বললেন, ব্যাপারটা কী বলত ?

ব্যাপার কিছু নয়। ও এখানে থাকতে চাইছে না। আমার মনে হয়, অন্য কোথাও চলে যাওয়াই ভালো।

কোথায় যাবে ? চাকরি-টাকরি ঠিক করেছে কিছু ?

এখনো করেনি।

ওর বাবার ফ্যাক্টরীতে যদি যেতে চায়, আমি বলবো সেটা ঠিক হবে না। আমি যদ্দূর জানি, সে অতি ছোট ব্যাপার। মানে ওর মতো একটি ব্রাইট ছেলের কেরিয়ার হিসাবে কিছু নয়।

ওর ঝোঁক আসলে বিজ্‌নেসের দিকে। টাকা দিতে পারে এমন কোনো ভালো পার্টনার পেলে চাকরি না খুঁজে এখন থেকেই শুরু করতে পারত।

নট্ এ ব্যাড্ আইডিয়া। আমারো এক সময়ে ইচ্ছা ছিল, বিজ্‌নেস করবো। হল কৈ ? চাকরির পাঁকে কিছুদিন ঘুরবার পর আর বেরিয়ে আসা যায় না। ঘানির বলদ কি আর চাষের কাজে লাগে ? আচ্ছা, সেদিকে আমি বরং কিছু সাহায্য করতে পারবো। সুবীরকে একবার দেখা করতে বলিস।

আর শোনো—কোনো একটা অত্যন্ত গোপনীয় বিষয় বলতে যাচ্ছে, এমনি ভাবে বাবার মুখে চোখ রাখল সুতপা, মা যেন এসব কিছু জানতে না পারে।

দত্তসাহেব হাসলেন, সে কথাও কি তোমাকে বলে দিতে হবে মা-মণি? এদিকে এসে বোস।

উপরের দক্ষিণ-খোলা বারান্দায় আরাম চেয়ারে শুয়েছিলেন বীরেশ্বর দত্ত। সুতপা গিয়ে বসেছিল তার পায়ের দিকটায়। বাবার সস্নেহ আহ্বানে চেয়ারটা টেনে নিয়ে তাঁর কাছটিতে গিয়ে বসল। মেয়ের পিঠের উপর হাত রাখলেন দত্তসাহেব। বললেন, আমি সব বুঝি, কিন্তু কী করবো বল। যে কদিন আছি এমনি করেই কাটবে। তোদের কথা আলাদা। তুই ভাবিস না। আমার যেটুকু সাধ্য, আমি করবো।

সুতপা আর কোনো কথা বলল না। ঝুঁকে পড়ে বাবার বুকে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

দিন কয়েক পরেই কোম্পানীর একজন শাঁসালো কণ্ট্রাক্টরের সঙ্গে কথা বললেন দত্তসাহেব। জামাতার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিলেন। লোকটি সিন্ধী। জব্বলপুরের ওদিকে কোথায় সিমেণ্টের কারখানা আছে। প্রচুর টাকার মালিক। এবার ইচ্ছা হয়েছে, রপ্তানি ব্যবসায়ে নামবেন। খবর নিয়ে জেনেছেন, দূর-প্রাচ্যে এবং পূর্ব-আফ্রিকার কোনো কোনো দেশে, যারা নতুন শিল্পায়ন শুরু করেছে, নানা রকম এঞ্জিনীয়ারিং পণ্যের বিপুল চাহিদা। ওখানকার বাজারগুলো হাত-করা খুব কঠিন হবে না। কঠোর প্রতিযোগিতার আশঙ্কা নেই। তার কারণ কিছুটা রাজনৈতিক, অর্থাৎ ইয়োরোপ-আমেরিকা সম্পর্কে ওরা ভীষণ স্পর্শ-কাতর। পুবে পেলে আর পশ্চিমের দিকে হাত বাড়াবে না। ভয় শুধু জাপানকে। তার সম্বন্ধেও কোনো কোনো রাষ্ট্রের বিরূপ মনোভাব রয়েছে। সেগুলোকে অন্তত পাওয়া যাবে।

মাল চেনে, কোথায় কী ফাঁকি আছে ধরতে পারে, এমন একজন এঞ্জিনীয়ারই খুঁজছিলেন ভদ্রলোক। মাইনে-করা চাকরে নয়, অংশীদার হিসাবেই নেবেন। যোগাযোগ ঘটে গেল। চীফ্ এঞ্জিনীয়ারের জামাই। তাছাড়া সুবীরের সঙ্গে কথাবার্তা বলেও তিনি যাকে বলে, ইম্‌প্রেস্‌ড্ হলেন। বুঝলেন, একে দিয়ে কাজ চলবে। অফিস হলো বম্বেতে। সুবীরকে ওখানেই থাকতে হবে। ফ্ল্যাটও ঠিক হয়ে গেল।

মিসেস দত্ত মেয়ের সংসারের তদারকি যথারীতি চালিয়ে যেতে লাগলেন। ভিতরে ভিতরে সেখানে যে একটু একটু করে গোটাবার আয়োজন শুরু হয়ে গেছে, জানতে পারলেন না।

যখন পারলেন, তখন ওরা বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে।

এই দিনটি সম্বন্ধে সুতপার মনে গভীর আশঙ্কা ছিল। মাকে নিয়ে যতখানি, তার চেয়ে বেশী তার স্বামীটিকে নিয়ে। তার শিরদাঁড়ার জোর তো সে ভালো ভাবেই জানে। শাশুড়ীর দুর্জয় চাপে শেষ মুহূর্তে সেটা ভেঙে পড়াও আশ্চর্য নয়। সে মেয়ে। তার যা কিছু করবার নেপথ্য থেকেই করতে হবে। এ ব্যাপারে সামনে এসে দাঁড়ানো চলবে না। ওদিকে বাবার অবস্থাও প্রায় তাই। স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কন্যা-জামাতাকে সমর্থন করবেন, এ আশা একেবারেই নেই। বিশেষ করে, টাকাটার উৎস গোপন রাখবার জন্যে তাঁকে বরং খানিকটা নির্লিপ্ত থাকতে হবে। সুতপা নিজেই তাঁকে সে বিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে এসেছে।

কিন্তু মায়ের কাছে কথাটা পাড়বার ভার তাকেই নিতে হবে। সেটা সুবীরের উপর ছেড়ে দিতে পারে না। স্বামীর অভিপ্রায় এবং ব্যবস্থামত তার হয়েই বলতে এসেছে, এমনি ভাবেই অবশ্য তুলতে হবে প্রসঙ্গটা, যাতে করে মা বুঝতে না পারেন এ ব্যাপারে সে-ই অগ্রণী। তারপর তিনি যা-ই ধরে নিন। আর দেরি করা চলে না। মায়ের তীক্ষ্ণ এবং সজাগ দৃষ্টির সামনে এদিকের আয়োজনটাকে বেশী দিন

ঢেকে রাখা সম্ভব হবে না। এরা গোপন করে গেছে, তিনি অন্য সূত্র থেকে জানতে পেরেছেন—সেটা বড় অশোভন এবং অনুচিত। সুতপার ইচ্ছাও তা নয়। মাকে বলে, বুঝিয়ে, তাঁর আশীর্বাদ এবং শুভ কামনা নিয়েই সে যেতে চায়।

এখান থেকে দূরে কোথাও যাবার জন্যে একদিন যেমন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, যাওয়া যখন স্থির হয়ে গেল, তখন যেন মনটা আবার ঝিমিয়ে যেতে চাইছে। নানা জায়গায় টান পড়ছে। এতটা বয়স পর্যন্ত মাকে ছেড়ে সে কোথাও যায়নি। মাও তাকে ছেড়ে থাকেনি। এ যাওয়া দুদিকেই বাজবে। তবু বলতে হবে। কিন্তু তার মধ্যে যেন কোনো তিক্ততার স্পর্শ না লাগে, কোনো অপ্রীতির কাঁটা না থেকে যায়।

সুতপা ভাবছিল, মা যদি বুঝত, মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, এবার সে যেখানে হোক নিজের সংসার পাতবে, নিজের ঘর নিজের মনের মতো করে গুছিয়ে নেবে, সেইটাই স্বাভাবিক, সব বাপ-মাই সেই কামনা করে, তাহলে সবটাই সুখের হত। এখানকার চাকরি ছেড়ে এত তাড়াতাড়ি অন্যত্র যাবার প্রয়োজনও হয়তো দেখা দিত না।

কিন্তু অত বুদ্ধিমতী হয়েও মা যেন ঐ একটা জায়গায় অন্ধ। তাই যে যাওয়াকে একটি সাধারণ ঘটনার মতো সকলের সমক্ষে, সমবেত শুভেচ্ছার মধ্য দিয়ে সহজ ও শোভন করে তোলা যেত, তারই জন্যে কত সন্তর্পণে অগ্রসর হতে হচ্ছে! এরও কোনো প্রয়োজন ছিল না।

যা-ই হোক, জানাতে হবেই এবং সেটা অবিলম্বে।

ও বম্বেতে চাকরি পেয়েছে, আমরা চলে যাচ্ছি—এমনি একটা সাধারণ ধরনের প্রস্তাব নিয়ে গেলে মা একরাশ প্রশ্ন করে তার মধ্যে অনেক গলদ বের করে ফেলবে। এর চেয়ে আরো জোরালো কিছু তার হাতে থাকা দরকার, যাকে উড়িয়ে দেওয়া মার পক্ষেও কঠিন হবে। তার জন্যে সুতপাকে আবার তার বাবার দ্বারস্থ

হতে হল। বাড়িতে সে সুযোগ পাওয়া মুস্কিল। আগে আগে বাবার আফিসেও কখনো কখনো হঠাৎ গিয়ে হাজির হত। সি ঈ-র এই আদরের কন্যাটিকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং অন্যান্য পদস্থ অফিসারেরা স্নেহের চক্ষে দেখতেন। বিয়ের পর আর যায়নি। এখন আর সে শুধু কন্যা নয়, স্ত্রী এবং এখানকারই একজন জুনিয়র এঞ্জিনিয়ারের স্ত্রী। কথায় কথায় হুট করে বাবার আফিসে গিয়ে ওঠা চলে না। স্বামীর প্রাক-বিবাহ জীবনের বন্ধু ও সহকর্মীদের কাছেও তার স্থানটা এখন অন্য রকম।

সুতরাং চাকরের হাতে বাবাকে একটা চিঠি পাঠিয়ে দিল। এক লাইনের চিঠি—বাবা, বাড়ি ফেরার পথে এখান থেকে চা খেয়ে যেও।

দত্তসাহেব বেশ একটু আগে আগেই এসে পড়লেন। সুতপা তখনো রান্নাঘরের কাজ সেরে বেরোয়নি। চায়ের দু-একটি অনুপান সে নিজে হাতে তৈরি করছিল। জুতোর শব্দ পেয়ে সেখান থেকেই ডাকল, বাবা।

কীরে? কোথায় তুই?

এই তো। এসো না। আজ যে তোমার এত শীগগির কাজ সারা হয়ে গেল?

আমার কাজ কি কখনো সারা হয় মা-মণি? তোর রান্নার লোভে পালিয়ে এলাম। আহা, একটা ভুল হয়ে গেল যে।

কী ভুল হল?

সুবীরকে একটা খবর দিয়ে এলে হত। এমনিতে তার আসতে দেরি হবে।

তা হোক। তাকে তো বলিনি, শুধু তোমার নেমন্তন্ন।

তাই নাকি! উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠলেন দত্তসাহেব। নেমন্তন্নের আয়োজনটা একবার দেখি।

রান্নাঘরের সামনে গিয়ে ভিতরে উঁকি মারলেন। সুতপা তাঁকে

খানিকটা আড়াল করে দাঁড়িয়ে বলল, বাঃ, আগে দেখতে দেবো কেন?

আচ্ছা, আচ্ছা, আমি চোখ বন্ধ করলাম। একেবারে খাবার টেবিলে গিয়ে খুলবো।

চায়ের সঙ্গে কয়েকটি তুচ্ছ কিন্তু মুখরোচক খাদ্যের উপর মিস্টার দত্তের প্রবল আসক্তি ছিল—যেমন, বেগুনি, তালের বড়া, আলু-কাবলি ইত্যাদি। সবগুলোই জাতে ছোট, এবং অনেকটা সেই কারণেই মিসেস দত্তের দু-চক্ষের বিষ। দত্তসাহেবের এই সাধারণ-জন-সুলভ প্রবৃত্তি তাঁর কাছে কোনোদিন প্রশ্রয় পেত না। স্বামীর পুরোপুরি খাদ্য-তালিকা তিনিই স্থির করে দিয়েছিলেন এবং তা নিয়ে তাঁর গর্বের অন্ত ছিল না। বলতেন, ওঁর কোন্‌টা ভালো লাগে, উনি কী বোঝেন? সে সব আমি জানি।

জানেন যে এবং তিনি ছাড়া আর কেউ জানেন না, হাতে-কলমে তার প্রমাণও দিতেন। তাঁর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে প্রতিদিন প্রচুর ব্যয়ে নানারকম উচ্চ পর্যায়ের সুখাদ্য তৈরী হত 'সাহেবের' জন্যে, এবং তাঁকে সেগুলো অম্লান বদনে গলাধঃকরণ করতে হত। বলবার উপায় ছিল না, এটা আমার ভালো লাগছে না। বরং খেতে খেতে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠতেন, বাঃ, চমৎকার হয়েছে তো।

একদিন কী একটা রান্নায় নুন দিতে ভুলে গিয়েছিল বাবুর্চি। দত্তসাহেব সেটা মুখে দিয়েই মন্তব্য করলেন, খাসা রেঁধেছে। সমর্থনের জন্যে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলেন। তিনি নুনের পাত্রটা প্লেটের উপর জোরে জোরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে মুখ বিকৃত করে বললেন, নুন-ঝালটাও বোঝ না?

খাবার টেবিলে বাবার এই অসহায় মূর্তি সুতপা প্রত্যহ লক্ষ্য করত, তাঁর যন্ত্রণাটা অনুভব করে কষ্ট পেত। কিন্তু তার করবার কিছু ছিল না। কখনো কচিৎ মা কোথাও গেলে বাবুর্চিকে দিয়ে কিংবা নিজ হাতে বাবার দু-একটা প্রিয় রান্নার ব্যবস্থা করত।

আজও তাই করেছিল। দত্তসাহেব ভীষণ খুশি। ব্যাসন দিয়ে আলু ভাজাটা আরো কয়েকখানা নেবার ইচ্ছা ছিল। সুতপাই বাধা দিল, থাক, ভাজা জিনিস তো। বেশী খেলে তোমার শরীর খারাপ করতে পারে।

খাবার পর একথা-ওকথার পর সুবীরের নতুন কাজের কথা উঠতেই সুতপা বলল, কই. ওরা তো আর চিঠি-পত্তর কিছু দিল না।

আবার কি চিঠি দেবে? ওদিকে সব কিছু ঠিক হয়ে আছে। এখন সুবীর এখান থেকে ছাড়া পেলেই হল।

তবু যাকে লেটার অব অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট বলে, তেমন ধারা কিছু একটা—

এটা তো কোনো অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট্ নয় যে লেটার অব্ অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট্ হবে। পার্টনারশিপ্ বিজনেস্। তার জন্যে দলিল-পত্তর যা দরকার সব হয়ে গেছে। কেন, সুবীর কিছু বলেছে নাকি?

না, ও কিছু বলেনি। আমিই জিজ্ঞেস করছিলাম। মাকে তো এখনো জানানো হয়নি। ওদের কাছ থেকে একটা কিছু তাগিদ-টাগিদ পেলে সুবিধে হত।

দত্তসাহেব হেসে উঠলেন, তা মন্দ বলিসনি। পিঠে বাঁধবার মতো একটা কুলো চাই। কিন্তু তাতে করে পুরোপুরি পিঠ বাঁচাতে পারবে বলে তো মনে হয় না। তবু যতটা হয়, এই তো? আচ্ছা, কালই বোধ হয় পানোয়ানীর সঙ্গে আমার দেখা হবে। কোলকাতায় গেছে। এখান হয়ে ফিরবে। বলে দেবো, বম্বের আফিসে পৌঁছেই যেন একটা টেলিগ্রাম করে দেয়।

দিন তিনেকের মধ্যেই পানোয়ানীর টেলিগ্রাম এসে গেল। সুবীরের নামে আফিসের ঠিকানায়—এখানে সব তৈরী, অবিলম্বে চলে আসুন।

সুবীর ভিতরের ইতিহাস জানত না। তার পেয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল। লাঞ্চ খেতে বাসায় এসেই সেটা সুতপার হাতে দিয়ে বলল, আর দেরি করা চলে না।

সুতপা বলল, এদিকের কদ্দুর? ছাড়া পেয়েছ? মানে, যাকে বলে ছাড়পত্তর।

সব রেডি হয়ে আছে। চাইলেই পেয়ে যাবো।

আজই তাহলে মাকে বলতে হয়।

এখনো বলনি নাকি?

না, এটার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।

হাতের টেলিগ্রামটা দেখিয়ে দিল।

সুবীর কয়েক সেকেণ্ড কী ভেবে নিয়ে বলল, এক কাজ কর। আজ না বলে কাল সকালে গিয়ে বল।

কেন?

আমি কাল-পরশু দুটো দিন ছুটি নিয়ে একটু বাইরে যাবো ভাবছি। তোমাকে তো ও বাড়িতে গিয়েই থাকতে হবে। সেই ফাঁকে —

এ সময়ে আবার কোথায় যাবে?

একটু কোলকাতা থেকে ঘুরে আসি।

সুতপা স্বামীর মুখের পানে তাকাল। একটু সময় নিয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল, ওঁদের সঙ্গে দেখা করে যাবে?

না, অন্য কাজ আছে। তাছাড়া দু-একজন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গেও মীট্ করতে চাই। অতদূরে চলে যাচ্ছি।

সুতপা ভালোভাবেই জানে, সেরকম বন্ধুবান্ধব কেউ নেই, থাকলেও তাদের সঙ্গে দেখা করবার কোনো তাগিদ সে স্বামীর মধ্যে একদিনও দেখতে পায়নি। 'বাইরে যাবার' আসল উদ্দেশ্যটা বুঝে ফেলতে তার এক মিনিটও লাগল না। ঠোঁটের কোণে একটি ভরা হাসি ফুটে উঠল। সুবীর স্বভাবতই তার সামনে

খানিকটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল, এবং সেটা কাটাবার জন্যে বলল, হাসছ যে ?

পালিয়ে কতক্ষণ থাকবে ?

সুবীর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল, কী যে বল? পালাবো কিসের জন্যে? কিন্তু গলায় বিশেষ জোর ফুটল না। সুতপা আশ্বাসের সুরে বলল, ভয় নেই। প্রথম ঝড়টা তো আমার ওপর দিয়েই যাবে। পরের দু-চারটে ঝাপটা যদি সামলাতে না পার বিয়ে করেছিলে কেন? তোমাকে এবার একটু শক্ত হতে হবে, বুঝলে গো মশাই? কদিন আর বৌএর আঁচলের তলায় লুকিয়ে থাকবে ?

লুকিয়ে মানে? কী যে ভাব তুমি আমার সম্বন্ধে—বলে, বোতাম-খোলা কোটের দুটো ধার ধরে ঝাঁকানি দিয়ে খাড়া হয়ে বসল।

সুতপা বলল, আচ্ছা, এবার কাজের কথায় আসা যাক। মা কিন্তু প্রথমেই জানতে চাইবে, টাকাটা কে দিলে। আমি বলবো, তুমি বাড়ি থেকে আনিয়েছ। তোমাকেও তাই বলতে হবে।

সুবীরের মুখে গাম্ভীর্যের ছায়া পড়ল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল তারপর ?

কী তারপর? মা বিশ্বাস করবে না, বলছ ?

না, মানে, বাবা টাকা দিলেন, অথচ আমি তাঁর কাছে না গিয়ে চললাম বম্বে। ব্যাপারটা একটু কেমনধারা নয় কি ?

সুতপাও সেটা মনে মনে অস্বীকার করতে পারল না। ভাবতে লাগল। ও প্রসঙ্গে আর না এগিয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করল, নিলয়বাবু এখানে আছেন তো ?

আছে। কেন ?

সন্ধ্যার পর একবার যদি আসতেন। না, থাক, তাঁকেই বরং বাসায় থাকতে বলো।

তুমি যাবে ?

হ্যাঁ। কিন্তু সেকথা কিছু বলো না।

'আমি কিন্তু যেতে পারবো না।

কেন?

বেশ কিছু কাজ জমে গেছে। পাঁচটার পর ঘণ্টা দুয়েক করে না বসলে এ কদিনে সারা যাবে না।

ও, তার মানে এ্যাদ্দিন মনের আনন্দে ফাঁকি দেওয়া হয়েছে।

তা কী করবো? আমি তো আর ইচ্ছে করে ফাঁকি দিইনি।

তবে? ভ্রূকুঞ্চিত করে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল সুতপা।

সুবীর জবাব দিল না, কিন্তু তার চোখ এবং সেখানে যে হাসিটি ফুটে উঠল, তার থেকে সুতপার বুঝতে কিছুই বাকী রইল না। তবু অজ্ঞতার ভান করে বলল, চুপ করে রইলে যে? ভাবছ, কার ঘাড়ে দোষ চাপানো যায়?

ভাববার আর কী আছে? ঘড়িই সেটা বলে দিচ্ছে। ছুটোয় ফিরবার কথা, আর এখন?—বলে, বাঁ হাতটা বাড়িয়ে ধরল।

সুতপা মুখ টিপে হাসল। সে তো জানে, শুধু আজ নয়, ঘড়ি প্রায় রোজই এই কথা বলে। নীরবে জানিয়ে দেয়, লাঞ্চের ঘণ্টা অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে। কিন্তু দুজনের কারুরই সেদিকে হুঁস থাকে না। কোনো কোনো দিন হঠাৎ ঘড়ির দিকে চেয়ে সুবীর হয়তো বলে ওঠে, ঈস্, বড্ড দেরি হয়ে গ্যাছে, এবার চলি। সুতপা বাধা দেয় না বটে, কিন্তু তার মুখে বা হাবভাবে স্বামীকে বিদায় জানাবার কোনো লক্ষণও ফুটে ওঠে না, যদিও সে আফিসের নিয়ম শৃঙ্খলা সব জানে, এবং সুবীর সেটা মেনে চলুক, তার কাজের কোনো ক্ষতি না হোক, তাও নিশ্চয়ই চায়।

'চলি' বলে উঠে দাঁড়াবার পরেও সুবীরের পা দুটো চলতে চায় না। কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যেই ঘোরাঘুরি করে। ওদিকে ঘড়ি আপন মনে এগিয়ে যায়!

কোনোদিন এমনও হয়, ঘড়ির কাঁটাগুলো যে বড় বেশী এগিয়ে

গেছে, সে খবরটা সুতপাই আগে জানতে পারে। সুবীরের সেদিকে খেয়াল নেই দেখেও তো একবার মনে করিয়ে দেয় না।

সুতরাং সুবীর যদি তার ফাঁকির দায়িত্ব সবটুকু নিজের ঘাড়ে না নিয়ে কিছুটা অন্ততঃ আর একজনের উপর চাপাতে চায়, তাকে দোষ দেওয়া যায় না। সুতপাও সেটা নিজের কাছে অস্বীকার করবে না। কিন্তু মনে মনে মেনে নিলেই কি সব কথা মুখেও কবুল করা যায়? অন্ততঃ তাঁর একটি সৃষ্টির বেলায় বিধাতা সে বিধান রাখেননি। তার নাম স্ত্রীজাতি। সুতপা তারই অন্তর্ভুক্ত, এবং সে সৃষ্টিছাড়া নয়। তাই এতদিনের গাফিলতির সব দায় এবং দোষ সে অম্লান বদনে স্বামী বেচারার মাথায় চাপিয়ে দিল।

ঘড়িবাঁধা হাতখানায় একটা ঠেলা দিয়ে বলল, আমাকে ঘড়ি দেখিয়ে কী হবে। আমি সাতজন্মেও কাউকে আফিস পালাতে বলিনি।

বলনি?

না।

বেশ, কাল থেকে তাহলে পরম আরামে ক্যান্টিনে বসে আবদুলের মটন কারী নামক—

থাক, অত আরামে দরকার নেই।

তবে কি? হরিবাসর?

বাঃ, তা কেন? খেতে আসতে তো বারণ করিনি। খাবে, আর লক্ষ্মীছেলের মতো তখ্খনি গিয়ে কাজে লাগবে। খাবার'পর রোজ রোজ এইসব—

স্ত্রীকে থেমে যেতে দেখে সুবীর দুষ্টুমির হাসি হেসে বলল, কী সব?

কী আবার? ঝঙ্কার দিয়ে উঠল সুতপা, এই যা কর রোজ।

কী করি?

জানি না, যাও।

সুবীর যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছিল। সুতপাও উঠে এল স্বামীকে সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত এগিয়ে দেবার জন্যে। কাছাকাছি এসেও তার মতলবটা বুঝতে পারেনি। যখন পারল, তখন দুটি বলিষ্ঠ বাহুর নিবিড় বন্ধনে বাঁধা পড়ে গেছে। ঠোঁট দুখানাও মুক্ত নয় যে প্রতিবাদ জানাবে। পরক্ষণেই জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চারদিকে তাকিয়ে চাপা ধমকের সুরে বলল, চাকরটা রয়েছে না।

ও, তাহলে— বলে, বাঁ হাতে কোমর বেষ্টন করে সুবীর যখন তাকে ঘরের দিকে আকর্ষণ করল, তখনো অবশ্য একবার 'না' বলে আপত্তি জানাতে ছাড়ল না, কিন্তু দেহ বা মনের কোনোখানে তার ক্ষীণ প্রতিধ্বনির আভাসটুকুও পাওয়া গেল না।

•

নিলয় কিছুই জানত না। সহকর্মিমহলে একটা কানাঘুষা শুনেছিল, সুবীর চলে যাচ্ছে। কোম্পানীর পাওনাও মিটিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে। বিশ্বাস হয়নি। এতবড় একটা ব্যাপার! সত্য হলে সুবীর নিশ্চয়ই তাকে বলত। যদিও ইদানিং তাদের বাইরের যোগসূত্রটা অনেকখানি ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল, কথাবার্তাও ছিল বিরল, তবু সৌহার্দ্যের অভাব তো কিছু ঘটেনি। অন্যত্র চাকরি পাওয়াটা এমন কিছু ঘটনাও নয়, যা তার কাছে গোপন রাখবার কারণ থাকতে পারে।

বিশ্বাস না করবার সব চেয়ে বড় কারণ, কোম্পানীর পাওনা তো কম নয়, সুবীর সেটা মিটিয়ে দেবে কেমন করে। তার নিজের হাতে টাকা নেই। বাড়ি থেকে আনালে নিলয় জানতে পারত। তাছাড়া বাড়ির সঙ্গে বর্তমানে যে সম্পর্ক, সে প্রশ্নই ওঠে না।

সেদিন ফ্যাক্টরি বন্ধ হবার একটু আগে সুবীর তাকে বাইরে ডেকে নিয়ে আগাগোড়া ঘটনাটা যখন মোটামুটি জানিয়ে দিল,

নিলয় কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, সব একেবারে ঠিক হয়ে গেছে?

হ্যাঁ, তা একরকম ঠিক বই কি। তোমাকে বলব বলব করেও বলা হয়নি। আসলে ওদিকে কদ্দুর কী হচ্ছে, আমি জানতাম না। তপাই সব করছে। পেছনে আছেন কত্তা স্বয়ং, টাকাটাও তিনি দিয়েছেন।

বল কী! মিসেস্ রাজী হলেন?

তিনি এখনো জানতেই পারেননি।

কিন্তু তাঁকে না জানিয়ে—

না, জানাতে হবে নিশ্চয়ই। সে-সব তপা বুঝবে। মা-মেয়ের ব্যাপার, আমি ওর মধ্যে নেই। সে যাক গে। তুমি সন্ধ্যাবেলা আছ তো?

আছি।

নিলয় প্রথমটা একটু আঘাত পেয়েছিল—এত কাণ্ড হয়ে গেল, আর সুবীর তাকে একটিবার জানাল না। এবার আর কোনো ক্ষোভ রইল না। বুঝল, ব্যাপারটা আর কিছু না, হাত বদল। তার বন্ধুটির ভূমিকা একই আছে। দাবার বড়ে। এতদিন চাল দিচ্ছিলেন শাশুড়ী, এবার দেবে স্ত্রী। সেই সঙ্গে মায়ের কবল থেকে মুক্তি চাইছে মেয়ে।

এই 'মায়ের' জন্যেই নিলয় নিজেকে তার প্রিয়বন্ধু এবং বন্ধুপত্নীর প্রীতিপূর্ণ সান্নিধ্য থেকে সরিয়ে এনেছিল। এত কাছে থেকেও এই দূরত্ব শুধু বেদনাদায়ক নয়, দৃষ্টিকটু। এই সরে আসা উপলক্ষ করে চারদিক থেকে বিদ্রূপ লাঞ্ছনাও তাকে কম সইতে হয়নি। তবু তাকে নিয়ে ওদের জীবনে কোনো অশান্তি বা জটিলতার সৃষ্টি হয়, তা সে চায়নি।

আজ ওরা নিজেরাই দূরে চলে যাচ্ছে। স্নেহ-প্রীতি-ভালোবাসার বন্ধন সকলেই কামনা করে। কিন্তু সে বন্ধন যখন শিকল হয়ে

দাঁড়ায়, তাকেই আবার ঝেড়ে ফেলে দেবার জন্যে ছটফট করতে থাকে। মানুষের জীবনে সব চেয়ে বড় আকাঙ্খিত বস্তু মুক্তি, নিজেকে মেলে ধরবার মতো অবাধ অবকাশ। 'সেই ফাঁকটুকু যদি না পায়, মায়ের স্নেহ, দয়িতের প্রেম, ঐশ্বর্যের আরাম সবকিছুই তার কাছে বিস্বাদ।

এদের এই চলে যাওয়াকে নিলয় সেদিক দিয়ে সর্বান্তঃকরণে শুভেচ্ছা জানাল। সে তো জানে, শুধু সুখ নিয়ে সুখী হওয়া যায় না, যদি তার সঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্য না থাকে। একটি নব-বিবাহিত দম্পতির পক্ষে সেটা আরো সত্য। সেই জন্যেই লোকে আশীর্বাদ করে, তোমরা সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর কর।

সুবীর ও সুতপার সুখের অভাব নেই, কিন্তু স্বচ্ছন্দ হতে পারছিল না। এবার ওরা সুখী হোক, ওদের মিলন পূর্ণ হোক। তার চেয়ে বড় কামনা নিলয়ের আর কী আছে?

কিন্তু আরেক দিকে নিলয়ের মনের কোণে একটা নৈরাশ্যের ম্লান ছায়া ঘনিয়ে এল। না, তার নিজের কথা ভেবে নয়, যদিও একটা শূন্যতা বোধ বার বার তার বুকের মধ্যে ঠেলে ঠেলে উঠছিল। এরা যেদিন চলে যাবে, তারপর সে একেবারে একা। এতদিন বিশেষ আসা যাওয়া না থাকলেও দেখাশুনো হত, কথাবার্তা হত। সে ওদের কাছে যেত না, কিন্তু সুবীর মাঝে মাঝে ঘুরে যেত। সুতপা আসত না, স্বামীর মুখে আসত তার উদ্বেগভরা কুশল প্রশ্ন, ভৃত্যের হাতে আসত দুটি একটি সযত্নে তৈরী মিষ্টান্ন, তার সঙ্গে জড়ানো একটি মিষ্টি মনের দরদ, প্রীতি। সে সব আর আসবে না। ও দিকটা তার একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল।

কিন্তু এই মুহূর্তে এসব কথা সে ভাবছিল না। সুতপাকে দিয়ে সে যে মনে মনে একটি নতুন আশা-সৌধ গড়ে তুলেছিল, সেটা হঠাৎ মাঝপথে ভেঙে পড়ল। তারই আঘাত তার মনটাকে নিরাশায় ভরে

মালতীর সঙ্গে সেদিনকার সেই সামান্য ছুটি কথা, যদিও তার ভিতরে ছেলের সম্পর্কে তাঁর মনের স্পষ্ট রূপটা ধরা দেয়নি, তবু নিলয়ের কাছে একটি শুভ ইঙ্গিত বয়ে এনেছিল। সেদিন থেকেই সে ভাবছিল, এবার তার প্রথম এবং প্রধান কাজ হবে, তাঁর ছেলে-বৌকে একসঙ্গে তাঁর পায়ের কাছে নিয়ে ফেলা। এতদিন তার উপযুক্ত আবহাওয়া তৈরী হয়নি। এবার হয়েছে। যার হাত দিয়ে হয়েছে, তাঁর নাম কাল। সেই সব করে। তিক্ততার স্বাদ ভুলিয়ে দেবার, ক্ষতকে নিরাময় করবার অতবড় ওষধি আর নেই। মানুষ বোঝে না বলেই তাড়াহুড়া করতে যায়, অসময়ে হাত লাগিয়ে সহজকে জটিল করে তোলে। এসব ক্ষেত্রে সুফল লাভের একমাত্র উপায় অপেক্ষা করা। নিলয় এতদিন ধরে তাই করে এসেছে।

আরো একটা কারণে তাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে। সুবীর যা-ই কেননা করে থাক, তার মন তো নিলয়ের অজানা নয়। তার দিক থেকে কোনো ভাবনা ছিল না। ভাবনা ছিল যে নতুন মানুষটি তার জীবনে এসে দাঁড়াল, তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ সূত্রে বাঁধা হয়ে গেল, তাকে নিয়ে। সেই সূত্রটা কত বড়? সে কি শুধু একজনকে জড়িয়েই ফুরিয়ে যাবে? না, সেই একজন এতদিন যাদের নিয়ে সম্পূর্ণ ছিল, তাদের দিকেও এগোতে পারবে। সে কি শুধু রুদ্র পরিবারের পদবীটা নিয়েই ক্ষান্ত হবে? না, সেখানকার মানুষ কটিকেও গ্রহণ করবার অভিলাষী?

মিসেস দত্ত অজ্ঞাতসারে নিলয়ের একটা মস্তবড় উপকার করেছিলেন। তাঁরই ব্যবস্থায় সে খুব কাছে থেকে বেশ কিছুদিন ধরে সেই নতুন মানুষটিকে দেখবার, চিনবার, তার আশা-আকাঙ্খা, শিক্ষা, সংস্কার এবং সবার উপরে তার মনের আসল রূপটা প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পেয়েছিল। পেয়ে তার সব ভাবনা দূর হয়েছিল।

সুতপাকে সরাসরি কোনো প্রশ্ন না করেও নিলয় বুঝতে পেরেছিল, মা এবং মেয়ে একেবারে ভিন্ন ধাতুতে তৈরী। মিসেস্ দত্ত শুরু থেকেই শুধু জামাতাটিকে চেয়েছিলেন, এবং তাকে মুঠোর মধ্যে পেয়ে মনে করলেন, সব হল। তাঁর কন্যাটি স্বামীকে একান্ত করে চাইলেও তার পরিজনদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে পেতে চায় না। শুধু স্ত্রী নয়, বধূ হবার আকাঙ্ক্ষাও সে মনে মনে পোষণ করে। সে বিষয়ে নিলয় নিশ্চিত হতে পেরেছিল।

এবার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোনো একটা শনিবার সন্ধ্যায় সে এই নবদম্পতিটিকে নিয়ে হঠাৎ গিয়ে হাজির হবে নিউ সাউথ পার্কের বাড়িতে—এতদূর পর্যন্ত নিলয়ের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। আগে থেকে কোনো খবর দেওয়া হবে না। খবর দেবার মতো কিছু নেই। নিতান্তই সহজ ও স্বাভাবিক ঘটনা। ছেলে তার কর্মস্থল থেকে বৌ নিয়ে বাড়ি এসেছে বাপ-মা ভাই-বোনের সঙ্গে সপ্তাহান্তে ছুটি কাটাতে। আগে আগে যেমন আসত। এই বৌটিই শুধু সত্য, তার আবির্ভাব উপলক্ষ করে দু-তরফে যা কিছু ঘটেছে, যত কিছু মনান্তর, সব একটা দুঃস্বপ্নের মতো অলীক। বিয়ের পর থেকে ঐ দিনটি পর্যন্ত সবটাই একটা সমাপ্ত অধ্যায়। সেটা বন্ধ করে দেওয়া হল। সে পাতাগুলো আর খোলা হবে না।

রবিবারটা কাটিয়ে পরদিন ভোরের গাড়িতে দু-বন্ধুতে ফিরে আসবে। থেকে যাবে সুতপা। ছেলে তার অসতর্ক হাতের স্থূল আঘাতে যে স্বর্ণসূত্রটুকু একদিন দুভাগ করে ফেলেছিল, বৌ তার নিপুণ হাতের কোমল স্পর্শ দিয়ে সেই ছেঁড়া তার দুটো জুড়ে দেবার ভার নেবে, এবং সেটা সে যে সহজেই পারবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তার জন্যে শুধু একটু সময় চাই।

কিন্তু সে সময় দেবার সুযোগ আর এল না। নিতান্ত এক অকল্পিত দিক থেকে ছুটে এল বাধা। ঘটনার ধারা বয়ে গেল অন্য খাতে। নিলয়ের সব পরিকল্পনা বানচাল করে দিয়ে গেল।

সুবীর ও সুতপাকেও ভাসিয়ে নিয়ে চলল একেবারে ভিন্ন পথে। কে জানে কোথায় গিয়ে পড়বে তারা, আজকের এই অনুকূল আবহাওয়া কী রূপ নেবে সেখানে, এই উন্মুখ মন বিমুখ হয়ে দাঁড়াবে কিনা? সবই রইল অনিশ্চয়ের গর্ভে।

আসন্ন বন্ধুবিচ্ছেদের চেয়ে এই ভাবনাটাই নিলয়কে পীড়া দিতে লাগল।

সুবীর যখন জানতে চাইল, সন্ধ্যার পর সে বাসায় থাকবে কিনা, নিলয় তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন করেনি। স্বাভাবিক ভাবে ধরে নিয়েছিল, ও আসতে চায়। চলে যাবার এখনো কিছু দেরি আছে, তার আগে দু-বন্ধুতে একটু মুখোমুখি বসতে চায়, আগেকার দিনে যেমন বসত। কোথা দিয়ে কত ঘণ্টা কেটে যেত, হুঁস থাকত না। সুবীরের বিয়ের পরেও তার সাজানো বাংলোর দক্ষিণের বারান্দায় এমনি অনেক সন্ধ্যা তাদের কেটেছে। শুধু দুখানার বদলে তিনখানা চেয়ার, মাঝখানে একটি ছোট্ট টেবিল।

তৃতীয় ব্যক্তিটির আগমন তাদের আড্ডার চেহারা এবং ধরণও কিছুটা বদলে দিয়েছিল। দু-বন্ধুতে যে কথা চলে, একটি তরুণীর সামনে তার উপরে একটা বলগা পরাতে হয়—যদিও সে একজনের স্ত্রী, আর একজনের বন্ধুজায়া, এবং বলা যেতে পারে বান্ধবী।

কিন্তু কোনো কোনো দিকে রাশটানার দরকার হলেও সে কথার গতি বা বেগ কখনো ব্যাহত হয় না। সে তখন নতুন দিকে পথ করে নেয়, নতুন রূপ এবং রসস্পর্শে স্বাদু ও রমণীয় হয়ে ওঠে।

ওদের বেলাতেও তাই হয়েছিল। তারপর একদিন একটি চেয়ার খালি করে দিতে হল। সেটা কিছু নতুন নয়, অস্বাভাবিকও নয়। বনিতার উদয় হলে বন্ধুকে সরে আসতে হয়। এক আকাশে সূর্য ও

চন্দ্রের স্থান নেই। এ ক্ষেত্রে কে চাঁদ, কে সূর্য, সে প্রশ্ন অবান্তর। সে যা-ই হোক, দুজন থাকতে পাবে না। থাকলেও কিছুক্ষণের জন্যে, এবং অনেকটা প্রচ্ছন্ন রূপে। নিলয় যেমন ছিল। তবে তার প্রস্থানটা ঠিক স্বাভাবিক কারণে ঘটেনি। সেই জন্যেই কিছু ক্ষোভ রয়ে গেছে। সে যাক।

আজ দূরে চলে যাবার আগে সুবীর আসছে তার কাছে। যাকে বিদায় নেওয়া বলে, এটা ঠিক তা নয়। তার জন্যে হয়তো আরেক দিন আসবে, যাবার মুখে। এ আসা এমনি আসা। কিংবা হয়তো কিছু বলবার আছে। সুতপাও আসবে কি? সম্ভবতঃ না। সে আসবে সেই দিন, যেমন তাকেও গিয়ে দাঁড়াতে হবে ওদের বাড়ি, বন্ধুদম্পতির বিদায় ক্ষণে জানাতে হবে শুভেচ্ছা ও প্রীতিসম্ভাষণ।

বলা যায় না, সুতপাও এসে পড়তে পারে স্বামীর সঙ্গে, সেই আরেক দিন যেমন এসেছিল। দুটি হাতের যাদুস্পর্শে এক নিমেষে তার এই শোভাহীন, সজ্জাহীন ঘর দুখানির মধ্যে একটি স্নিগ্ধ শ্রী এনে দিয়েছিল।

সেদিনের কথা মনে হতেই নিলয় ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। চারদিকের অগোছালো মলিন রূপটা যেন সহসা বড় স্পষ্ট হয়ে উঠল। একবার ইচ্ছা হল, সেদিন যেমন করেছিল, চাকরটিকে ডেকে জিনিসপত্রগুলো একটু গোছগাছ করে রাখে। ডাকতে গিয়েও ডাকল না, ভিতর থেকে তেমন উৎসাহ পেল না। শুধু জেনে নিল, ঘরে চা এবং তার সরঞ্জামগুলো অর্থাৎ চিনি, দুধ, ষ্টোভের কেরোসিন ইত্যাদি সব ঠিক আছে কিনা। আছে জেনে আশ্বস্ত হল। প্রায়ই দেখা যায়, দরকারের সময় ওর কোনো না কোনোটার অভাব ঘটে এবং তার অদ্বিতীয় বাহনটিকে অসময়ে বাজারে ছুটতে হয়।

আফিস থেকে ফিরে ধড়াচূড়ো ছেড়ে নিলয় রোজ খানিকটা

বেড়িয়ে আসে। আজ সুবীরের অপেক্ষায় বাড়িতেই রইল। বসবার ঘরের দরজাটা খুলে রেখে দিয়ে শোবার ঘরে ক্যাম্প চেয়ারে বসে একটা বাংলা মাসিকের পাতা ওলটাতে লাগল। সুবীর এলে উঠে যাবার দরকার নেই। সে সোজা ভিতরে চলে আসবে। তার খানিকটা দেরিও আছে। এই তো সবে বেরোল আফিস থেকে। সস্ত্রীক এলে আরো দেরি হবে। একটা তৈরী হবার পালা আছে। সেটা যত সাদাসিদে ভাবেই সারা হোক, কিছু সময় তো লাগবেই।

কিন্তু প্রত্যাশিত সময়ের বেশ কিছুটা আগেই বাইরের ঘরে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল, এবং সেটা আর অগ্রসর হল না। মিনিট দুয়েক অপেক্ষা করে নিলয় চাকরটিকে ডেকে বলল, দ্যাখ তো কে ?

সে এক নজর দেখে ছুটে এসে ফিস্ ফিস্ করে বলল, মেমসায়েব !

মেমসায়েব ! বিস্ময়ের সুরে কথাটার পুনরুক্তি করল নিলয়, কিন্তু বুঝতে পারল না কোন্ মেমসাহেব, এবং এখানে তার কী প্রয়োজন থাকতে পারে। অগত্যা উঠে পড়তে হল। বসবার ঘরের ভিতরের দরজা পেরিয়েই একেবারে থ হয়ে গেল। অভ্যর্থনা দূরে থাক, নমস্কারের কথাটাও মনে পড়ল না।

মিসেস দত্ত নিজেই একটা চেয়ার টেনে বসলেন এবং শুষ্ক গম্ভীর স্বরে বললেন, বসো নিলয়। তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে। দরজাটা বন্ধ করে দাও।

এ কোন্ মিসেস দত্ত! এখানকার প্রতিটি মানুষ এতদিন দেখে এসেছে, তিনি যখন চলেন চারদিকে একটা হিল্লোল তুলে চলেন, যখন কথা বলেন তাঁর কণ্ঠ শুধু নয়, সারা অঙ্গ উচ্ছল হয়ে ওঠে। কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁকে বড় নিষ্প্রাণ বলে মনে হল। নিলয় আরো অবাক হল, বাইরে কোনো গাড়ি দাঁড়িয়ে নেই, গাড়ির শব্দও সে পায়নি। সঙ্গে একটি বেয়ারা চাপরাশী কিংবা চাকর পর্যন্ত নেই। চীফ্ এঞ্জিনিয়ারের স্ত্রী, স্বামীর চাইতেও যার

দাপট বড়, এবং চালচলনের জাঁকজমক আরো বেশী, সন্ধ্যার অন্ধকারে একা একা পায়ে হেঁটে এসেছেন তাঁদেরই এক অধস্তন কর্মচারীর 'বি' মার্কা বাড়িতে। চোখের উপর দেখেও বিশ্বাস করা শক্ত।

নিলয় কলের পুতুলের মতো মনিব পত্নীর নির্দেশ পালন করল। দরজা বন্ধ করে জড়-সড় হয়ে সামনের চেয়ারে বসল এবং যে একটি কথা তিনি বলতে এসেছেন, যার সম্বন্ধে কোনো ক্ষীণ-ধারণাও তার মনে এল না, তারই জন্যে উৎকণ্ঠ হয়ে রইল।

মিসেস্ দত্ত দুমিনিট মাথা নিচু করে কী ভাবলেন, তারপর চোখ তুলে বললেন, ও-বাড়ি থেকে তোমার চলে আসার ব্যাপারে তুমি বোধহয় আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছ?

নিলয় সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল, না, না, সে কী কথা!

আমি অবিশ্যি তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারতাম। তারপর ভাবলাম, তার দরকার নেই, তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, নিজেই বুঝতে পারবে, কেন তোমার নিজের কোয়ার্টার্স্ ফেলে ওখানে পড়ে থাকা উচিত নয়। সে যাক। আজ একটা বিশেষ জরুরী কাজে তোমার কাছে এসেছি। তোমাকে সেটা করে দিতে হবে, নিলয়।

শেষের দিকে এমন একটি অনুনয়ের সুর ছিল, যার উত্তরে কিছু না জেনেও নিলয়কে আশ্বাস দিতে হল, আজ্ঞে আমার পক্ষে যতটা সম্ভব —

সম্ভব বৈকি! কথাটা যেন নিলয়ের মুখ থেকে কেড়ে নিলেন মিসেস দত্ত, সম্ভব না হলে, এমন করে তোমার কাছে ছুটে আসতাম না। তবে, বুঝতেই পারছ, ব্যাপারটা এখানে একদম গোপন রাখতে হবে, এমন কি তোমাদের সি, ঈ. পর্যন্ত জানতে পারবেন না।

নিলয় ভিতরে ভিতরে একটু শঙ্কিত না হয়ে পারল না। কে জানে তাকে কোথায় নিয়ে চলেছেন মনিব-পত্নী?

মিসেস দত্ত ধীরে ধীরে বললেন, তুমি তো জানো নিলয়, আমার একমাত্র সন্তান ঐ তপা। ওর আগে একটা ছেলে হয়েছিল টিকল না। ঐ মেয়েটাই আমার ছেলে মেয়ে সব। ওকে কাছছাড়া করতে পারবো না বলেই সুবীরের বাবা-মার সঙ্গে ঐ রকম ব্যবহার করেছি। ওঁদের প্রথম ছেলে, কত কষ্টে মানুষ করেছেন. ওর ওপরে একটা গোটা পরিবারের কত আশা-ভরসা, সব আমি জানি। জেনেও বাপ-মা ভাইবোনের কাছ থেকে ছেলেটাকে একরকম ছিনিয়ে নিয়েছি। সব ঐ তপার দিকে চেয়ে। ও যে আমার নিজের হাতে গড়া, এতটা বয়স পর্যন্ত নিজের মনের মতো করে মানুষ করেছি। ওর বিয়ে দিতে হবে, ভাবতেই ভয় হয়েছে। কত রাত ঘুমোতে পারিনি। কার হাতে পড়বে, একটা কোন্ অচেনা সংসারে গিয়ে কার মুখ চেয়ে থাকবে, কেউ হয়তো ওর মনের দিকে তাকাবে না, কখন কী চাই বুঝবে না,—ও নিজেও কি তা বোঝে? কষ্ট পাবে, কত অসুবিধা হবে, এই ছিল আমার ভাবনা। তাই চেষ্টা করেছি, যেমন করে হোক ওকে নিজের কাছে রাখতে হবে. অন্ততঃ চোখের ওপর, আর যতটা পারি নিজের আওতার মধ্যে। তাই পেয়েছিলাম, তাই তো ছিল। কিন্তু কটা মাস না যেতেই—

মিসেস দত্তের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। হঠাৎ থেমে গেলেন। মিনিট কয়েক পরে আবার বললেন, ওরা চলে যাচ্ছে কেন তুমি বলতে পার? সুবীরের কাজকর্ম নিয়ে কী কোনো গোলমাল হয়েছে?

না, না, গোলমাল কেন হবে?

তবে?

এর চেয়ে ভালো কাজ পেয়েছে বলেই যাচ্ছে।

ও সব বাজে কথা। আসলে সুবীর যাচ্ছে না, ওকে যাওয়াচ্ছে আমার ঐ মেয়ে, ঐ কালসাপ, যাকে আমি এতকাল ধরে দুধকলা দিয়ে পুষেছি।

নিলয়ের ইচ্ছা হল, সুতপার পক্ষ নিয়ে কিছু একটা বলে। কিন্তু মিসেস্ দত্তের চোখের দিয়ে চেয়ে সাহস হল না। তেমনি চুপ করে বসে রইল।

মিসেস দত্ত পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করলেন। নিলয়ের দিকে খানিকটা ঝুঁকে পড়ে বললেন, তুমি তো সুবীরদের বাড়ি প্রায়ই যাও ?

আজ্ঞে হাঁ. মাঝে মাঝে যাই।

ওর বাবা-মা তোমাকে খুব ভালবাসেন, শুনেছি। আর, নাই বা বাসবেন কেন ? তোমার মতো ছেলে ! আসছে রবিবার—না, অত দেরি করলে চলবে না, কাল সকালের গাড়িতে চল আমি তোমার সঙ্গে ঘুরে আসি।

নিলয় চমকে উঠে চোখ তুলল, আপনি !

হাঁা, দোষ কী ? কুটুমবাড়ি যাবো…

ভাবছ, সম্পর্কটা সেরকম নয়। ছেলে-বৌ যেখানে যেতে পারছে না, সেখানে বেয়ান গিয়ে উঠবে কোন্ সুবাদে ? অতশত ভাবতে গেলে এখন আর আমার চলে না নিলয়। আর যা-ই করুন, ওঁরা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করবেন না।

না. সে-বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। কিন্তু আপনি যেটা চাইছেন. সে দিক দিয়ে ওঁরা কদ্দূর কী করতে পারবেন বুঝতে পারছি না।

কেন, সুবীরের বাবা যে-টাকাটা দিয়ে দিয়েছেন, সেটা ফিরিয়ে নেবেন। ও যেমন ছিল তেমনি থেকে যাবে। কোম্পানী এখনো তাকে রিলিজ করেনি। টাকা ফেরৎ নিতে চাইলে যাতে আপত্তি না করে, সেটা আমি দেখবো।

নিলয় আর কিছু বলল না। তার মনের মধ্যে একসঙ্গে অনেকগুলো

ভাবনা ভিড় করে এল। বুঝতে পারল, সে যতটা অনুমান করেছিল, ব্যাপারটা এরই মধ্যে তার চেয়ে আরো বেশী জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাকে সাবধান হয়ে মুখ খুলতে হবে। কিছু একটা করবার আগে আরো সতর্ক হয়ে এগোতে হবে। এই মহিলাটিকে শুধু যে আসল বিষয়ে অজ্ঞ রাখা হয়েছে, তাই নয়, কিছু কিছু মিথ্যা খবরও দেওয়া হয়েছে।

নিলয়কে চুপ করে যেতে দেখে মিসেস দত্ত তাঁর নিজের প্রস্তাবটা আর একটু খোলসা করবার চেষ্টা করলেন। বললেন, সুবীরের বাবা যে ভুল করেছেন সেটাই আমি তাঁকে বুঝিয়ে দেবো। ছেলেকে যদি নিজের কাছে নিয়ে ওঁর ফ্যাক্টরীর কাজে লাগাতে চান, আমি আর বাধা দেবো না। কিন্তু তার জন্যে তাকে আরো কিছুদিন এখানে রেখে দেওয়া দরকার। তা না করে এ কী করছেন তিনি! বম্বেতে সে কী করবে? তাঁর ছেলেকে আমি তাঁর চেয়েও বেশী চিনি। ওর মাথার ওপর কেউ না থাকলেও যে কিছু করতে পারবে, সে ভরসা খুবই কম। সে কি তুমিও জানো না।

নিলয়ের পক্ষে আর নীরব থাকা সম্ভব নয়। 'হাঁ' 'না' একটা কিছু বলতে হবে। হয় মনিব-জায়ার আদেশ মতো তাঁকে নিয়ে পরদিনই নিউ সাউথ পার্কের উদ্দেশে রওনা দিতে হবে, নয়তো সবিনয়ে জানাতে হবে, আমি অক্ষম। শুধু অক্ষমতা জানিয়েই পার পাওয়া শক্ত। তার কারণও দেখাতে হবে, এবং তার পিছনে সুযুক্তি থাকা চাই। এর কোনোটাই সহজ নয়। তার চেয়েও বড় সমস্যা, যে তথ্যগুলো মিথ্যা বা রহস্যের আবরণে ঢাকা দেওয়া আছে, তাদেরও বাইরে আনা চলবে না। তাই বা কেমন করে সম্ভব?

মিসেস দত্ত যদি তাঁর গোড়াকার ভুল শোধরাবার সদিচ্ছা নিয়ে কুটুম্ব বাড়ি যাবার প্রস্তাব করতেন, নিলয় সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে যেত। তার চেয়ে বাঞ্ছনীয় আর কী আছে? কিন্তু যে-বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি যেতে চাইছেন, তার থেকে সুফলের কোনো

আশা তো নেই-ই, উপরন্তু তার জের যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, সেটা টানতে গিয়ে কে কোথা দিয়ে জড়িয়ে পড়বে, কিছুই বলা যায় না।

টাকার প্রশ্নে সুহৃদ স্বভাবতই আকাশ থেকে পড়বেন। তাঁকে বলতে হবে, তিনি কিছু জানেন না। মিসেস দত্তের মতো মহিলা যে সেখানেই নিরস্ত হবেন, সে আশা দুরাশা মাত্র। তিনি আরো তৎপর হয়ে উঠবেন এবং তার ফলে হয়তো 'মিস্টার' আর অন্তরালে থাকতে পারবেন না। একমাত্র মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে, তার সুখ-স্বাচ্ছন্দের কথা ভেবে যে দুর্বলতা তিনি দেখিয়ে ফেলেছেন, তাঁকে তার কঠোর মূল্য দিতে হবে। কন্যাকেও তিনি বাঁচাতে পারবেন না। মিসেস শুধু তাঁর স্বামীর জীবনকে বিষময় করে ক্ষান্ত হবেন না, সে বিষের জ্বালা কন্যা-জামাতাকেও সইতে হবে। একসঙ্গে দুটো সংসারে অশান্তির আগুন লেগে যাবে।

এই রকম যেখানে পরিস্থিতি, বুদ্ধিমান লোকেরা সেখানে নিজেদের গা বাঁচিয়ে চলে। এই জাতীয় জটিলতার মধ্যে ঢুকতে যায় না। সেইটাই স্বাভাবিক। কী দরকার পরের ঝঞ্ঝাটে জড়াতে যাবার? কিন্তু সংসারে কিছু মানুষ আছে—সংখ্যায় অতি বিরল এবং লোকে তাদের সুবুদ্ধি বলে না—যাদের স্বভাব হল পরের তল্‌পি বয়ে বেড়ানো। যে দায় তাদের নিজের নয় এবং অনায়াসে এড়ানো চলে, কখনো সাধ করে কখনো বা অজ্ঞাতসারে, তাই তারা ঘাড়ে নিয়ে বসে। নিলয় সেই প্রকৃতির মানুষ। ছেলেবেলা থেকে তার ভাগ্যবিধাতা তাকে দিয়ে অনেক অনাবশ্যক পরের বোঝা বইয়েছেন, এবং আজও সেই দিকেই ঠেলে দিলেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে মনস্থির করে ফেলল। তাঁর অকাট্য যুক্তি নিলয় মেনে নিয়েছে, মনে মনে সে সম্বন্ধে আশ্বস্ত হয়ে মিসেস দত্ত যখন জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলেন, সকালের দিকে কোন্ গাড়িতে বেরিয়ে পড়লে সুবিধা হয়, নিলয় তাঁর দিকে চেয়ে দৃঢ় কণ্ঠে

বলল, সুবীরের টাকাটা তার বাবা দিয়েছেন বলে রাষ্ট্র হলেও আসলে তিনি কিছুই জানেন না।

বল কী! তাহলে কে দিলে?

নিলয় মুহূর্তকাল কী ভাবল এবং তারপর দ্বিধাহীন সহজ সুরে জবাব দিল, আমি দিয়েছি।

তুমি!

গভীর বিস্ময়ে এই একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করে মিসেস দত্ত নিষ্পলক দৃষ্টিতে নিলয়ের মুখের পানে চেয়ে রইলেন। নিলয় সেদিকে চোখ রাখতে পারল না। অপরাধীর মতো মাথা নত করে যেন কৈফিয়ৎ দিচ্ছে এমনি ভাবে প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলল, অমন একটা ভাল কাজ, হাজার কয়েক টাকার জন্যে হাত ছাড়া হয়ে যায়, তাই—

থামো। রীতিমতো গর্জে উঠলেন মিসেস দত্ত। তোমার মতলব আমি জানি। মনে করেছ এমনি করে আমার ওপর শোধ নেবে! আচ্ছা—

ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে সারা দেহে একটা ঝাঁকানি দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই নিলয়ও সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে হাত জোড় করে অনুনয়ের সুরে বলল, বিশ্বাস করুন, আপনি যা বলছেন ওরকম কোনো উদ্দেশ্য আমার ছিল না। সুবীর আমার বন্ধু, তার দরকারের সময় টাকাটা ধার দিয়ে যদি একটু—

বলতে বলতে থেমে গেল এবং বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল তার মনিব গৃহিণীর দিকে।

দৃপ্ত ভঙ্গিমায় দরজার দিকে কয়েক পা এগিয়েই মিসেস দত্ত থমকে দাঁড়ালেন। হঠাৎ কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল। শক্ত ঋজু ঘাড়টা নিচে নেমে এল, শিরদাঁড়াটাও যেন নুইয়ে পড়ল সামনের দিকে। পিছন ফিরে তাকালেন না। শান্ত-করুণ কণ্ঠে বললেন, তুমি কিছু মনে করো না। তোমার কোনো দোষ নেই। পেটের মেয়েই যখন পর হয়ে গেল, তখন—

পরের কথাগুলো আর শোনা গেল না। হয়তো সেগুলো রুদ্ধ কণ্ঠের অন্তরালেই রয়ে গেল।

নিলয়ও নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখের সামনে তেমনি অবনত শিরে ধীর পদক্ষেপে রাস্তায় নেমে পড়লেন মিসেস দত্ত, এবং সর্বদেহে যেন একরাশ পরাজয়ের গ্লানি বয়ে নিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

দশ

সুহৃদ সাধারণত ছ'টায় ফেরেন। আজ খানিকটা আগেই এসে পড়লেন। উপরে যখন উঠলেন, অন্য দিন মুখে যে মালিন্য ও ক্লান্তির ছাপ পড়ে, তার বদলে বেশ খানিকটা ঔজ্জ্বল্যের আভাস। মালতীর চোখে কিছুই এড়ায় না। স্বামীর দিকে চেয়ে খুশির সুরে বললেন, এত সকাল সকাল যে?

সুহৃদ জামা ছাড়তে ছাড়তে বললেন, একটু আগে আগে বেরিয়ে ডক্টর ধরের কাছে গিয়েছিলাম।

মালতীর মুখে উদ্বেগের ছায়া পড়ল, কেন, আবার ডাক্তারের কাছে কেন?

সুহৃদ হেসে উঠলেন, সে ডাক্তার নয়, সুনুর প্রফেসর ডক্টর ধর।

স্তাখ দিকিনি কাণ্ড! আমার কি অত খেয়াল আছে? ডাক্তার শুনেই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে কেন?

বলে এলাম, আপনার ছাত্রটিকে এবার ডেকে নিন, আমার আর তাকে দরকার নেই।

উনি কী বললেন?

খুব খুশি হলেন শুনে। চমৎকার লোক, মনটা একেবারে শিশুর মতো। সুনুকে ভীষণ ভালোবাসেন দেখলাম। যে-কটা মিনিট ছিলাম, শুধু ওরই কথা—এমন ছেলে হয় না, যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি পরিশ্রমী, একদিন অনেক বড় হবে।

রিসার্চটা হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়ায় মনে মনে বড় দুঃখ পেয়েছিলেন ভদ্রলোক।

পুত্রগর্বে মালতীর বুকখানা ভরে উঠল। গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, দ্যাখ ওকে দিয়ে যদি বংশের মুখটা থাকে।

ঐ সঙ্গে আরেকটা খবর দিলেন ডক্টর ধর।

কী ?

ওঁকে অন্ধ্র ইউনিভার্সিটি থেকে বারবার ডাকাডাকি করছে। ওখানকার ইংরেজির চেয়ার। এখানে যে কাজে আছেন, তার চেয়ে বড় পোস্ট, মাইনেও বেশ কিছুটা বেশী। বললেন, আমার যাবার ইচ্ছে নেই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোধ হয় এড়ানো যাবে না। যদি যাই সুনীতকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে। অসুবিধে কিছু নেই, আমি তো একটা মানুষ, আমার বাড়িতেই থাকবে। ওখান থেকে একটা স্টাইপেণ্ডও পাইয়ে দিতে পারবো।

মালতীর বুকটা ধক্ করে উঠল—এ ছেলেটাও দূরে চলে যাবে! সঙ্গে সঙ্গে একথাও বুঝলেন, আটকানো যাবে না, সেটা উচিতও নয়। এ রকম সুযোগ কজনের ভাগ্যে জোটে ? ও বড় হোক, মানুষ হোক। অন্ধ্র আর এমনকি দূর ? ছুটি-ছাটায় আসতে পারবে।

এবার আসল কথায় এলেন মালতী। ছেলের রোজগার—তা সে যত সামান্যই হোক—একেবারে বাদ পড়লে স্বামীর উপরে আবার বেশী চাপ পড়বে না তো ? সে বিষয়ে সুহৃদ যা বললেন, সত্যিই সুখবর। পরপর গোটা কয়েক ভালো অর্ডার ঠিকমতো সাপ্লাই দেবার পর ফার্ম বেশ ভালোভাবে দাঁড়িয়ে গেছে, বাজারে নামও হয়েছে। আয় যেটা দাঁড়িয়েছে সেটা বহাল তো থাকবেই, ক্রমশ বাড়বে বলেই ভরসা পাওয়া যাচ্ছে। স্বচ্ছলভাবে সংসার চালিয়ে মূলধনটাকে আস্তে আস্তে বাড়ানো চলবে। কোনো কোনো অংশে কিছুটা করে কাজ বাড়াতে পারলে, আরো ভালো হতো। তবে তার পেছনে খাটনিও চাই তেমনি।

কোনো দরকার নেই. বেশ জোর দিয়ে বললেন মালতী, এই আমাদের যথেষ্ট। এমনিতেই কি কম খাটনি গেল? একদিন নয়, দুদিন নয়, পুরো তিনটে বছর। আর এখন? এখনো তো কোনো আরামের লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না। কাজ তো বোধহয় বেড়েই চলল।

কাজে আমার কোনো কষ্ট নেই, মালতী, যদি তার ফল সম্বন্ধে একটা নিশ্চয়তা থাকে। এতদিন সেটা ছিল না বলেই অত শীগগির ক্লান্তি এসে যেত, মনে হতো শরীর আর বইছে না। আসলে ওটা দেহের নয়, মনের অবসাদ।

সে কথা সত্যি। তবু মানুষের শরীর তো, তাকে বিশ্রাম না দিলে চলে?—বলে, একমুহূর্ত কী ভাবলেন মালতী, তারপর বললেন, এই সময়ে যদি বড় ছেলেটা কাছে থাকত? কী লাভ হলো তাকে শিবপুরে পড়িয়ে? তৈরী হয়ে আজ পাশে এসে দাঁড়াবে, এই আশা করেই না এতগুলো টাকা ঢেলেছিলে তার পিছনে? তখন কি জানতে সবটাই শুধু ভস্মে ঘি ঢালা?

পাশে এসে দাঁড়াবে, সে আশা অবশ্যই ছিল। শুধু তাই নয়, ভেবে রেখেছিলাম, গোড়া থেকেই ওকে পার্টনার করে নেবো, যাতে করে কাজে উৎসাহ আসে, দায়িত্ব বাড়ে। তা হলো না। না হলেও দাঁড়িয়ে গেছে, এতেই আমি সুখী।

একটু থেমে স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন, তোমার কথাটাও বুঝি। শিবপুরের খরচ যোগাতে সেদিন কত জায়গায় টান পড়েছে, কত কাণ্ড করে তোমাকে সব দিক সামলাতে হয়েছে, সব না জানলেও কিছু কিছু জানি। তবু চলে তো গেছে। সেইটাই বড় কথা। সেদিনের কথা ভেবে মনে আমার কোনো ক্ষোভ নেই। তুমিও রেখো না।

ক্ষোভ রাখব না বললেই কি মন থেকে তাকে দূর করে দেওয়া যায়? মালতী অন্তত তা পারেন না। স্বামীর মনের ঐ উদার বিস্তৃতি তার নেই। তবু এ নিয়ে আর কথা বাড়ালেন না। চায়ের আয়োজনে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন।

সুনীত এসে রীতিমতো লাফাতে শুরু করল। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারটা আরো লোভনীয়। সবাইকে ছেড়ে দূরে চলে যেতে হবে, কিন্তু সে আর কতদিন? আর সাত-আট মাস খাটলেই তার থিসিস তৈরী হয়ে যাবে। চাকরি পাবার পরেও সে বসে ছিল না, যতটা সম্ভব কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল।

ঐদিনই ছুটছিল ডক্টর ধরের বাড়িতে। মালতী বাধা দিলেন, এখন কোথায় যাবি? কাল কলেজ করে ওখান থেকে চলে যাস।

শিখা বি-কম পাস করে বসে ছিল। ফার্স্ট ক্লাশ অবশ্য পায় নি। তবে সেকেণ্ড ক্লাশের উপরের দিকেই স্থান পেয়েছিল। তার চার্টার্ড অ্যাকাউণ্ট্যান্সি ব্যাপারটা কিছুই এগোয়নি। বাবার উপর চাপ পড়বে বলে সেও পীড়াপীড়ি করেনি। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করে সে কিছুতেই রাগ চাপতে পারত না। ওর এই ইচ্ছাটাকে কেউ যেন বিশেষ আমল দিচ্ছিল না। মা মুখ টিপে হাসেন, ছোড়দার মুখে তো ঠাট্টা ছাড়া কিছু নেই। নিলয়ের কাছ থেকে খানিকটা উৎসাহ পাবে বলে মনে করেছিল। ওমা! সব সমান! সে যখন তার সমস্ত পরিকল্পনাটা আগাগোড়া বুঝিয়ে দিল, মনে হলো বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনছে বুঝি। কোথায়? চোখ দেখেই বোঝা গেল, কিচ্ছু শোনেনি, শুধু মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। অতক্ষণ ধরে তার বকে মরাই সার হলো। তাড়া দিতেই যেন চমক ভাঙল। এদিকে চালাক আছে। তখনই সামলে নিয়ে বলল, কী বলছিলে? চার্টার্ড অ্যাকাউণ্ট্যান্সি? কী লাভ হবে? শেষ পর্যন্ত চীফ্ অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট্। তার চেয়ে এক কাজ কর, বিজ্‌নেস্ ম্যানেজমেণ্ট পড়। বছর কয়েক পরেই একেবারে জেনারেল ম্যানেজার।

ধেৎ, বলে রাগ করে চলে গিয়েছিল শিখা। নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল আরশির সামনে। সেই চোখ দুটো যেন তখনো তাকে অনুসরণ করছিল, তার সারা অঙ্গে জড়িয়ে ছিল একটি মোহময় দৃষ্টি-স্পর্শ।

চেতনার মধ্যেও এক অদ্ভুত অনুভূতি সঞ্চারিত হয়েছিল। অনেকক্ষণ সে বাইরে আসতে পারেনি। কোথা থেকে এক গোপন, মধুর লজ্জার রক্তিমা সারা গণ্ডে ছড়িয়ে পড়েছিল, তারই অলক্ষ্য পাশ পা দুটোকেও যেন অচল করে দিয়েছিল।

পরের দিনটাও থেকে গিয়েছিল নিলয়। কিন্তু শিখা একবারও তার সামনে আসতে পারেনি।

সুনীত কলেজে নোটিশ দিয়ে দিয়েছে, একমাস পেরোলেই চাকরি ছেড়ে রিসার্চের কাজে ফিরে যাবে। আপাতত কোলকাতায়, তারপর আবার অন্ধ্র-যাত্রার আয়োজন। সেই সবই এখন ভাবছে সবাই, শিখারও যে একটা ব্যাপার আছে, সে কথা যেন কারো মনেই নেই। কয়েকদিন ধরে সংসারের ভাবগতিক সে বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখল। তার পর একটা সুযোগ বুঝে সোজা চলে গেল বাবার কাছে। তিনি কী সব কাগজপত্র দেখছিলেন। ওকে বোধহয় লক্ষ্য করলেন না। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে ডাকল, বাবা।

কে, খুকু? কী খবর মা-মণি?

আসছে সেশনে আমাকে ভর্তি করে দিচ্ছ তো?

কোথায়?

ও মা! তাও ভুলে গেছ? তা যাবে বৈকি? আমি তো আর ছেলে নই, মেয়ে। মেয়ের কথা কে ভাবে?

সুহৃদ হাসলেন। কাগজগুলোর উপরে একটা কাঁচের চাপান বসিয়ে দিয়ে মুখ তুলে বললেন, মেয়ের ভাবনাই তো সব চেয়ে বড় ভাবনা। হবে, হবে; তোমার ভর্তির বন্দোবস্ত করাই এখন আমার প্রথম কাজ।

আর কিন্তু মোটে দু-মাস আছে কোর্স শুরু হতে।

দু-মাস। দেয়ালে টাঙানো ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকালেন সুহৃদ, দু-মাসের মধ্যে কি পেরে উঠবো।

বাবার কথাগুলোর মধ্যে যে নিগূঢ় ইঙ্গিত ছিল, শিখা সেটা শুরুতেই ধরতে পেরেছিল। কিন্তু ধরতে পেরেছে এটা যদি বাবার কাছে ধরা পড়ে যায়, লজ্জার আর সীমা থাকবে না। তাই ইচ্ছা করেই বোকা সাজতে হলো। বলল, বাঃ, তাহলে কী করে হবে? সেশন পেরিয়ে গেলে আবার একবছর!

না, না, অত দেরি হবে না। তার আগেই ব্যবস্থা করে ফেলবো।

গলায় রীতিমতো গাম্ভীর্য আনবার চেষ্টা করলেন সুহৃদ, কিন্তু মুখের হাসিটি লেগে রইল।

এরপরেও না-বোঝার ভান করা শিখার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠছিল। এমন সময়ে মা এসে তাকে তখনকার মতো বাঁচিয়ে দিলেন। ঘরে ঢুকেই মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোর কী চাই?

বাঃ, আমার বুঝি কিছু বলবার নেই। আমি পড়বো না? সেই কবে থেকে বাড়ি বসে আছি।

তুই আবার কী পড়বি? এম এ.?

এম. এ. পড়ে কী হবে?

ও, তোমার সেই চার্টার, না ফার্টার! কী যে সব মাথায় ঢোকে! তুমি ওকে বেশ করে বুঝিয়ে দাও দিকিন, সে-সব জিনিস মেয়েদের জন্যে নয়।

কে বললে মেয়েদের জন্যে নয়? কত মেয়ে পড়ছে আজকাল।

বেশতো, মেয়েকে আশ্বাস দিলেন সুহৃদ, চার্টার কথাটার অর্থ হল সনদ। তোমার জন্যে পাকা সনদের ব্যবস্থা হচ্ছে। তার মধ্যে কিছু অ্যাকাউন্ট্যান্সিও থাকবে বৈকি! তোমার মাকে দেখছো না। কী রকম পাকা অ্যাকাউন্ট্যাণ্ট্। তা না হলে তোমাদের সংসার কবে অচল হয়ে যেত।

এ কথাগুলো এত স্পষ্ট যে উত্তরে কিছু বলতে গেলেই অজ্ঞতার মুখোশ খুলে পড়ে যাবে। মালতী বোধহয় সেটা বুঝতে পারলেন। বললেন, আচ্ছা, তুই এখন সরে পড়। আমার কয়েকটা দরকারী কথা আছে।

কী করে যেন শিখার মনে হল, 'দরকারী' কথাটা বোধহয় তারই সম্পর্কে, এবং এমন একটা বিষয়ে, যার দুর্বার প্রলোভন ত্যাগ করে চলে যাওয়া বড় কঠিন। অথচ, প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে কান পাতাও অসম্ভব। তাই চটি জোড়ায় একটা অস্বাভাবিক শব্দ তুলে একেবারে ওদিকটায় তার নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকতে হলো, এবং সঙ্গে সঙ্গে সে-দুটো ফেলে রেখে সকলের অলক্ষ্যে সন্তর্পণে এসে দাঁড়াতে হলো বাবা-মা যে ঘরে বসে কথা বলছেন, তার ঠিক পাশের কামরায়। সেটির মালিক সুনীত, আপাতত অনুপস্থিত। দুটি ঘরের মাঝখানে একটি দরজা আছে, দুদিক থেকে বন্ধ। কপাটের ফাঁকে একটি কান রাখলেই যথেষ্ট। দুজনের সব কথা সোজা এসে ঢুকে যাবে।

চটি খুলে ফিরে আসা পর্যন্ত যে কটি কথা হয়ে গেছে তা অবশ্য শোনা গেল না। তাতে যে বিশেষ লোকসান হয়নি, পরের কথাতেই বোঝা গেল। বাবা বলছেন, খুকুর ওকে পছন্দ হয়েছে তো ?

কেন, অপছন্দের কী আছে? ঐ রকম হীরের টুকরো ছেলে! মায়ের কথায় বেশ খানিকটা ঝাঁঝ।

বাবা বললেন, তা হলেও জেনে নেওয়া ভালো। মেয়ে বড় হয়েছে, লেখা পড়া শিখেছে, তার একটা নিজস্ব মতামত আছে।

তা আছে বই কি! তবে সব জিনিস কি আর মুখ ফুটে বলে মেয়েরা? হাব-ভাব থেকে ধরে নিতে হয়। সে-সব ঠিক আছে।

ব্যস্, তাহলেই হল। ও কবে নাগাদ আসবে বলে গেছে।

তা কিছু বলেনি। বোনের হঠাৎ বিধবা হওয়ার খবর পেয়ে পাকিস্তানে গেছে তাকে নিয়ে আসতে। খুড়তোতো বোন। কাকা লিখেছেন, তুমি ছাড়া আর কে যাবে? ওখানকার একটা ব্যবস্থা করে বোনকে কাকার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসবে।···কী আশ্চর্য ছেলে! এই কাকাই ওদের সব কেড়ে-কুড়ে নিয়ে ওকে আর ওর মাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

একটা মস্ত বড় প্রাণ আছে ছেলেটির মধ্যে। এদিকে কাজকর্মেও পুরো প্র্যাকটিক্যাল। আমার দু-একটা ব্যাপারে দেখেছি তো। সবদিকে হুঁশিয়ার, ভালো এঞ্জিনিয়ার হতে হলে যে গুণটি সকলের আগে দরকার।

এক কাজ কর না কেন? বিয়ের পর ওখানকার চাকরি ছাড়িয়ে এনে তোমার এখানে লাগিয়ে দাও। তুমি তাহলে একটু জিরিয়ে নিতে পারবে।

তা হয় না। জামাই জামাই! তার সঙ্গে বিজ্‌নেস্‌-সম্পর্ক করতে গেলে অনেক রকম জটিলতা এসে পড়ে। তাতে দু' তরফেই অশান্তি দেখা দিতে পারে।

মিনিট দুয়েক দুজনেই চুপ করে রইলেন। তারপর আবার বাবার কথাই শুনতে পেল শিখা—আমার কী মনে হয় জানো? বিয়ে দেবার পর মেয়েকে কাছে টেনে রাখতে যাওয়া মানে তাকে ক্রমশ দূরে ঠেলে দেওয়া। তার চেয়ে দূরে যেতে দিলেই বরং তাকে কাছে পাওয়া যায়। সিঁথিতে সিন্দুর উঠলেই সে আর মেয়ে নয়, স্ত্রী, বধু। তখন সেই ভাবেই তাকে দেখতে হবে। আর দেখতে হবে, তার এই পরিণতির পথটা যেন সুগম হয়, অন্তত আমরা যেন সেখানে কোনো বাধা সৃষ্টি না করি।

বাবার কথাগুলো তন্ময় হয়ে শুনছিল শিখা। বোধহয় মাও তাই। অনেকক্ষণ তাঁর গলা পায়নি। ও নিজেও একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ আবার যখন কান দিল ও দিকটায়, মনে

হয় ওঁরা অন্য কোনো প্রসঙ্গে চলে গেছেন। আর সে দাঁড়াল না। এবার একবার নিজের মুখোমুখি গিয়ে বসতে হবে। নিজের মধ্যেই অনেক কথা জমে উঠেছে।

খাবার ঘরের ঠিক লাগোয়া তার ঘরখানা খুব ছোট। নড়তে-চড়তে বাধে। তার জন্যে মাঝে মাঝে বড় অসুবিধা বোধ করে। এই মুহূর্তে মনে হল, এই ছোট ঘরের যেন একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। মন যখন ভরে থাকে, তখন চারদিকের বিস্তৃতি ভালো লাগে না। তখনকার জন্যে প্রয়োজন এই রকম একটি ছোট্ট আবেষ্টন, যার মধ্যে বসে নিজের ভিতরটাকে ইচ্ছামতো ছড়িয়ে দেওয়া যায়।

জানালার নিচে যে উঁচু জায়গাটুকু সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো, তারই উপর গিয়ে হাঁটু তুলে বসল শিখা। ডান হাতে একটা শিক ধরে চোখ দুটি পাঠিয়ে দিল বাইরে, খোলা আকাশের কোলে। চলে গেল দূর থেকে দূরান্তরে।

বাবার কথাগুলোকে আশ্রয় করে অবাধ কল্পনা দিয়ে গড়ে তুলল একটি সুখ-নীড়, বাংলা দেশের বাইরে কোনো পাহাড়ের কোলে, যার বুক চিরে বয়ে গেছে একটি আঁকাবাঁকা জলধারা, শীতের দিনে শীর্ণ মন্থর, বর্ষায় স্ফীত চঞ্চল, উচ্ছ্বসিত। তখন তার নাম নদী। সেই নদীর ওপারে কিছুটা দূরেই শহর। নতুন গড়ে উঠেছে, স্বাধীনতার পর। নতুন নতুন কল-কারখানা মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। তারই একটাতে কাজ করছে নিলয়—সুদক্ষ, কর্মঠ এঞ্জিনিয়ার, নব ভারতের দ্রুত শিল্পায়নে নিয়োজিত সার্থক স্থপতি।

সে নিজেও একটা কিছু করবে। শ্রমিক বসতির মেয়েদের সেলাই শেখাবে। ছেলেমেয়েদের জন্যে স্কুল চালাবে। যা-ই করুক, বিকেল বেলা তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। গা ধুয়ে, চুল বেঁধে বাগানে গেটের ধারে গিয়ে দাঁড়াবে নিলয়ের ফেরার অপেক্ষায়। তার হাত থেকে টুপিটা নিয়ে নেবে, হাত-মুখ ধোবার জন্যে তাড়া দেবে, চায়ের

টেবিলে নিজের হাতের তৈরী দু-একটি মুখরোচক খাবার দিয়ে তাকে চমকে দেবে, মা যেমন দেয় বাবাকে।

তারপর দুজনে মিলে বেড়াতে যাবে পাহাড়ী পথের চড়াই উৎরাই পেরিয়ে অনেক দূরে।

এগার

ডক্টর ধর অস্ত্রকে এড়াতে পারলেন না। মাস কয়েকের মধ্যেই চলে যেতে হলো। প্রথমে ঠিক ছিল, ওখানে গিয়ে বসে কিছুটা গোছগাছ করে নিয়ে, তারপর সুনীতকে যেতে লিখবেন। ওর রিসার্চ এবং স্টাইপেণ্ডের ব্যবস্থা অবশ্য কোলকাতা থেকে চিঠিপত্রেই করে নিয়েছিলেন। অধ্যাপকের রওনা হবার কয়েক দিন আগে সুনীতই অগ্রণী হয়ে বন্দোবস্তটা পালটে দিল। মাকে বোঝাল যাওয়া যখন স্থির, মিছিমিছি দেরি করে কী লাভ। এক সঙ্গে গেলে আমারও খানিকটা কাজ এগিয়ে যাবে, ওঁরও অনেক সুবিধা। একা মানুষ, বয়স হয়েছে, এখানে যে লোকটা দেখাশুনো করত সেও যেতে পারছে না। উনি একেবারে আতান্তরে পড়ে যাবেন। একেই তো যখন পড়াশুনো নিয়ে থাকেন, সময়ের জ্ঞান থাকে না, খাওয়া হয়েছে কিনা, তাও ভুলে যান।

ছেলের মুখে তার এই পরম প্রিয় অধ্যাপকটির কথা অনেক শুনেছেন মালতী। ভদ্রলোককে কখনো দেখেননি, শুধু শুনে শুনেই মনের মধ্যে তাঁর জন্যে একটি গভীর শ্রদ্ধার আসন রচিত হয়ে গিয়েছিল। তার সঙ্গে অনেকখানি মমত্ববোধ। কত বড় পণ্ডিত, দেশ-বিদেশে কত নাম, কত যশ, অথচ সে সম্বন্ধে এতটুকু অভিমান নেই। শিশুর মতো সরল। প্রচুর রোজগার করেন, সব দান-ধ্যানে চলে যায়। বিয়ে-থা করেননি, নিরামিষ খান, পোশাক-আশাক অতি সাধারণ। পুরোপুরি সন্ন্যাসীর জীবন। সুহৃদও বলেছিলেন, দেখলে সত্যিই ভক্তি হয়।

মালতী সুনীতের প্রস্তাবে মনে মনে সায় না দিয়ে পারলেন না, যদিও মুখে বললেন, তোমাকে কে দেখে তার ঠিক নেই, তুমি আবার তাঁকে দেখবে!

তুমি পাত্তা না দিলে কী হবে, স্যর আমার ম্যানেজমেণ্টের খুব তারিফ করেন।

তুমি ওঁর ম্যানেজার বুঝি?

শুধু ম্যানেজার? মাঝে মাঝে চাকরের রোলেও নামতে হয়।

চাকরের রোল! এবার রীতিমতো বিস্মিত হলেন মালতী।

শিখা কোথায় কী একটা করছিল, গল্পের গন্ধে বসল এসে মায়ের পাশে, এবং সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করল, ঠিক রোলই পেয়েছ।

শোন্‌না কী মজার ব্যাপার! বই ছাড়া স্যরের আর একটা নেশা আছে—কফি। লাইব্রেরিতে বসে পড়ছেন, হঠাৎ হাঁক দিলেন, বাঞ্ছা! বাঞ্ছারাম হয়তো তখন হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন। আমি পাশের ঘরে কাজ করছি। গলাটা যদ্দুর পারি বাঞ্ছার মতো করে সাড়া দিলাম, যাই বাবু! হুকুম হলো, এক কাপ কফি নিয়ে আয়।

কিচেনে গিয়ে কফি তৈরি করলাম।

তুই জানিস নাকি কফি করতে?

প্রাণের দায়ে জানতে হয়েছে। নেশা তো। না পেলে ওঁর পড়াশুনো তো লাটে উঠবেই, আমারও সব কাজ পণ্ড।

আচ্ছা, কফি তো করলে, তারপর?—শিখার আর দেরি সইছে না।

তারপর খালি পায়ে, আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে পেছন থেকে হাত বাড়িয়ে, খোলা বইয়ের ঠিক পাশটিতে কাপটা বসিয়ে দিয়েই পিট্টান।

শিখা হেসে গড়িয়ে গেল। মালতী বললেন, যদি দেখে ফেলতেন, কে ?

কী করে দেখবেন ? চোখ দুটো তো বইয়ের পাতায়।

সুনীতেরবাক্স-পেটরা সাজানো-গোছানো, বাঁধা-ছাঁদা বেশীর ভাগ শিখাই করে দিল। তাকে তো বাইরে বাইরেই ঘুরতে হচ্ছে। ওদিকে মা রান্না ভাঁড়ার সংসার নিয়ে ব্যস্ত।

একা-একা ট্রাঙ্কে, সুটকেসে এটা সেটা ভরতে ভরতে শিখার মনের মধ্যে একটি গোপন আনন্দের মধুর সুর বাজতে থাকে। এমনি করে তাকেও সব সাজিয়ে-গুছিয়ে নিতে হবে। সেদিনটিও এলো বলে। মনটা এক ফাঁকে চলে যায় নিলয়ের কাছে। ভারী রাগ হয় তার উপর। কেন এত দেরি করছে আসতে ? ঐ এক রকমের মানুষ, ছেলেবেলা থেকে শুধু পরের বোঝা বয়ে বয়েই এত বড় হলো। কার কোথায় কী 'সমস্যা দেখা দিয়েছে, কে কোন্ বিপদে পড়েছে, অমনি ছোট সেখানে। কত বাজে লোক, পাজী লোক যে ঘাড়ে চেপে আছে, তার সীমা নেই। আচ্ছা, সেও দেখে নেবে কতদিন থাকে, কতদিন এমন খাটিয়ে নেবার সুবিধে পায়।

সুনীত যেদিন রওনা হবে, তার আগের দিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর মালতী তার ঘরের সামনে এসে ডাকলেন, সুনু ঘুমোলি ?

সঙ্গে সঙ্গে সাড়া এলো, না, এখনি ঘুমবো কি ?

শুয়ে ছিল, উঠে এসে আলো জ্বেলে দরজাটা খুলে দিয়ে বলল, এসো মা। তোমার কাজকর্ম মিটল ?

কোনো রকমে মিটিয়ে এলাম। তুই বোস, তোর সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

সুনীতের বুকটা হঠাৎ নড়ে উঠল। মার সঙ্গে তার কত কথা হয়, কিন্তু ঠিক এই সুর তো কখনো শোনেনি। তার গলাতেও গাম্ভীর্যের স্পর্শ লাগল।

কী কথা মা ?

অঞ্জলিকে তো তুই দেখেছিস।

কে অঞ্জলি ?

ঐযে বিশ্বনাথবাবুর মেয়ে।

ও. তা দেখেছি বৈকি! প্রায়ই তো দেখা হয়, তবে কথাবার্তা বড় একটা হয় না। যেন কি রকম ভয় পায়, না লজ্জা পায় ঠিক বুঝি না।

না-না, ভয় পাবে কেন ? মেয়েটা বড় লাজুক, আর ভারী নরম। দেখতেই বা মন্দ কী ? গেরস্ত ঘরে যেমন হয়ে থাকে। স্বভাবটি একেবারে মাটির মতো।

অর্থাৎ তোমার ঐ রূপসী কন্যার মতো খরখরে নয়।

রূপসী কন্যা একবার শুনলে হয়! সে যাক, তোর কেমন লাগে ?

মন্দ লাগবার তো কোনো কারণ নেই।

মালতী একটু খানি ভেবে নিয়ে বললেন, ছাখ, ওঁদের একান্ত ইচ্ছা, মেয়েটি আমাদের ঘরে আসে। সেই আশায় ওর বাপ ওকে আবার পড়াচ্ছেন। ওরও খুব উৎসাহ পড়াশুনোয়। মাঝখানে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় একেবারে মুষড়ে পড়েছিল। এবার আই. এ. পরীক্ষা দিয়েছে, পাসও করে যাবে। কাজকম্মে ওর তুলনা নেই। মেয়েটাকে আমার বড় ভালো লেগেছে, সুনু। তুই যদি বলিস, ওদের কথা দিই। তোর বাবারও পছন্দ হয়েছে। শুধু তুই মত করলেই হয়।

সুনীত খুব গম্ভীর হয়ে গেল, সাধারণত যা সে হয় না। মায়ের কথা শেষ হবার পরেও কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, মা। কিছু মনে করবে না তো ?

না-না, মনে করবো কেন ?

পুব অঞ্চলে. মানে ঢাকা-ফরিদপুর ঐসব জায়গায় চাষীদের মধ্যে একটা প্রবাদ আছে, আগের হাল যেদিক যায়, পিছের হালও সেদিক যায়। তুমি কি সেই ভয় করছ ?

এই তোকে ছুঁয়ে বলছি, সুনু, সে কথা ভেবে আমি বলিনি। তোকে দিয়ে আমার কোনো ভয় নেই। তুই যা-ই করিস, আমাদের কখনো আঘাত দিবি না, এ বিশ্বাস আমার আছে। আমি কী ভাবছিলাম জানিস? তুই কতদূর চলে যাচ্ছিস, কবে আসবি, কোথায় থাকবি কিছুই ঠিক নেই। খুকুটার বিয়ে হয়ে যাবে, ইনি সারাদিন কাজ নিয়ে ব্যস্ত, আমি কী নিয়ে থাকবো? ঘরগুলো সব খাঁ-খাঁ করবে, ভাবতেই আমার ভয় করছে। তাছাড়া—

একটুখানি বিরাম। তারপর আবার বললেন, মায়ের মন তো, কত কথা ভাবে। সেই কবে থেকে আশা করে আছি, দুটি বৌ আসবে আমার। একটিকে দিয়ে তো সব সাধ মিটল। আরেকটি আবার কেমন হবে···

মালতীর মৃদু স্বর ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। সুনীত বলল, তুমি যে আমাকে ভাষণ বিপদে ফেললে মা। বিয়ের কথা আমি একেবারেই ভাবিনি। এখন থেকে বেশ কয়েক বছর ভাববার অবসরও হবে না।

বেশ তো। আজই তোকে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হবে, এমন কথা বলেছি নাকি? আর এখ্‌খনি যদি মত দিতে না পারিস, তাতেও ক্ষতি নেই। কাল রাত ন'টায় তোর গাড়ি। সারাদিনে যখন ইচ্ছা, মেয়েটিকে একবার গ্যাখ, কথাবার্তা বল। যদি পছন্দ হয়, ওরা অপেক্ষা করবে।

সুনীত এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। মনে হল, মা তার কাছে বড় বেশী প্রত্যাশা করছেন। বিয়েটা কি এমন জিনিস যে একদিনের মধ্যেই তার সম্বন্ধে মনস্থির করা যায়? বিশেষ করে, এখনো তার চিন্তার পাল্লায় ঐ দুটি শব্দ কোথাও ধরা দেয়নি। অনাগত জীবনের যতখানি ওটি স্থান পায়নি। কিন্তু এসব কথা মাকে বোঝানো যাবে না। তাঁর চিন্তাধারা সম্পূর্ণ আলাদা পথ বেয়ে চলেছে। অনেকটা নিজের এবং নিজের গড়া তাঁর এই সংসারের

কথাই ভাবছেন তিনি। যে আঘাত তিনি পেয়েছেন, সেদিক দিয়ে দেখলে এ জন্যে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। তাই মাকে সরাসরি নিরাশ না করে বলল, আচ্ছা, তুমি এখন শুয়ে পড়গে। আমাকে একটু ভাবতে দাও।

মালতী তাঁর শিক্ষিত দায়িত্বশীল ছেলের কাছ থেকে এই মুহূর্তে এর চেয়ে বেশী কোনো আশ্বাস আশা করতে পারেননি। এইটুকুতেই মনে মনে খুশি হয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

পরদিনের প্রায় সবটাই সুনীত কাজের অজুহাতে বাইরে বাইরে কাটাল। বাড়িতে যতক্ষণ রইল, এমন একটা ব্যস্ততার ভাব দেখাল, যে মালতী মেয়েটিকে একবার ডেকে পাঠাবার সুযোগ করতে পারলেন না। মায়ের সঙ্গে এই ছলনা সুনীতের মনকে পীড়া দিচ্ছিল। কিন্তু তা ছাড়া আর উপায় কী? যাবার সময় তাঁকে একটা আঘাত দিয়ে না যেতে হয়, এই একটিমাত্র কথাই সে ভাবছিল।

আর একজনের কথা সে একবারও ভাবেনি। এই বাড়িরই নিচের তলায় কোনো এক নিরালা ঘরের কোণে একটি নীরব মেয়ে সমস্ত দিন ধরে দুরু দুরু বক্ষে অপেক্ষা করছিল, কখন তার ডাক পড়বে, কখন গিয়ে দাঁড়াতে হবে তার জীবনের চরম পরীক্ষার মুখোমুখি। এই তুচ্ছ খবরটুকু উপরে গিয়ে পৌঁছায়নি। সে জানত, সে অতি সাধারণ ঘরের সাধারণ মেয়ে। তার বাবা মা তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছেন সবটাই আকাশকুসুম। যে মানুষটির একান্ত পাশটিতে নিয়ে তাকে দাঁড় করাতে চাইছেন, তার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াবার যোগ্যতাও তার নেই। কিন্তু মানুষের মন, বিশেষ করে কুমারী-মন কি কোনোদিন যুক্তির পথ ধরে চলে? বাবা-মার যে দুরন্ত আশা, মেয়ের মনেও কখন তার ছোঁয়াচ লেগেছিল। হয়তো তারই টানে রাত আটটার সময় সে

সকলের অগোচরে রাস্তার ধারের একটি অন্ধকার নির্জন ঘরের রু
জানালায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। জিনিসপত্র তোলা হচ্ছে
অই নিয়ে ছুটোছুটি। এ বাড়ির উপরে নিচে কারো আসতে বাং
নেই, বাইরে থেকেও কেউ কেউ এসে পৌঁছেছেন। শুধু একজ
সেখানে অনুপস্থিত।

যার গৌরবময় প্রবাস-যাত্রা উপলক্ষ করে আজকের এই চঞ্চলত
সে যখন একে একে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠল
সেই একজন যে খড়খড়ির ভিতর দিয়ে ভীরু অপলক চোখে তা
মুখের দিকে তাকিয়েছিল, সে কথা সে জানতে পারল না, হয়তে
কোনোদিনই পারবে না।

নাঃ

নিলয়ের ফিরতে বেশ দেরি হলো। এই বোনটিকে সে কেবল
কাকার মেয়ে হিসেবে কোনোদিন দেখেনি। ওরা প্রায় সমবয়সী।
যখন ছোট ছিল, একসঙ্গে খেলা-ধুলো করেছে। ওকে আর ওর
মাকে যেদিন সব কিছু ছেড়ে চলে যেতে হলো, সেদিন তার বি
কান্না।—'আমি নিলুদার সঙ্গে যাবো।' নিলয় সেটা ভুলতে পারেনি।
বড় হয়েও মাঝে মাঝে যোগাযোগ রেখেছে। ও পক্ষ থেকেই বরং
সেটা ক্রমশ শিথিল হয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ তার এতবড় বিপদের খবর পেয়ে শুধু কাকার কথায় ছুটে
যায়নি, নিজের ভিতর থেকেও একটা তাগিদ অনুভব করেছিল। গিয়ে
যা বুঝল, ওদের আর ওখানে ফেলে আসা চলে না। গুটি তিনেক
ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে একটি তরুণী বিধবা যে কোনো সময়ে

বিপন্ন হয়ে পড়বে। তাই সামান্য যা কিছু আনা গেল, তাই সমেত ওদের বর্ধমানে কাকার বাসায় এনে তুলল।

ছুটি ফুরোতে তখন মাত্র দিন দুয়েক দেরি আছে। ওখান থেকেই চলে গেল চাকরি-স্থলে।

পরের সপ্তাহে যখন নিউ সাউথ পার্কের বাসায় এসে উঠল, সিঁড়ির মুখেই শিখার সঙ্গে দেখা। এতদিন পরে 'হঠাৎ উদয়' হওয়ার জন্যে তখনি দু-একটি অম্ল-মধুর মন্তব্য আশা করেছিল, সে তার নিয়ম। কিন্তু এ কী হলো! চকিতে একবার নিলয়ের দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

তখন বুঝতে পারেনি নিলয়। পরে বুঝেছিল। নিজেকে দিয়েই বুঝেছিল। সেই দিনই মালতী যখন ওকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে তাঁদের মনের একান্ত ইচ্ছাটুকু জানিয়ে দিলেন, তখন সেও একটি কথা বলতে পারেনি, শুধু উঠে এসে নত হয়ে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে ছিল। সেখান থেকে বেরিয়ে বাইরের ঘরের দিকে যাবার পথেই শিখার ঘর। পরদাটা পুরোপুরি টানা ছিল না। তার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল রক্ত রং-এর এক টুকরো শাড়ির পাড়। তার নিচে দুখানি শুভ্র কোমল পায়ের পাতা, টেবিলের উপর আলগোছে ফেলে-রাখা একখানি নিটোল হাত। আড় চোখে এক পলক তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে আনছিল। অথচ দুজনে দুজনের কত দিনের চেনা, কত সহজ ভাবে মিশেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সকলে মিলে আসর জমিয়েছে, দল বেঁধে বেড়াতে গেছে কত জায়গায়। নির্জনে দেখাশুনোও কম হয়নি। নিঃসঙ্কোচে কত গল্প করেছে পাশাপাশি বসে।

কিন্তু আজকের ঐ মুহূর্তটি আলাদা। যার জন্যে এতদিনের প্রতীক্ষা, যাকে ঘিরে কতদিনের কত আশা ও সংশয়ের ওঠাপড়া, সেই ক্ষণটি যখন এসে দাঁড়ায়, উভয়ের মাঝখান থেকে

পাতলা মেঘখানা সবে যায়, তখনই কোথা থেকে যে একরাশ সঙ্কো চে কুয়াশা এসে দুটি মনকে আচ্ছন্ন কবে ফেলে, কেউ বলতে পাবে না। সেই ক্ষণিকেব আচ্ছাদনটুকু বড় মধুব।

নিলয় ইদানীং যখনই আসত সুনীতেব ঘবে থাকত, যদিও সুবীবে ঘবখানা খালি পড়ে আছে, এবং সেখানেই তাব সব ব্যবস্থা কবে দিয়েছিলেন মালতী। সুনীতই পাবে নিজেব ঘবে টেনে এনেছিল দুদিকে দুটি তক্তপোষ। অনেক বাত ধবে চলত ওদেব কথা পালা। কখনো কখনো বাত ভোব হয়ে যেত, দুজনেব কেউ জানতে পাবত না।

আজ সুনীত নেই। নিলয় একা। বর্ষাকাল। বাইবে বৃষ্টি পড়ছে। এমনি বাতে, মন যখন কানা। কানায় পূর্ণ, তখনো তা গভীব স্তবে কিসেব যেন একটা বেদনা-বোধ জেগে ওঠে। হয়তো ঐ অশ্রান্ত বর্ষণেব সঙ্গে তাব যোগ আছে। নিলযেব চোখে ঘুম ছিল না। বাইবেব বিশ্বেব তাব [illegible] যে একতাবা বাজছে সুবে মিলে তাব ভিতবেব যে সুপ্ত শিল্পী তাবও ঘুম ভাঙিয়ে দিল।

মাথাব কাছে দেওয়াল আলমাবিব নিচে [illegible] তাব বেহালা [illegible] পড়েছিল। সুনীত ও শিখাব [illegible] [illegible] ছিল [illegible] বাসা থেকে। দু-একবাব বাজিয়ে [illegible] হয়েছে। কোনো শ্রোতা নেই। তবু হাত বাড়িয়ে টেনে নিল স্বটা। [illegible] দীর্ঘ ছড়েব টান। সাবা ঘরের বদ্ধ বাতাস [illegible] মত [illegible] করে উঠল।

একখানা ঘব এবং একটি বাবান্দাব ব্যবধানে আর একটি ছোট ঘরের স্তব্ধ অন্ধকাবে আবেক জনেব চোখেও অনেকক্ষণ ঘুম আসছিল না। একটি সূক্ষ্ম তন্দ্রা-জাল সবে তার নিমীলিত চোখ দুটিকে ঢেকে দেবার আয়োজন করছে, এমন সময় কোথা থেকে ভেসে-আসা একটা স্ববের মৃদু আঘাত সহসা তাকে ছিন্ন কবে দিল

বিছানার উপর উঠে বসল শিখা। স্বপ্ন নয়তো? কান পেতে রইল। বৃষ্টির শব্দকে ছাপিয়ে একটা উচ্চতান ছুটে এলো জানালা পথে। তার পরের যে মৃদু সূক্ষ্ম কোমল মূর্ছনা সেটুকু আর শোনা গেল না। নিঃশব্দে জানালা খুলে বেরিয়ে এলো বারান্দায়। সামান্য পথটুকু সন্তর্পণে পার হয়ে সুনীতের ঘরের খোলা জানালার কপাটের আড়ালে এসে দাঁড়াল। ভিতরে বসে যে শিল্পী বর্ষা-মুখর রাত্রির অন্ধকারে তন্ময় হয়ে সুরের আগুন ছড়িয়ে চলেছে, তাকে দেখা গেল না, অনুভব করা গেল শুধু তার মাথার দোলা, আঙুলের খেলা আর হাতের টান কখনো লঘু কখনো দ্রুত।

শিখা যেখানে দাঁড়িয়েছিল, তার দুহাত দূরেই দরজা। ফাঁক থেকে বোঝা গেল বন্ধ নয় ভেজানো। ডাকবার প্রয়োজন ছিল না। শুধু নিঃশব্দে হাত বাড়িয়ে একখানি কপাট খুলে, লঘু পায়ে ধীরে ধীরে আরেকটু এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ানো। সে লোভ কি হয়নি? সে যে কত দুর্দম, সে কথা জানেন তার অন্তর্যামী। আর কেউ জানল না। এই সামান্য অন্তরালটুকু অক্ষুণ্ণ রইল। নিঃশব্দ-চারিণীর এই গোপন অভিসার গোপনেই রয়ে গেল।

তের

সেবার বড় বেশী বর্ষা নেমেছিল কোলকাতায়। শুভকাজের আর দেরি নেই। শ্রাবণের শেষের দিকে দিন ফেলেছিলেন মালতী। মনে করেছিলেন, ততদিনে বৃষ্টির জোর কমে যাবে। কিন্তু লক্ষণ দেখা গেল অন্যরকম। অথচ বলতে গেলে, এইটাই তাঁর প্রথম কাজ, এ বাড়ির প্রথম উৎসব। এবার তো আর সবাইকে না ডেকে চলবে না। কেনই বা ডাকবেন না? তাঁদের এই একটি মাত্র মেয়ে।

সেদিন বা তার আগের দিনগুলোতে যদি এমন দুর্যোগ দেখা দেয় কেমন করে সামলাবেন ?

এদিকে সুহৃদের একদণ্ড অবসর নেই। কারখানায় ডবল-শিফটে কাজ চলছে। কতকগুলো জরুরী অর্ডার রয়েছে, ঠিক সময়ে ডেলিভারী দিতে না পারলে সমূহ লোকসান। তার চেয়েও বড় কথা, বাজারে দুর্নাম হবে। তিনি সেই সকাল আটটায় বেরিয়ে যান, ফিরতে রাত ন'টা বেজে যায়। শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না। তার উপরে ওদিকের অত খাটনি এবং এদিকের উদ্বেগ।

বড় ছেলে তো থেকেও নেই। ছোট ছেলের থিসিস প্রায় তৈরী। এসময়ে একটি দিন নষ্ট করা চলে না। বিয়ের দু-একদিন আগে ছাড়া আসতে পারবে না, আগেই জানিয়ে দিয়েছে। নিলয়কে তো আর এ ব্যাপারে ডাকা যায় না। তাছাড়া, সবে কিছুদিন হল লম্বা ছুটি থেকে ফিরেছে। একমাত্র রবিবার ছাড়া বেরোবার উপায় নেই। সেই যে এসেছিল পাকিস্তান থেকে ফিরে, তারপর আর আসেনি।

শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি। সকাল থেকে মাঝে মাঝে দু এক পশলা বৃষ্টি হচ্ছিল, বিকালের দিকে ক্রমশ বাড়তে লাগল। আকাশ জোড়া মেঘ। সঙ্গে হাওয়া আছে। মালতী ভাবছিলেন, স্বামীর ফিরতে এখনো ঘণ্টা তিনেক। এদিকটায় জল জমে না, কিন্তু ওদিকের রাস্তাগুলো যদি ডুবে যায়, কেমন করে আসবেন ?

হঠাৎ বাড়ির সামনে ভারী গাড়ি থামার শব্দ, সেই সঙ্গে লোকজনের আওয়াজ শুনে রাস্তার ধারের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

একটা অ্যাম্বুল্যান্স এসে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বনাথবাবু বাড়ি থেকে ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন। একতলায় যে দোকান রয়েছে, তার থেকেও দু-তিনজন লোক ছুটে গিয়ে দাঁড়াল। অ্যাম্বুলান্স থেকে ... পড়েছিল, তাদের মধ্যে কারখানার ফোরম্যান নিশিবাবু

এবং আরো দু-একটি চেনা লোক দেখে মালতীর বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। পরমুহূর্তে যা দেখলেন, আর নড়বার শক্তি রইল না।

সবাই মিলে ধরাধরি করে যাকে ওরা নামিয়ে আনছিল, তাঁর পা দু-খানাই আগে দেখতে পেয়েছিলেন। জুতো মোজা নেই, খালি পা। তার পরেই বেল বেজে উঠল। কে গিয়ে দরজা খুলে দিয়েছিল, তিনি জানেন না। হঠাৎ দেখলেন, বিশ্বনাথবাবুর স্ত্রী এগিয়ে আসছেন। তারপরেই তাঁর মাথাটা ঘুরে উঠল। চারিদিকটা অন্ধকার হয়ে গেল।

যখন জ্ঞান হল, চারদিক চেয়ে বুঝলেন, তাকে শিখার বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশে দাঁড়িয়ে অঞ্জলি। ঝুঁকে পড়ে বলল এখন কেমন লাগছে মাসিমা ?

উনি কোথায় ? বলে তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন মালতী।

ও-ঘরে আছেন। আপনি আরেকটু শুয়ে থাকুন।

না. আমি যেতে পারবো।

দাঁড়াতেই পা দুটো টলে উঠল। অঞ্জলি এসে ধরে ফেলল এবং সেই ভাবেই ধীরে ধীরে নিয়ে গেল পাশের কামরায়।

সুহৃদ শুয়ে ছিলেন নিজের বিছানায়। চোখ দুটো বোজা। মুখখানা থমথম করছে, যেন রক্ত ফেটে পড়ছে। কোনো সাড়া নেই। একজন ডাক্তার—এই পাড়াতেই থাকেন বোধহয়, মাঝে মাঝে গাড়ি চালিয়ে যেতে দেখেছেন মালতী—পাশে বসে নাড়িতে হাত দিয়ে রয়েছেন। তার ঠিক পাশটিতেই দাঁড়িয়ে আছেন বিশ্বনাথবাবু। ডাক্তার তাঁর কানে কানে কী বলতেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন। ঘর ভর্তি লোক। বাবার পায়ের কাছে গালে হাত রেখে নিচের দিকে চেয়ে বসেছিল শিখা। মায়ের সাড়া পেয়ে ছুটে গিয়ে দু-হাতে তাঁকে জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ল।

মালতী কী যেন বলতে গেলেন, পারলেন না। মেয়ের মুখখানা শুধু বুকে চেপে ধরলেন। দুচোখ থেকে অবিরল ধারা নেমে এলো। মিসেস সরকার দুজনকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। মৃদু স্বরে বললেন, ভয় নেই. হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছেন। এখনি ভালো হয়ে যাবেন।

ফোরম্যানের কাছে জানা গেল, কিছুদিন থেকে শ্রমিকদের সঙ্গে 'ওভার টাইম' নিয়ে একটু গোলমাল চলছিল। ঐদিন সকালেই টের পাওয়া গেল তাদের মতলব ভালো নয়। 'বাবু' ভিতরটা একবার ঘুরে দেখে আফিসে এসে ওদের কজনকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। দু-একজন বেশ চড়া গলায় কথা বলছিল। ফোরম্যান খানিকটা দূরে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ দেখল, ওর চোখ-মুখ ভীষণ লাল হয়ে উঠেছে। টেবিলের উপর এক গেলাস জল ঢাকা দেওয়া ছিল। হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলেন, কিন্তু হাতটা এত কাঁপছিল যে শেষ পর্যন্ত পৌঁছল না। তারপরেই চেয়ার সুদ্ধ বাঁ দিকে কাত হয়ে পড়ে গেলেন। ওরা ছুটে গিয়ে টেনে তুলে দেখল, জ্ঞান নেই। ঘরের কোণে যে ইজিচেয়ারটাতে উনি বিশ্রাম নিতেন, তার উপর নিয়ে শুইয়ে দিল। কাছাকাছি কোনো ডাক্তার ছিল না। খানিকটা দূর থেকে একজনকে ডেকে আনা হলো। তিনি এসে একটা ইনজেকশন দিয়ে বললেন, অ্যাম্বুল্যান্স ডেকে বাড়ি নিয়ে যাও।

শুনে, এখানকার তরুণ ডাক্তার অজ্ঞাত সমব্যবসায়ীর উদ্দেশে যে বাণীটি নিক্ষেপ করলেন, সেটা শ্রাব্য নয়। তারপর বললেন, তখনই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। এখনো সেই চেষ্টা করতে বললেন।

মুষলধারে বৃষ্টি মাথায় করে বিশ্বনাথ গেলেন তাঁরই চেম্বার থেকে ফোন করতে। হাসপাতালের সঙ্গে অনেক কষ্টে যোগাযোগ করা গেল, কিন্তু অ্যাম্বলান্স বা ট্যাক্সি কিছুই পাওয়া গেল না।

কোলকাতার রাস্তায় জল থৈ-থৈ করছে। যানবাহন অচল। অগত্যা, ডাক্তার ওখানে যা কিছু সম্ভব সব করলেন, কিন্তু সারারাতের মধ্যেও জ্ঞান ফিরে এলো না।

পরদিন বেলা ছ'টা নাগাদ সুহৃদ চোখ খুলে তাকালেন। মালতী সেই রাত থেকে পাশে বসে। ঝুঁকে পড়লেন মুখের উপর। জানতে চাইলেন, জল খাবে ?

একটু যেন মাথা নাড়লেন মনে হলো। দু-তিন চামচে জল খেলেন আস্তে আস্তে। এদিক্-ওদিক চাইতে চেষ্টা করলেন, যেন কিছুই বুঝতে পারছেন না কিংবা কাউকে হয়তো খুঁজছেন। মালতী বললেন, তুমি বাড়িতে তোমার বিছানায় শুয়ে আছো। খোকা আর সুনুকে টেলিগ্রাম করে দিয়েছি।

আরো কী বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই রুগীর চোখের পাতা নেমে এলো।

সুহৃদের আবাল্য বন্ধু ডাক্তার বিভূতি সেন দিল্লি গিয়েছিলেন। ঐ দিনই ফিরবার কথা। পাড়ার ডাক্তারই বারবার এলেন এবং আরো দুজন প্রবীণ অভিজ্ঞ ডাক্তারকেও ডাকা হলো পরামর্শের জন্যে। মালতীকে তাঁরা ভরসা দিলেন, কিন্তু বিশ্বনাথকে গোপনে বলে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারলে কিছু হয়তো করা যেত. এখন অনেক জটিলতা দেখা দিয়েছে। ওষুধ, ইনজেকসনের ব্যবস্থা করে গেলেন।

ঘণ্টাখানেক পরে আবার চোখ দুটো খুলে গেল সুহৃদের। এদিক-ওদিক তাকালেন, জড়িয়ে-জড়িয়ে দু-একটা কথাও বললেন, তার কিছুই বোঝা গেল না। বাঁ-হাতে কোনো সাড়া ছিল না। ডান হাতের আঙুলগুলো উলটে যেন একটা হতাশার ভঙ্গী করলেন। আর কেউ না বুঝতে পারলেও মালতী বুঝলেন, কী বলতে চান স্বামী। জীবনে যা কিছু করতে চেয়েছিলেন সব মাঝপথে

অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে রইল। কোনোটারই সুরাহা করে যেতে পারলেন না।

মালতী আর থাকতে পারলেন না। তাঁর মনে সারাজীবন ধরে যত অভিমান সঞ্চিত হয়ে ছিল সব যেন এক সঙ্গে বেরিয়ে এলো— ওগো, এখনো তুমি ঐসব কথা ভাবছ। শুধু কাজ আর কাজ! কী লাভ হল। শুধু অকালে বেঘোরে—

কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল, আর কিছু বলতে পারলেন না।

কথাগুলো রোগীর কানে গেলেও দুর্বল মস্তিষ্কে পৌঁছল বলে মনে হল না। কিংবা হয়তো তিনি তখনো, যে চিন্তা তাকে পীড়া দিচ্ছিল, তারই মধ্যে নিমগ্ন হয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ পরে আবার যেন কাকে খুঁজতে লাগলেন। শিখা গিয়ে চোখের সামনে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে ডাকল, বাবা।

সাড়া দিলেন না, কিন্তু মেয়ের মুখের উপর চোখ দুটো কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইল।

শিখা বলল, বাবা, আমাকে কিছু বলবে?

সুহৃদের কপালের উপর কতগুলো দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। জড়িত কণ্ঠে যা বললেন, তার থেকে একটা কথা যেন ছিটকে এসে লাগল ওর কানে, আমার ফ্যাক্টরী।

মুহূর্ত মধ্যে কী যে হল শিখার মনে সে জানে না। সুদূরতম কল্পনায় ঘুণাক্ষরেও যা কোনোদিন ভাবেনি, তাই করে বসল। বিছানার পাশে বসে পড়ে বাবাকে একহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল। মুখ নামিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বলল, বাবা, তুমি ভেবো না। তোমার ফ্যাক্টরীর সব ভার আমি নিলাম।

সুহৃদ শুনতে পেয়েছেন, বোঝা গেল। তাঁর দুচোখ ভরা বিস্ময়। তেমনি অস্পষ্ট ভাবে থেমে থেমে বললেন, তুমি! তুমি কি পারবে, মা?

কেন পারবো না? তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর, বাবা বলে

মাথাটা নামিয়ে দিল বাবার বুকের উপর। তার উপরে কম্পিত হাতখানা রেখে সুহৃদ মৃদু কণ্ঠে কী যেন বললেন, শোনা গেল না। কিন্তু সেখানে যারা-যারা ছিল স্পষ্ট দেখতে পেল, তাঁর কপালের উপরকার সেই রেখাগুলো মিলিয়ে গেছে!

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সব শেষ।

শিখাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বিশ্বনাথ সরকার তার কাঁধের উপর একটা হাত রেখে বলেছিলেন, তুমিই প্রকৃত ছেলের কাজ করলে মা। ঐ আশ্বাসটুকুর জন্যেই বোধহয় প্রাণটা আটকে ছিল।

শিখার চোখে জল ছিল না। নত হয়ে তাদের একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী পিতৃতুল্য বৃদ্ধকে প্রণাম করল।

একে একে সকলেই এসে পৌঁছল। প্রথমে এলেন ডাক্তার সেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে বললেন, আমারই উচিত ছিল আরেকটু জোর করা। কিন্তু আমিও বুঝতে পারিনি এত শীগগির চলে যাবে।

তারপরে এলো নিলয়। সেই সব চেয়ে কাছে থাকে। ছেলেদের আসতে আরো দেরি হবে। তাই মালতীর অনুমতি নিয়ে শেষ সময়ের সব কাজ তাকেই করতে হলো। মুখাগ্নি করল মেয়ে।

সুবীর এলো সুনীতের কিছু পরে—একা। তা নিয়ে বাড়ির কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করল না। বিশ্বনাথ বললেন, বৌমাকে রেখে এলে কেন বাবা?

সুতপা ছিল প্রসূতি-সদনে। কোলে আটদিনের ছেলে। সুবীর সে কথা চেপে গেল! বলল, তার খুব অসুখ, হাসপাতালে আছে।

মৃত্যু-সংবাদ পাবার পর উইল নিয়ে এলেন অ্যাটর্নী। উইলের কথা কাউকে জানাননি সুহৃদ, মালতীকেও না। এবার সবাই জানলো। ফ্যাক্টরী দিয়ে গেছেন দুই ছেলেকে, আধাআধি ভাগ। নিজের যে দুটো জীবনবীমা ছিল, তা পাবেন স্ত্রী আর মেয়ে। মেয়ের

দরুন যেটা, তার মেয়াদ আগেই শেষ হয়েছে। টাকাটা আলাদা-ভাবে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে। একজিকিউটর করে গেছেন মালতীকে। তাঁর উপর নির্দেশ রয়েছে. ঐ টাকা বা তার যে কোনো অংশ শিখার বিয়েতে খরচ করতে পারবেন। যদি কিছু বাকী থাকে. সেটা তাকে দিয়ে দেওয়া হবে। সাবালিকা হবার পর সে যদি অবিবাহিতা থাকবার ইচ্ছা প্রকাশ করে, সব টাকাটাই তার প্রাপ্য।

শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটে যাবার পর সুবীর ভাইকে ডেকে বলল, আমার নিজের বিজনেস রয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য অনেক কারণে এখানে এসে ফ্যাক্টরী চালাবার ইচ্ছা আমার নেই। সে সময় বা সুযোগ কখনো হবে না। তাই বলছিলাম, তুই বরং আমার শেয়ারটা কিনে নে। তা না হলে ওটা অন্যত্র বিক্রী করতে হবে। তাতে তোরই অসুবিধা।

সুনীত আকাশ থেকে পড়ল, ও বাবা! আমার টাকা কোথায় যে তোমার শেয়ার কিনতে যাবো?

তাহলে অন্য খদ্দের দেখি। আমার বেশ কিছু টাকার দরকার হয়ে পড়েছে।

কথাটা শিখার কানে যেতেই সে বলল, দামের হিসেব কর, টাকা আমি দেবো।

বেশ। বলে, সুবীর ফ্যাক্টরীতে গিয়ে আকাউন্ট্যান্টকে নিয়ে ফ্যাক্টরীর দাম কষতে লেগে গেল।

সুনীত এসে ধরল বোনকে. তুই যে দাদার অংশ কিনে নিতে চাইছিস, টাকা কোথায় পাবি?

কেন, টাকা তো আমাকে বাবা-ই দিয়ে গেছেন।

হ্যাঁ কিন্তু ফ্যাক্টরীর পেছনে খরচ করবার জন্যে দেননি।

এই রকম একটা অবস্থা দেখা দেবে, তিনি কেমন করে জানবেন?

এখনো ভালো করে ভেবে ভাখ, খুকু। তোর বিয়েতে কিছু খরচ-পত্তর আছে। আমার রোজগার তো জানিস।

ছোড়দা, তুমি জানো না, এ দিকটা নিয়ে আমি তিনদিন থেকে ভাবছি। এ ছাড়া আর পথ নেই। তুমি বাধা দিও না লক্ষ্মীটি, আর মা যদি আপত্তি করে, আমার পেছনে একটু দাঁড়িও।

মা আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু মেয়ের মুখ দেখেই বুঝলেন, তাকে ঠেকানো যাবে না। সুনীতও তাঁকে বারণ করল। আর একটা কথা ভাবলেন মালতী এক বছর কালাশৌচ, তার মধ্যে বিয়ে হতে পারবে না। ততদিন যাকে না দিয়ে গেছেন উইলে, সেটা হাতে এসে যাবে। তার থেকেই বিয়ের খরচপত্র চালাবেন। ওটা ওর টাকা, ও যা করতে চায়, করুক।

সুবায় চলে গেল। এই আশ্বাস নিয়ে গেল, যে মাস ছয়েক পরে অর্থাৎ উইলের প্রোবেট ইত্যাদি নেবার পর টাকা হাতে এলে, আরেকবার এসে তার প্রাপ্য বুঝে নিয়ে দলিল করে দিয়ে যাবে।

সুনীতকেও ফিরে যেতে হবে। তার গবেষণা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। পরের পর্ব অনিশ্চিত। কোথায় কী জুটবে কেউ বলতে পারে না।

যাবার আগে ক'দিন তাকে খানিকটা ঘোরাঘুরি করতে হলো। মালতী বেশীর ভাগ সময় প্রায় নিজের ঘরেই শুয়ে থাকেন। আগের মতো ছেলেমেয়েরা কখন কোথায় যাচ্ছে, কী করছে, অতটা খোঁজ রাখেন না।

শিখা একদিন বলল, সারাদিন কোথায় থাকো, বল তো ?

একটু কাজ ছিল।

এখানে আবার তোমার কী কাজ ?

সেটা বোঝা গেল তার ফিরে যাবার আগের দিন। বোনের ঘরে গিয়ে একটা লম্বা খাম তার হাতে দিয়ে বলল, এটা রেখে দে।

কী এটা ?

পরে এক সময় পড়ে দেখিস।

মুখ-খোলা খাম। ভিতর থেকে বেরোল দু-শীট ভাঁজ করা পুরু

কাগজ। ভাঁজটা খুলে শিখা অবাক হয়ে গেল, ওমা! এ যে একটা দলিল বলে মনে হচ্ছে!

আর বলিস না। বিষয়-সম্পত্তি এমন জিনিস যে মুখের কথার কোনো দাম নেই, সব কিছু ঐ দলিলে ঢোকাতে হয়।

ব্যাপার কী ছোড়দা!

সুনীত বোনের কাঁধে হাত রাখল। অনেকটা যেন কৈফিয়তের সুরে বলল, আমার সব কথাই তো তুই জানিস। বাবাও জানতেন। তবু কেন যে আমার ঘাড়ে তাঁর ফ্যাক্টরীর বোঝা চাপিয়ে গেলেন। আমি ওর কী বুঝি, বল? অর্ধেকটা তো তোকে এমনিতেই বইতে হচ্ছে। বাকীটাও নে ভাই, আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

বুঝেছি। তোমার অংশটা আমাকে দান করছ গম্ভীরভাবে বলল শিখা।

মোটেই না, বরং তার উলটো। তুই যদি এটা নিয়ে নিস, আমি মনে করবো আমাকে একটা কঠিন ভার থেকে মুক্তি দিলি। আমার কথাটা বুঝে ছাখ খুকু।

যেন ভিক্ষা চাইছে এমনি ভাবে বোনের হাত দুটো দুহাতে জড়িয়ে ধরল সুনীত।

তুমিও যদি ছেড়ে দাও, আমি একা কী করে চালাবো? হতাশার সুরে বলল শিখা।

একা আর কদিন?—সুনীতের কণ্ঠে আবার হালকা সুর ফিরে এলো, চালাবার আসল ব্যক্তিটি এসে পড়লে আর ভাবনা থাকবে না। বলে, ওর কাঁধটা ধরে নেড়ে দিল।

এর পরে বোনের মুখে একটি সলজ্জ আনন্দের আভাস অন্তত আশা করেছিল সুনীত। না পেয়ে অবাক হল।

শিখা আগাগোড়া গম্ভীর হয়ে রইল।

চৌদ্দ

শ্রাদ্ধের সময় নিলয় এসেছিল। ভোর বেলা পৌঁছেই কাজে লেগেছিল এবং রাত বারোটা পর্যন্ত কোনোদিকে তাকাতে পারেনি। কারো সঙ্গে দুটো কথাবার্তাও হয়নি। রাত থাকতেই আবার হাওড়ায় ছুটেছিল গাড়ি ধরতে। একদিনের বেশী ছুটি পায়নি। তার পরেও কতগুলো রবিবার নানা কাজে আসবার সময় হয়নি। এবার একদিন সুযোগ করে এল।

মালতী এতদিনে নিজেকে অনেকটা শক্ত করে এনেছেন। এখনো তাঁর কত কাজ বাকী। তার মধ্যে প্রথম এবং প্রধান, শিখার বিয়ে। একটা বছর আর কদিন। দেখতে দেখতে কেটে যাবে। কিন্তু মেয়ের ভাবগতিক দেখে তিনি স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। এ কী মেয়ে! একেবারে ঠিক যেন বাপের ছায়া! মুখের আদল তো বটেই,—সেটা যে দেখে সেই বলে—স্বভাবও প্রায় তাঁরই মতো। তেমনি ফ্যাক্টরী নিয়ে মেতে উঠেছে। ঐটাই এখন তার ধ্যান, জ্ঞান। অথচ দুদিন পরে তাকে পরের ঘরে যেতে হবে। ভাবছিলেন, নিলয়কে তার মনের উদ্বেগটা জানাবেন। তার আগে মেয়ে তাকে আরো অবাক করে দিল।

নিলয় এসেছিল শনিবার রাত্রে। রবিবার সকালে চায়ের পাট মিটতেই শিখা মায়ের কাছে গিয়ে বলল, মা, এবার তোমার আসল কাজটা করে ফেল।

আসল কাজ মানে?

নিলয়দা কেন অপেক্ষা করে বসে থাকবে? ওকে সব কথা জানিয়ে দেওয়া ভালো।

কী সব কথা!—মালতীর চোখে শঙ্কার ছায়া ফুটে উঠল।

আমি যে পথে নামলাম, সেখানে তো আর সানাই-এর জায়গা নেই। হাসিমুখে তরল সুরে বলল শিখা, তার দুধারে শুধু কলের ভেঁপু।

মা রেগে উঠলেন, হেঁয়ালি রেখে স্পষ্ট করে বল।

শিখা বলল, স্পষ্ট করেই বলেছি, মা। তুমিও যে বোঝনি, তা নয়। এবার শুধু আরেক পা এগিয়ে গিয়ে ওকে বোঝাতে হবে। সেটা কিছুমাত্র কঠিন নয়। ওর-ও বুঝতে দেরি হবে না।

এসব তুই কি বলছিস খুকু? মালতীর মনের গভীর আশঙ্কা তাঁর কণ্ঠেও ধরা দিল, এতদূর এগোবার পর এ সম্বন্ধ ভেঙে দেবো!

কী করবে বল? একটা মৃত্যু যে সব কিছু ওলট-পালট করে দিয়ে গেল।

তার জন্যে বিয়ে বন্ধ হবে কেন? বরং নিলয় তোর পাশে এসে দাঁড়াবে। ওরই ওপরে সব ছেড়ে দিতে পারবি।

শিখা কয়েক সেকেণ্ড কী ভাবল। তারপর বলল মা, তোমার মনে আছে? একদিন বাইরের ঘরে বসে বাবাতে আর তোমাতে আমার বিয়ে নিয়ে কথা হচ্ছিল। আমি ছোড়দার ঘর থেকে লুকিয়ে সব শুনেছিলাম। বাবার একটা কথা কোনোদিন ভুলবার নয়। বলেছিলেন, বিয়ে হবার পর মেয়ে আর মেয়ে নয়, সে স্ত্রী, সে বৌ। এর চেয়ে খাঁটি সত্য আর হতে পারে না। তার চেয়েও বড় সত্য—এ দুয়ের মধ্যে কোনো আপোস চলে না। ঘটনা-চক্রে আমাকে মেয়েই থেকে যেতে হল। পরের ধাপটায় আর পৌঁছনো গেল না।

মালতী ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন, তুই কী নিয়ে থাকবি হতভাগী? সারাটা জীবন কাটাবি কেমন করে?

মালতী বসেছিলেন খাটের উপর। শিখা মেঝের উপরে তাঁর পায়ের কাছটিতে হাঁটু গেড়ে বসে বাঁ-হাতে মায়ের কোমর জড়িয়ে

ধরল। কোলের উপর মুখ রেখে ডান-হাতে তাঁর হারের লকেটটা নাড়াচাড়া করতে করতে করুণ কোমল সুরে বলল, মা, তুমি এমন করে ভেঙ্গে পড়লে আমি কার দিকে চাইব? তুমি আমাকে বল দাও, সাহস দাও। নিজের চোখেই তো দেখলে, আমি যখন কথা দিলাম, বাবা কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। শেষ সময় যে আশ্বাস তিনি নিয়ে গেলেন, সেটা কি আমাকে সমস্ত শক্তি দিয়ে পূরণ করতে হবে না? তার চেয়ে বড় হল আমার বিয়ে। মা, মেয়ে বলে তুমি আমাকে ছোট করে দেখো না। বাবার মতো তুমিও আমাকে আশীর্বাদ কর। তাঁর স্বপ্ন আমি নষ্ট হতে দেবো না।

মালতী মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, কোনো কথা খুঁজে পেলেন না। মনটা একটু শান্ত হবার পর চোখ মুছে বললেন, এতবড় একটা কঠিন আঘাত নিলয়কে আমি দেবো কেমন করে? তারপরেও কি ওর কাছে আমার মুখ দেখাবার উপায় থাকবে?

সে জন্যে তুমি ভেবো না, মা। ওর মনটা যে কত বড়, তা তো জান। আঘাত পাবে, কিন্তু সেটা কাটিয়ে উঠবার শক্তিও ওর কারো চেয়ে কম নেই।

শিখার এই প্রত্যাশাটা বোধহয় একটু সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সে ভুলে গিয়েছিল, নিলয় পাষাণ নয়, সে মানুষ। তবু মালতীর মুখ থেকে শেষ জবাব পাবার পর, ভিতরে যাই হোক, বাইরে তার কোনো চাঞ্চল্য প্রকাশ পায়নি। মালতীই বরং নিজেকে ধরে রাখতে পারেননি, বলতে গিয়ে বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। নিলয় তাঁকে প্রবোধ দিয়েছিল, আপনি এজন্যে কিছু মনে করবেন না, মাসিমা। আমি সব বুঝতে পারছি।

ট্রেনের তখনো দেরি ছিল। তবু একটু আগে আগেই বেরিয়ে পড়েছিল নিলয়। একবার ভেবেছিল, যাবার সময় অন্যান্য বারের মতো শিখার সঙ্গেও দেখা করে যাবে। পাছে তার সামনে কোনো দুর্বলতা প্রকাশ পায়, তাই শেষ পর্যন্ত সে ইচ্ছা ত্যাগ করেছিল।

শিখাও তার ঘর থেকে বেরোয়নি। হয়তো ঐ একই কারণে। যত শক্ত করেই বুক বাঁধুক, শেষ মুহূর্তে যদি না টেকে? অবাধ্য চোখ ছুটো যদি বাদ সাধে? যদি সব সংকল্প ভাসিয়ে নিয়ে যায়?

ট্রেনে বসে নিলয় নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করল, এ ভালোই হলো। সংসারে সে শুধু পরের বোঝা বইতে এসেছে, এই তার বিধিলিপি। আর কেউ এসে তার নিজের ভাবনাটুকু তুলে নেবে, সেটা বিধাতার ইচ্ছা নয়। কিন্তু তাকে নিয়ে তাঁর এই পরিহাসের কী প্রয়োজন ছিল? এতদিন সে ছুটে গিয়েছে অন্যের ঘর গুছিয়ে দিতে. অন্যের সংসারে দাঁড় টানতে। বাকী জীবনটাও না হয় তাই করে যেত। মাঝখানে এই নিজের ঘর, নিজের সংসারের অলীক স্বপ্ন তাকে পেয়ে বসল কেন? আজকের এই লজ্জা সে রাখবে কোথায়?

নিজের কাছে নিজেকে বড় দীন, বড় কৃপার পাত্র বলে মনে হল নিলয়ের। কাউকে কোনো দোষ দিতে পারল না। শিখাকে তো নয়ই। তবু বুকের ভিতরটা জ্বালা করতে লাগল। সংসারে না পাওয়ার যে দুঃখ তাকে সয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু পাবার মুখে হারাবার যে যন্ত্রণা, যে লাঞ্ছনা, সেটা বড় দুর্বিসহ।

স্টেশনে পৌঁছবার আগেই নিলয়ের মনে একটা অদ্ভুত বিবর্তন ঘটে গেল। এবার আর কারো ঘরের সঙ্গে বা জীবনের সঙ্গে নিজেকে জড়ানো নয়। আজ থেকে সে একা। চিরকাল সে শুধু অন্যের ডাক শুনে এসেছে। একটিবার মাত্র একজনকে মনে মনে ডাক দিয়েছিল, সাড়াও পেয়েছিল। কিন্তু সে এলো না। নাই যদি এলো, তবে 'একলা চলরে'। আজ থেকে এই তার জীবন-দর্শন।

এখানকার চাকরির উপর সে আগেই বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল। তবু ছাড়ব ছাড়ব করেও ছাড়তে পারেনি। আজ আকস্মিক ভাবে তার সুযোগ এসে গেল। বণ্ডের মেয়াদ আগেই শেষ হয়ে গেছে,

তবু ইস্তফা দিতে গেলে এক মাসের নোটিশ চাইবে কোম্পানী। ততদিন বসে থাকবার ধৈর্য আর নেই। তাছাড়া কাজ করবার জন্যে মনের যে স্থিরতা, যে শৃঙ্খলা দরকার, তাই বা কই? ভিতরটা সব যেন ওলট-পালট হয়ে গেছে। সেই রুটিন-বাঁধা জীবনে ফিরে যেতে হবে, ভাবতেও ভয় হয়। না, এখন শুধু কোনোরকমে ছুটে বেরিয়ে পড়া। এমন জায়গায় গিয়ে পড়ে থাকা, যেখানে একটাও চেনা মুখ নেই, যেখানে কেউ এসে জানতে চাইবে না, কেমন আছ।

নিলয় মনে মনে হিসাব করে দেখল, এখনো মাসখানেক ছুটি পাওনা আছে। কিন্তু চাইতে গেলে দেবে না, সি. ঈ. আপত্তি করবেন। তার চেয়ে এক কাজ করা যাবে। যাবার দিন ঐ ছুটির জন্যে ডাকে একখানা দরখাস্ত ছেড়ে দেবে, সেই সঙ্গে চাকরি ছাড়ার নোটিশ।

দু-তিন দিন গেল এখানকার বাস গোটাতে। চাকরটিকে এক মাসের বেশী মাইনে দিয়ে বিদায় করে দিল। আসবাবপত্র সামান্য যা ছিল, বিলিয়ে দিতে গেলে নানা কথা উঠবে। তাই ছুটির পর এসে নেবো বলে কোনো বন্ধুকে গছিয়ে দিল। তারপর বেরিয়ে পড়ল স্টেশনের পথে।

কোথায় যাবে তখনো ঠিক করেনি। দুটো জিনিস ভেবে রেখেছিল নিলয়—জায়গাটা হবে অনেক দূর এবং যতটা সম্ভব নির্জন। অনেকদিন আগে একবার মাকে নিয়ে হৃষীকেশ গিয়েছিল। বড় ভালো লেগেছিল—একদিকে অরণ্য-সংকুল হিমালয়ের গাম্ভীর্য, আরেকদিকে উপল-ব্যথিত গঙ্গার অস্থিরতা। মানুষ সেখানে ভিড় জমিয়ে বসেনি।

হরিদ্বার হয়ে যেতে হয় হৃষীকেশ। তারই টিকেট চাইল। টিকিটবাবু বললেন, আপনি একটু অপেক্ষা করুন। এদের টিকেট-গুলো দিয়ে নিই। আপনার ওটা বানাতে হবে। গাড়িরও দেরি আছে।

ওয়েটিং রুমে এসে বসতেই চাকরটি ছুটতে ছুটতে এসে একটা চিঠি দিয়ে বলল, আপনি বেরোবার একটু পরেই পিওন দিয়ে গেছে।

হাতের লেখা দেখেই বুকের ভিতরটা নড়ে উঠেছিল। তাড়াতাড়ি খুলে ফেলে প্রথম লাইন দুটো পড়েই সারা দেহে যেন একটা তড়িৎ-প্রবাহ বয়ে গেল।

"তুমি আমাকে একা ফেলে চলে গেলে নিললদা! যাবার আগে একবার এসে দাঁড়ালে না আমার কাছে, জানতে চাইলে না, কী বলতে চায় শিখা?"

এইখানে এসেই থেমে গেল নিলয়। বুঝতে পারল না, এ কিসের ইঙ্গিত। সমাপ্তির রেখা যেখানে টানা হয়ে গেল, তার পরে বলবার বা শোনবার আর কী থাকতে পারে? কিন্তু এমন একটা সুর ছিল এই কটি কথার মধ্যে, যার টানে পরমুহূর্তেই আবার সে ফিরে গেল বাকী লাইনগুলোয়—

"যে বন্ধন আমাদের গড়ে উঠতে গিয়েও উঠল না, শেষ ধাপে এক দুর্লঙ্ঘ্য বাধা এসে যাকে থামিয়ে দিল দুটি নরনারীর জীবনে—হলই বা তারা তরুণ তরুণী—সেইটাই কি একমাত্র মিলনগ্রন্থি, নিলয়দা? তার মতো দৃঢ়, তার মতো মধুর আর কিছু নেই?

আমাদের ভালোবাসা যদি সত্য হয়, সে কি শুধু এই জন্যে ব্যর্থ হয়ে যাবে, যে একটি বিশেষ সম্পর্কের মধ্যে এসে তার পরিণতি ঘটল না?

তোমার মনে পড়ে, একবার আমরা কোথায় যেন একটা দীঘির ধারে বেড়াতে গিয়েছিলাম? অনেক পদ্ম ছিল দীঘিটায়। একজন লোক সেগুলো তুলছিল। তুমি তার কাছ থেকে এক গোছা কুঁড়ি কিনে এনে আমার হাতে দিয়েছিলে। আমি বলেছিলাম, দু-চারটা ফোটা ফুল নিলে না কেন? তুমি বলেছিলে, পদ্ম ফুটলেই তো গেল। তার চেয়ে এই কুঁড়ির মধ্যেই তাকে বেশী করে পাওয়া যায়।

আমাদের ভালোভাসা না হয় চিরদিন সেই কুঁড়ি হয়েই রইল। সব কুঁড়ি তো ফোটে না। তাই বলে সে কি অসার্থক?

না-ই বা হলে তুমি আমার স্বামী, আমার 'জীবন-বল্লভ', না-ই বা হলাম আমি তোমার শয্যা-সঙ্গিনী, কবি যাকে বলেছেন 'গৃহের বনিতা', তাই বলে যে নিলয়-শিখা এতদিন ধরে একে অন্যকে চিনল, জানল আশা-নিরাশায়, আনন্দে-বিষাদে এত কাছে এসে দাঁড়াল, চিরজীবনের তরে তারা মিথ্যা হয়ে যাবে?

তুমি তো জান নিলয়, কেন আমাকে এই একক জীবন বেছে নিতে হলো। কিন্তু একক মানে তো বিচ্ছিন্ন নয়। তুমি থাকবে তোমার জগতে তোমার কাজ নিয়ে, আমি থাকব আমার জগতে আমার কাজ নিয়ে। সেই কর্মসূত্রে আমাদের মিলন হবে—আমাদের চিন্তা ও আদর্শ যেখানে বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে, সেই যজ্ঞশালায়। সেখানে আমরা দুজনে দুজনের কর্ম-সহচর!

কাজের বাইরে যে জীবন সেখানেও কি আমরা মিলিত হতে পারি না? সারাদিনের শ্রান্তিভার নামিয়ে দিয়ে তুমি এসে বসবে আমার কাছে, কখনো আমি গিয়ে বসবো তোমার পাশটিতে। কোনোদিন বা দুজনে মিলে চলে যাবো দূরে, সহরের বাইরে। তুমি তোমার বেহালায় সুর দেবে, আমি মুখোমুখি বসে শুনবো। আমি তো গাইতে জানি না। তোমাকে কী শোনাবো? কেন, আমার কথা? মনে আছে একদিন কী বলেছিলে?—'তোমার কথাগুলোই গান!' সেই গান শুনবে। যতক্ষণ ইচ্ছা হয়।

আমাদের সেই প্রীতিময় সাহচর্য কর্মান্তের অবসরকে দেবে মাধুর্য, বিশ্রামকে করবে রমণীয়।

তারপর যখন রাত্রি হবে, তুমি চলে যাবে তোমার আস্তানায়, আমি চলে আসবো আমার এই ছোট্ট ঘরটিতে, যেখানে বসে তোমাকে চিঠি লিখছি।

আমার কথা কি তোমাকে বোঝাতে পেরেছি নিলয় ?

তোমার আসার পথ চেয়ে রইলাম।

তোমার শিখা।

চিঠি যখন শেষ হল, তারপরেও অনেকক্ষণ নিলয় সেই ওয়েটিং-রুমের বেঞ্চিতে চুপ করে বসে রইল। হঠাৎ কোথাকার কোনো গাড়ির ঘণ্টা কানে যেতেই চমকে উঠে দাঁড়াল। টিকেট কাউণ্টারে গিয়ে দাঁড়াতেই ও ঘর থেকে সেই বাবুটি বললেন, এই যে এবার আপনার টিকিট দিচ্ছি। হরিদ্বারের ভাড়া হল—

নিলয় বলল, হরিদ্বার নয়, একখানা হাওড়ার টিকেট দিন।

টিকিটবাবু রেলভাড়ার তালিকা দেখছিলেন। তার থেকে মুখ তুলে একটু অবাক হয়ে পড়লেন।

শেষ

তনুমন

এক

যা-ই বলুন, one cannot go against nature. রক্তমাংসের ধর্মটাও ধর্ম।—বলতে বলতে আফিসের পরদা ঠেলে বেশ খানিকটা উত্তেজিত ভঙ্গীতে ঢুকে পড়লেন ডাক্তার সাহেব!

একটা নারী-ঘটিত মামলার রায় পড়ছিলাম। বন্ধ করে বললাম, কী হল আবার? কার কথা বলছেন?

ঐযে আপনার মহানন্দ না কি নন্দ! দিন, দেশলাইটা দিন।

দেশলাইটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, মহানন্দ নয়, সদানন্দ; ব্রহ্মচারী সদানন্দ। এই দেখুন, কত বড় জাজ্‌মেণ্ট।

আপনি দেখুন। ও-সব আমার অনেক দেখা আছে।

একটা চেয়ার টেনে বসে গোটা তিনেক কাঠি পুড়িয়ে সিগারেট ধরালেন। তারপর পা দুটো টান করে, গোটাকয়েক লম্বা টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে খানিকটা ঠাণ্ডা হয়ে নিয়ে বললেন, আসল ব্যাপারটা কী বলুন তো?

ব্যাপার রীতিমতো জটিল। সারা জীবন যাকে বলে রীতিমতো ব্রহ্মচর্য পালন করে বুড়ো বয়সে একটা ঝিয়ের সঙ্গে—

এর মধ্যে 'জটিল'টা কী দেখলেন? আমি তো দেখছি simple biological case। সেই কথাই বলছিলাম। সাধু-সন্ন্যাসীরা বলেন, নারী নরকের দ্বার। বেশ মানলাম। কিন্তু আপনার দেহে রক্তমাংস যতক্ষণ আছে, ঐ দ্বারটি এড়াবার উপায় আছে কি? ব্রহ্মচর্যই করুন আর গেরুয়াই ধরুন, ঘুরে ফিরে ঐখানে এসেই হুমড়ি খেয়ে পড়তে হবে। সাপুড়েদের দেখেছেন তো? যতই সাবধান হোক, একদিন ঐ সাপের হাতেই প্রাণ দিতে হয়। তেমনি অনেক বড় বড় শিকারীর শেষ গতি হল বাঘের পেট।

উপমাটা যে উলটো হল ডাক্তার সাহেব! সাপুড়ে আর শিকারীদের কারবারই হল ঐ নাগিনী-বাঘিনী নিয়ে। কিন্তু এঁরা যে স্ত্রী-জাতির ছায়াও মারান না।

আরে মশাই, ছায়া মাড়ান না বলেই কায়ার ঠেলা সামলাতে পারেন না। যাকে আমি কামনা করি, তাকে যখন হাতের কাছে পাই, তার জন্যে লোভ বলুন বাসনা বলুন হঠাৎ উগ্র হবার সুযোগ পায় না। কিন্তু সে যখন বেড়ায় আমার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, আর মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে কোনো বাঁধা, হোক না সে আমার নিজের হাতে তৈরী, তখন আমাকে আর মোহ-মুদ্গর মেরে ঠেকানো যায় না। তখনই আসে ঐ বাঁধ-ভাঙার উন্মাদনা, যার চেয়ে মারাত্মক জিনিস আর কিছু নেই।

আমি মৃদু হেসে বললাম, আছে।

কী বলুন?

ডাক্তার যখন ছুরি ফেলে ফিলজফি ধরে।

ওঃ হো! ঠিক কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। চারটে অপারেশন আছে। দুটো তার মধ্যে বেশ গোলমেলে। আচ্ছা পালাই। বলে, লাফ দিয়ে উঠে পড়লেন ডাক্তার সাহেব।

সিভিল সার্জন্ হিসাবে উনি জেলখানারও মেডিক্যাল অফিসার। রোজ একবার করে হাসপাতালটা ছুঁয়ে যান। তার বেশী সময় হয় না। আসা-যাওয়ার পথে প্রয়োজন মতো কখনো বা অপ্রয়োজনে আমার আফিসে ঢুঁ মারেন।

বললাম, কী রকম দেখলেন, বলুন।

কী রকম আবার? তিন দিন হয়ে গেল। ঐ তো শরীর। একদম নেতিয়ে পড়েছে। কাল সকাল থেকেই নাকে নল চালিয়ে দুধ ঢালতে হবে। সেই ব্যবস্থাই করে এলাম।

বলেন কি! তা হলে আমার কাজটা তো আজই সেরে নেওয়া দরকার।

আপনার আবার কী কাজ ?

একটা হুমকি দিতে হবে, অবিলম্বে হাঙ্গার ষ্ট্রাইক্ প্রত্যাহার না করিলে তোমাকে ফৌজদারী সোপর্দ করা হইবেক।'

হুমকি দিতে হয় দিন, কিন্তু যা চীজ দেখলাম, বিশেষ কাজ হইবেক বলে তো মনে হয় না।

তাহলেও ঐ হুমকি অর্থাৎ আইনানুসারে যথারীতি ওয়ার্নিং দেবার জন্যে সদলবলে হাসপাতালে গিয়ে উপস্থিত হলাম। গিয়ে দেখলাম, ঠিকই বলেছেন ডাক্তার সাহেব। ব্রহ্মচারীর ক্ষীণ দেহ ক্ষীণতর হয়ে বিছানার সঙ্গে মিশে গেছে।

দিন তিনেক আগে নারী-ধর্ষণ মামলায় পাঁচ বছরের মেয়াদ নিয়ে তিনি আমার আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। তারপর থেকে আর জলগ্রহণ করেন নি। অর্থাৎ জল ছাড়া আর কিছু গ্রহণ করেন নি। কিসের জন্যে তাঁর এই কঠোর অনশন বার বার প্রশ্ন করেও তার আভাস পাওয়া যায় নি। এইটুকু শুধু জানিয়েছেন, এটা তাঁর হাঙ্গার ষ্ট্রাইক্ বা প্রায়োপবেশন নয়, কারো বিরুদ্ধে তাঁর কোনো ক্ষোভ বা অভিযোগ নেই। তবু আর-একবার ঐ একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলাম। উনি ম্লান হেসে বললেন, এর জবাব তো আমি আগেই দিয়েছি, স্যর। কারণটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত।

কিন্তু আপনি যাকে 'ব্যক্তি' বলছেন, জেলে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি 'গত' হয়েছেন। এখানে ব্যক্তিগত বলে আপনার কিছু নেই।

ব্রহ্মচারী চুপ করে রইলেন। আমি আর একটু পরিষ্কার করে বললাম, আপনার দেহ মন দুই-ই এখন সরকারের দখলে। তবে মন জিনিসটা চোখে দেখা যায় না, ধরা-ছোঁয়া যায় না। ওর ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করবার অস্ত্র আমাদের হাতে নেই। কিন্তু আপনার

ঐ দেহটা সরকারী সম্পত্তি। যেমন করেই হোক ওকে বাঁচিয়ে রাখার দায় আমাদের।

ব্রহ্মচারী হাসলেন। নিজেকে দেখিয়ে কৌতুকের সুরে বললেন, কিন্তু এমন কিছু মূল্যবান সম্পত্তি নয় যে, সে দায় পালন না করলে সরকারের বিশেষ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা।

আপনি ভুল করলেন, ব্রহ্মচারী মশাই। মানুষ দায় বলে যাকে জানে, তাকে দায় বলেই পালন করে, লাভ-ক্ষতির হিসেব খতিয়ে দেখে না। সরকারের বেলাতেও সেই একই কথা।

সদানন্দ নিঃশব্দে চোখ বুজলেন। মুখে ফুটে উঠল গাম্ভীর্যের ছায়া। তার মধ্যে কয়েকটা বোধহয় সূক্ষ্ম দ্বন্দ্বের রেখা। বৃথা অপেক্ষা না করে আমার আইন-প্রদত্ত অধিকার—অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশ দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করবার আদেশ জারি করতে যাচ্ছিলাম, এমন সময়ে উনি চোখ খুললেন, এবং অনেকখানি দ্বিধা ও সঙ্কোচের সুরে বললেন, আত্মহত্যা করা বা জেলের আইন-শৃঙ্খলা অমান্য করে আপনাকে বিব্রত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার এই উপবাসের মূলে আর কিছু নেই ছিল শুধু একটু চিত্তশুদ্ধির চেষ্টা। কিন্তু তা সফল হয় নি। তাই আর অনাবশ্যক ঝঞ্ঝাট বাড়াতে চাই না। আপনার কাছে একটা নিবেদন শুধু আছে, অনুমতি করেন তো বলি।

বলুন না।

চিরদিন—হ্যাঁ, তা চিরদিনই বলা যেতে পারে, গুরুগৃহ ত্যাগ করবার পর থেকেই আমি স্বপাক-ভোজী। অবশ্য ভোজের ব্যাপারটা এমন কিছু গুরুতর নয়। দু'মুঠো আতপ চাল, তার সঙ্গে দুটো ঝিঙে-কাঁচকলা ফুটিয়ে নেওয়া। আধ ঘণ্টার মামলা। সাধারণ কয়েদী হিসেবে যে কাজ আমাকে দেবেন, তার কোনো রকম ক্ষতি না করে—

ব্রহ্মচারীর বক্তব্য শেষ হবার আগেই পাশে দাঁড়িয়ে আমার আইন-অভিজ্ঞ জেলর তাঁর কর্তব্য পালন করলেন। আমাকে

স্মরণ করিয়ে দিলেন, জেল-কোডের অমোঘ নির্দেশ—No prissner is allowed to cook for himself. জেলখানায় স্বপাক নিষিদ্ধ।

খানিকটা চাপা গলায় এবং দৃশ্যত আমার উদ্দেশে বললেও কথাটা যাতে ব্রহ্মচারীর শ্রুতিপথ এড়িয়ে না যায়, সে বিষয়ে নিশ্চয়ই সজাগ ছিলেন জেলরবাবু। তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। সদানন্দ তাঁর অসমাপ্ত নিবেদন আর শেষ করলেন না। আমি যে মৌন হয়ে রইলাম, তাকে সম্মতি মনে না করে জেলরবাবুর সমর্থন বলেই গ্রহণ করলেন। অপ্রিয় উত্তরটা আমাকে আর মুখ ফুটে দিতে হল না।

হাসপাতালের হাতা পেরিয়ে সবে সাধারণ এলাকায় ঢুকতে যাচ্ছি, আমার এসকর্ট-বাহিনীর বেড়া ডিঙিয়ে হঠাৎ কোত্থেকে একটা লোক বিদ্যুদ্বেগে ছুটে এসে সজোরে পা জড়িয়ে ধরল। অতি কষ্টে সিপাইদের হাত থেকে তাঁকে বাঁচানো গেল বটে, কিন্তু তারপরও সে পা ছাড়বার নাম করে না। ধমক দিতেই কেঁদে ফেলল। কান্নার ফাঁকে ফাঁকে কথা যেটুকু বেরুল, তার থেকে বুঝলাম, ব্রহ্মচারী তার গুরুদেব, উনি মানুষ নন, শাপভ্রষ্ট দেবতা, এবং এই মামলাটা একেবারেই মিথ্যা। আসল বক্তব্যটা ছিল শেষের দিকে। উনি যখন এই জেলখানার অন্ন কিছুতেই গ্রহণ করবেন না, এবং স্বপাকও যখন সম্ভব নয়, তখন সেই সামান্য রন্ধন-কার্যটি যদি দয়া করে ওর হাতে ছেড়ে দিই গুরুর প্রাণরক্ষা হয়, শিষ্যও নিজেকে কৃতার্থ মনে করে।

বললাম, কিন্তু উনি তো নিজের হাতে ছাড়া আর কারও হাতে খাবেন না।

শিষ্যটি সবিনয়ে নিবেদন করল, সেইটাই তাঁর সাধারণ নিয়ম বটে, কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে কোনো কোনো শিষ্যের হাতে অন্ন গ্রহণ করতে আপত্তি করেন না।

জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি বুঝি সেই বিশেষ শিষ্যদের একজন?

বিনীত কণ্ঠে উত্তর এল, গুরুদেব আমাকে কৃপা করেন।

কী মামলায় এসেছ তুমি ?

মারপিট।

জমি নিয়ে ?

আজ্ঞে না, জমির আইল নিয়ে।

কী নাম ?

সহদেব ঘোষ।

গোয়ালা ?

হুজুর।

তোমার সঙ্গে আর কজন আছে ?

আজ্ঞে তিনজন—ছেলে, জামাই আর সম্বন্ধী।

কিন্তু উনি তো ব্রাহ্মণ। গোয়ালার হাতে খাবেন কি ?

তা খাবেন। ওঁর জাতবিচার নেই। যাকে স্নেহ করেন, বিশ্বাস করেন, সে মুচি হলেও খান। তা না হলে ব্রাহ্মণের হাতেও জলস্পর্শ করেন না।

আচ্ছা, তোমার কথা আমার মনে রইল। ভেবে দেখবো।

সহদেব ঘোষ আমার পা দুটো আবার চেপে ধরল। যে কোনো সমস্যাই হোক, তার মীমাংসা মুলতুবী রাখা ওদের স্বভাবের বাইরে। আইলের স্বত্ব যেমন তৎক্ষণাৎ লাঠির জোরে সাব্যস্ত করে নিয়েছিল, থানা-আদালতের মুখ চেয়ে বসে থাকে নি, এখানেও তেমনি জেলের আইন-কানুন বা কর্তৃপক্ষের বিচার-বিবেচনার ভরসায় না থেকে গুরুসেবার অধিকারটা নিছক পা চেপে ধরার জোরেই আদায় করে নেবার ব্যবস্থা করল।

শাসনতন্ত্রের বিধানমাত্রেই অনম্য। শাসক সেটা প্রয়োগ করেন, কিন্তু নিজের খুশিমতো ভাঙতে পারেন না, নোয়াতেও পারেন না। কারা-শাসনের ভার যার হাতে, তার বেলায় এ কথা বিশেষভাবে

প্রযোজ্য। কেননা, এখানে যাদের নিয়ে তাঁর কারবার, আইন পালনের চেয়ে লঙ্ঘনের দিকেই তাদের ঝোঁক বেশী। হয়তো সেই একই কারণে এখানকার যারা বাসিন্দা, তাদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার প্রতিটি মুহূর্ত কড়া আইনের শক্ত শৃঙ্খল দিয়ে বাঁধা। তাদের অশন, বসন, চলন, কথন, কর্ম, অবসর, সবখানি জুড়ে জেল-কোডের বিস্তৃত অধিকার। খাদ্যবস্তুর পরিমাণ যেমন বাঁধা, তার নাম এবং সংখ্যাও তেমনি নির্দিষ্ট। বস্ত্রের বেলাতেও তাই। আকার প্রকার সংখ্যা, সব বিধিবদ্ধ। তেঁতুলের বদলে আমড়া, কিংবা ধনের বদলে পাঁচফোড়ন, যেমন অচল,* জাঙিয়ার বদলে পায়জামা, অথবা কুর্তার বদলে হাফশার্টও তেমনই না-মঞ্জুর।

একটা পুরনো ঘটনা মনে পড়ল। এই সেদিন পর্যন্ত নারী-কয়েদীরা যে শাড়ি পরত, তার জমিতে থাকত নীল রঙের ডোরা। উনিশ শো বত্রিশ সনে সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স করে যাঁরা জেলে এলেন তার মধ্যে কয়েকজন হিন্দু বিধবা ডোরা-কাটা শাড়ি পরতে অস্বীকার করে বসলেন। কোনো এক জেলের শ্বেতাঙ্গ সুপার ক্ষেপে উঠলেন—তোমরা আইন অমান্য করে জেলে এসেছ, জেলে এসেও আইন অমান্য করবে, তা চলবে না।

তাঁকে যখন বোঝানো হল, এদের আসল উদ্দেশ্য আইন লঙ্ঘন নয়, শাস্ত্র-পালন, তিনি জেল-কোডের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, কিন্তু আমার এই শাস্ত্রে যখন সাদা থানের ব্যবস্থা নেই, তখন ওই নীল ষ্ট্রাইপওয়ালা শাড়িই পরতে হবে।

মহিলারা বললেন, না।

হুকুম হল, জোর করে পরিয়ে দাও।

শুরু হল সংঘর্ষ। কারা-বিভাগের শ্বেতচর্ম বড়কর্তাও সুপারের পক্ষ নিলেন—'আইন অমান্য' চলবে না। মন্ত্রিসভার তখনও জন্ম হয়নি, এক্জিকিউটিভ কাউন্সিলের যুগ! জেলের চার্জ ছিল জনৈক দেশীয় মেম্বারের হাতে। বিধবাদের শ্বেতবস্ত্র দাবির মধ্যে সিভিল-

টসওবিডিয়েন্সের গন্ধটা তিনি ঠিক ধরতে পারলেন না। তবু জল-কোডের সঙ্গে রফা করা সম্ভব হয় নি। গত্যন্তর না দেখে আইনের ওই ধারাটির সঙ্গে জুড়ে দিলেন একটা অ্যামেণ্ডমেণ্ট্—বৈধবাদের শাড়িতে ষ্ট্রাইপ থাকবে না।

অতদূর না গিয়েও সংঘর্ষ বাঁচাবার অন্য একটা পথ তখনও ছিল, এখনও আছে। কর্তৃপক্ষ—বিশেষ করে শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা—অনেক ক্ষেত্রেই তার শরণ নিতেন। সেবার ইচ্ছে করেই নেন নি। সেটা হচ্ছে জেল-কোডের ছিয়ানব্বই ধারা। বয়লারের মাথায় যেমন একটা করে সেফটি ভাল্‌ব থাকে, যার কাজ হল অতিরিক্ত বাষ্পের চাপ বের করে দিয়ে ইঞ্জিনকে সচল রাখা, তেমনি ওই ধারাটি হচ্ছে কারাতন্ত্রের সেফটি ভাল্‌ব্—সময় বিশেষে অতিরিক্ত আইনের চাপকে কিঞ্চিৎ হালকা করে দেবার যন্ত্র। বয়লারের ভাল্‌ব্ বোধ হয় স্বয়ংক্রিয়। কিন্তু ছিয়ানব্বই ধারাকে চালু করতে হলে একটি বিশেষ ব্যক্তির আনুকূল্য প্রয়োজন। তাঁর নাম মেডিক্যাল অফিসার। তিনি যদি মনে করেন, জেলের কোনো বিধি বা আদেশ ক্ষেত্রবিশেষে কয়েদীর দেহ কিংবা মনের পক্ষে হানিকর, তালিকা-মাফিক খাদ্য বা বস্ত্র কারও দৈহিক বা মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতিকূল, তা হলে ওই বিশেষ ক্ষেত্রে সুপার তাঁর উপর-মহলের অনুমতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট আইনটিকে শিথিল করবার ব্যবস্থা করতে পারেন।

বছর কয়েক আগেকার একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি। তখ জেলের আইনে ধূমপান সম্বন্ধে ভীষণ কড়াকড়ি। প্রথম শ্রেণী কয়েদী (যাঁরা কালে-ভদ্রে আসেন) এবং হাজতী আসামী ছাড়া আ কারও কাছে বিড়ি সিগারেট কিংবা একটুকরো তামাকপাতাও ছি মারাত্মক নিষিদ্ধ বস্তু, জেল-কোডে যাকে বলে Contraban সেই সময়ে কোনো নামজাদা সেণ্ট্রাল জেলের মেডিক্যাল অফিসা একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদীর টিকিটে দৈনিক দু-প্যাকেট সিগারে সুপারিশ করে বসলেন। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মানতে চাইলেন না

জেলের যা বরাদ্দ, তার উপরে কারো বেলায় কিছু বাড়তি খাদ্য—যথা, মাছ, মাংস, মাখন, ডিম, দুধ, দই, কিংবা ফলমূল, এ সবের ব্যবস্থাও ওঁরা দিয়ে থাকেন। সেটা নতুন নয়, অপ্রত্যাশিতও নয়। কিন্তু এ যে নেশা! জেলের আইনে যাকে বলা হয়েছে নিষিদ্ধ বস্তু। সিগারেট যদি চলে, মদ গাঁজা চণ্ডু চরসেই বা বাধা কোথায়? সুতরাং এটা ছিয়ানব্বই ধারার অপপ্রয়োগ। মেডিক্যাল অফিসারকে সেই কথাই জানিয়ে দিলেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

তিনি বললেন, নেশার ব্যবস্থা কি সাধ করে করেছি। করেছি প্রাণের দায়ে।

কী রকম?

তবে শুনুন। দিন সাতেক হল এসেছে লোকটা। এসেই এ অসুখ, সে অসুখ। জেলের দুজন ডাক্তার হিমসিম খেয়ে গেল। রোগটা যে কী, ধরতেই পারল না। আমি গিয়ে দেখি, রুগী ঘরময় ছুটে বেড়াচ্ছে। চোখ দুটো জবাফুলের মতো লাল। কী ব্যাপার? জিজ্ঞেস করতেই গরম মেজাজে শুরু করল লম্বা ফিরিস্তি। আমাদের শাস্ত্রে যে-সব বড় বড় রোগের বর্ণনা আছে, তার কোনোটার সঙ্গেই মেলে না। হঠাৎ আমার হাতের দিকে নজর পড়তেই থেমে গেল। মুখে কথা নেই, কিন্তু চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। হাতে কী ছিল বুঝতেই পারছেন। সিগারেটের টিন। একটা চান্স নেওয়া গেল। ওই থেকে একটা সিগারেট বের করে এগিয়ে ধরলাম। পাগলের মতো ছুটে এসে কেড়ে নিল আমার হাত থেকে। ধরাতে দেরি সয় না। তারপর সে কি টান! আর একটা দিলাম। এক মিনিটে শেষ। চোখের সামনে চেহারা বদলে গেল। রীতিমতো সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ। জিজ্ঞেস করলাম, কেমন লাগছে? খুব ভালো স্যর। আমার আর কোনো অসুখ নেই।

ক' প্যাকেট চলত রোজ?

একগাল হেসে বলল, আজ্ঞে দেড় টিন। কোনোদিন পুরো দু'টিনও লেগে যেত।···তাহলে বুঝুন একবার ব্যাপারটা।

সুপার হেসে উঠলেন। ডাক্তার সাহেবের চোখে-মুখে তখনো ভয়ের চিহ্ন। বললেন, খুব বেঁচে গেছি মশাই। ওই বস্তুটি দিতে আর একদিন দেরি হলেই ও নির্ঘাত খুন করত! হয় নিজেকে, নয়তো আর কাউকে। তার মধ্যে আমার পালাই ছিল সকলের আগে।

ছিয়ানব্বই ধারার আরও একটা বিচিত্র প্রয়োগ মনে পড়ে গেল। সে সম্বন্ধে দু চার কথা বলেই এ অবান্তর প্রসঙ্গ শেষ করব।

চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট থেকে তিন মাসের জেল নিয়ে এল এক খোঁড়া পকেটমার। ফিরিঙ্গিপাড়ায় মাঝে মাঝে দেখেছি, টুপি উপুড় করে ভিক্ষা চাইছে পথচারীদের কাছে। জেলে যখন এল, পরনে তালি-মারা ট্রাউজার, ছেঁড়া শার্ট, আর ময়লা হ্যাট। গায়ের রং তামাটে। নামটা বোধ হয় ডেভিস কিংবা ডেভিডসন। কথা বলে ইংরেজীতে, তবে তার সঙ্গে গ্রামারের সম্পর্ক অতি ক্ষীণ। তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী। কিন্তু সকালবেলা লপসির থালা সামনে দিতেই ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মেটকে হুকুম করল, নেটিভকা খানা নেহি খায়গা। ব্রেড-বাটার আউর টি লেয়াও।

মেট-লোকটার কিঞ্চিৎ রসজ্ঞান ছিল। সাড়ম্বরে সেলাম ঠুকে বলল, বিলেতে অর্ডার গেছে সাহেব। আসতে দেরি হবে, ততক্ষণে লপসিটা খেয়ে লাও।

এর পরে 'সাহেবের' মেজাজ ঠিক থাকবার কথা নয়। হিন্দী এবং ইংরেজী মিশিয়ে মেটের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে দিল। শ্বেতাঙ্গ জেলরের কাছে নালিশ জানাল মেট। সে অভিযোগ মুলতুবী রেখে তিনি আসামীকে নিয়ে গেলেন সুপারের আফিসে। তার ঘণ্টাখানেক পরেই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হবার দাবি জানিয়ে ডেভিডসনের দরখাস্ত চলে গেল চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। তার উপরে রইল জেল-সুপারের স্বহস্তের সুপারিশ। উত্তরের অপেক্ষা না করেই তার জন্যে ব্যবস্থা হল নতুন এক সেট দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহেবী পোশাক, ইউরোপিয়ান কিচেন থেকে

বহুমূল্য সাহেবী-খানা, এবং জায়গাও হল ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডের দোতলায়।

পরদিন সরাসরি না-মঞ্জুর হয়ে ফিরে এল দরখাস্ত। মোটা লাল পেন্সিল দিয়ে গোটা-গোটা অক্ষরে লিখেছেন সিভিলিয়ান সি. পি. এম. —He is a beggar and can't get Division II. ডিভিশন টু—অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠতে হলে তার আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা এবং সেই সঙ্গে জীবনযাত্রার মান সাধারণ স্তরের উপরে থাকা চাই। ম্যাজিস্ট্রেটের অর্ডার অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। কিন্তু ঐ লাল পেন্সিলের লেখা দেখে জেলর-সাহেবের লাল চোখ আরও লাল হয়ে উঠল। জেল-কোড বগলে করে ছুটলেন সুপার-বাহাদুরের কামরায়। শুধু সুপার নন, তিনিই আবার মেডিক্যাল অফিসার। লড়াই-ফেরত দেশী আই. এম. এস.। ইংরেজ-সহকারীর অনুরোধকে একরকম আদেশ বলেই ধরে নিতে শিখেছেন। সুতরাং ছিয়ানব্বই ধারা প্রয়োগ করে ডেভিডসনের পদোন্নতি বজায় রাখা হল।

এই পকেটমার সাহেবটির বংশ-পরিচয় আমরা পাই নি। যতদূর অনুমান হয়, খঞ্জ পুত্রটিকে এ নাম ছাড়া তার পিতা আর কিছুই দিয়ে যেতে পারেন নি! কিন্তু সেটা যে কত বড় সম্পত্তি, হয়তো তাঁর কল্পনাতেও ছিল না। ঐ নামের দৌলতে জেলে এসেও গদি-আঁটা লোহার খাটে শুয়ে, সরকারী কোট-পেণ্টলুন পরে এবং চেয়ার-টেবিলে চপ-কাটলেট চিবিয়ে তিনটে মাস আনন্দে কাটিয়ে দিল ভিখারী ডেভিডসন।

সেদিন ডেপুটি এবং কেরাণীবাবুদের সান্ধ্য আফিসে ঐ নাম-মাহাত্ম্যই প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়াল। সিতাংশুবাবু আপশোস করলেন, বড্ড ভুল করেছি, দাদা। নামটাকে যদি গোড়া থেকেই চ্যাটার্জির বদলে চ্যাটারটন করে দেওয়া যেত, এতদিনে আর কিছু না হোক একটা পুলিস সার্জেণ্ট অন্তত হতে পারতাম।

হৃদয়দা ওয়ারেণ্ট চেক করছিলেন। চোখ না তুলেই বললেন, আমার মনে হয়, নামের চেয়ে পোশাক-মাহাত্ম্যটা আরও বড়।

পোশাক-মাহাত্ম্য!

হ্যাঁ, আর তার প্রমাণ আমি একবার হাতে হাতে পেয়েছিলাম।

আপনি!—একসঙ্গে পাঁচজনের কণ্ঠ। সবাই মিলে ঘিরে ধরল হৃদয়দাকে। হাতে হাতের অভিজ্ঞতাটা সঙ্গে সঙ্গে শোনা দরকার।

তিনি ওয়ারেণ্ট বন্ধ করে চশমাটা খুলে হাতে নিয়ে বললেন, তখন কলেজে পড়ি। উত্তরপাড়া থেকে রোজ খেলতে আসতাম গড়ের মাঠে। সাড়ে সাতটায় একটা গাড়ি ছিল। তাতে করে ফিরে যেতাম। একদিন একটু রাত হয়ে গিয়েছিল। প্ল্যাটফর্মে ঢুকে দেখি, গাড়ি স্টার্ট দিয়েছে। লাফিয়ে উঠে পড়লাম, সামনে যে কামরা পেলাম তাতেই। থার্ড ক্লাশ, কিন্তু একেবারে ফাঁকা। কারণ বুঝতে দেরি হল না। ওটা সাধারণ থার্ড নয়, ইউরোপিয়ান থার্ড। আমার পরনে ছিল ধুতি আর পাঞ্জাবি। গাড়িতে যে-কটি দেশী সাহেব-মেম ছিলেন, তাঁরা কেউ নাক সিঁটকালেন, কেউ চোখ কপালে তুললেন, কেউবা মুখ ফিরিয়ে বসলেন। একটি জামরঙের মেমসাহেব বেশ তেজ দেখাতে শুরু করলেন। শিভালরির সুযোগ পেয়ে এক ছোকরা মতন সাহেব এগিয়ে এসে আমার নাকের উপর ঘুষি বাগিয়ে হিন্দী ভাষায় কৈফিয়ৎ তলব করে বসল, এ গাড়িতে কেন উঠেছ? জান না, এটা রিজার্ভড ফর ইউরোপিয়ানস্? বললাম, তাই নাকি? আচ্ছা, এক মিনিট সবুর করো। সঙ্গে যে পোঁটলাটা ছিল তাই নিয়ে ঢুকে পড়লাম বাথ-রুমে। ধুতি-পাঞ্জাবির ওপরেই চড়িয়ে দিলাম কাদা-মাখা হাফপ্যাণ্ট। স্যাণ্ডেল খুলে পরে নিলাম ফুটবলের বুট। বাড়ি থেকে স্টেশনে আসতে হত সাইকেলে। রোদ লাগে বলে দাদার একটা ফেলে-দেওয়া ছেঁড়া হ্যাট মাথায় দিয়ে আসতাম। সেটাও ছিল পোঁটলার মধ্যে। পরে নিলাম।

তারপর গ্যাটগ্যাট করে বেরিয়ে এসে একেবারে মেমসাহেবের সামনে গিয়ে হাতটা বাড়িয়ে বললাম, হ্যালো, হা-ডু-ডু।

আমাদের সম্মিলিত হাসির পর্দাটা বোধ হয় একটু বেশী চড়ে গিয়েছিল। লাল-মুখ জেলর যাবার পথে একবার উঁকি মেরে দেখে গেলেন।

আসল প্রসঙ্গ থেকে অনেক দূর এসে পড়েছি। বলতে গিয়েছিলাম, সহদেব ঘোষ যেমন তার দুটো হাতের জোরেই গুরুদেবের পাচক সমস্যার সমাধান করে ছাড়ল, তেমনি বাকি যেটুকু, অর্থাৎ আতপ চাল, ঘি, কাঁচকলা এবং বৈকালিক ফলমূলাদির বন্দোবস্ত ঐ ছিয়ানব্বই ধারার জোরে আমি আর ডাক্তার সাহেব মিলে করে ফেললাম।

দুই

জেলে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে তা সে বিচারাধীন অবস্থাতেই হোক, কিংবা বিচার শেষ করেই হোক—প্রত্যেককে একখানা করে টিকিট দেওয়া হয়। তার নাম 'হিস্ট্রি টিকিট'। সেখানে তার সম্বন্ধে অনেক কিছু তথ্য থাকে, তার মধ্যে একটি হল বয়স। সেটি নির্ধারণ করেন জেল-ডাক্তার। কী নিয়মে করেন, অর্থাৎ ও-বিষয়ে কোনো ডাক্তারি ফরমূলা আছে, তা তাঁকে তাঁর নিজস্ব বিচার বিবেচনার উপর নির্ভর করতে হয়, আমার জানা নেই, তবে কাজটি যে দুরূহ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মনে পড়ছে, কোনো একটি জেলে যখন কয়েদীদের নালিশ শুনছিলাম, এক বুড়োকে দেখলাম ভীষণ উত্তেজিত। কী ব্যাপার?

সে তার নিজের টিকিট এবং পাশে যে দাঁড়িয়েছিল তার টিকিটখানা আমার হাতে দিয়ে বলল, বয়স দুটো একবার দেখুন।

দেখলাম।

কী আছে? ঝাঁঝিয়ে উঠল বুড়ো।

বললাম, একজনের দেখছি পঁচাত্তর, আরেকজনের পঁয়ষট্টি।

তার মানে, বলতে চান, আমার ছেলে আমার চেয়ে দশ বছরের ছোট!

ডাক্তারের দোষ নেই। চেহারায় দুজনেই প্রায় সমবয়সী। আমি হলে ব্যবধানটা আরো দু-বছর কম লিখতাম।

ব্রহ্মচারীর টিকিটে বয়সের কোঠায় লেখা রয়েছে পঞ্চাশ। ওটাই বোধহয় তাঁর প্রকৃত বয়স। কিন্তু প্রকৃতির বিরুদ্ধে সারাজীবন লড়াই করে (ডাক্তার সাহেবের মতে ব্রহ্মচর্যটা হচ্ছে—revolt against nature) এবং তার উপরে ঘন ঘন উপবাস ইত্যাদির দৌরাত্মে শরীরে আর পদার্থ ছিল না। পঞ্চাশকে পঁয়ষট্টি বললেও অত্যুক্তি হত না।

আহার সমস্যার সমাধানের পর ঐ নিয়ে আবার এক নতুন সমস্যা দেখা দিল। এ-হেন লোককে কী কাজ দেওয়া যায়? জজ সাহেব আদেশ দিয়েছেন rigorous imprisonment অর্থাৎ দণ্ডটা শুধু সশ্রম নয়, যে কোনো শ্রম থাকলেই চলবে না, "কঠোর" শ্রমের ব্যবস্থা করতে হবে। কী সেই শ্রম?

সশ্রম দণ্ডের আদেশ নিয়ে যারা আসে তাদের সঙ্গে তিন রকম labour বা শ্রমের ব্যবস্থা আছে জেলখানায়—Hard, medium, light—কঠিন, মাঝারি এবং হালকা। কে কোনটার উপযোগী, ঠিক করবার মালিক মেডিক্যাল অফিসার। তাঁর হয়ে ডাক্তার সেটা প্রতি টিকিটে লিখে দেন! ব্রহ্মচারীর টিকিটে লেখা হল—L অর্থাৎ light. জেলর ভাবনায় পড়লেন। তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীর জন্যে তাঁর হাতে যে কটি কাজ রয়েছে একেবারে হাতে গোণা যায়। তাদের কোনোটাই

ঠিক light নয়। ডাল ভাঙা, গম পেষা, ঘানি টানা, কোদাল চালানো কিংবা ঐ জাতীয় সবগুলোই অচল। মসলা পেষা, রুটি বেলা, জল তোলা, রাস্তা-ঘাট ঝাঁট দেওয়া এগুলোও ঠিক মানাবে না। হঠাৎ তাঁর মাথায় এল, লোকটা নিশ্চয়ই কিছুটা লেখা-পড়া জানে। সেই ধরনের কাজই একটা ঠিক করা হল। ব্রহ্মচারীর আখ্যা হল "Convict writer"—কয়েদী লেখক নয়, বলা যেতে পার কয়েদী-কেরাণী, সম্ভ্রান্ত ভাষায় বন্দী করণিক।

জেলের যারা বাসিন্দা অন্যান্য দিকে তাদের বিদ্যা-বুদ্ধি যতই থাক বেশীর ভাগই আক্ষরিক বিদ্যায় খাটো। তাদের চিঠিপত্র এবং হরেক রকম দরখাস্ত লিখে দেবার জন্যে ওদের মধ্যে থেকেই মুনসী বেছে নিতে হয়। ব্রহ্মচারীর ওপর পড়ল সেই ভার। কার হালের বলদ কেড়ে নিয়ে গেছে বাদীপক্ষের লোক, মেয়েদের ইজ্জত বাঁচানো দায় হয়েছে পাড়ার কোন গুণ্ডার হাত থেকে, খাজনার দায়ে কার বাস্তুভিটা নিলামে চড়েছে—এমনি ধারা যত অভিযোগ আসে আমার কাছে, প্রত্যেককে একখানা করে দরখাস্ত মঞ্জুর করি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বরাবর। সে সব শুধু দরদ দিয়ে নয়, তথ্য এবং যুক্তি দিয়ে লিখে দেন ব্রহ্মচারী।

আর একটা জিনিস তাঁকে লিখতে হয়। জেল-আপীল। সাজা হবার পর উকিল-মোক্তার লাগিয়ে ঊর্ধ্বতন আদালতে আপীল দায়ের করার সামর্থ বা সুবিধা যাদের নেই, তারা বিনা খরচায় জেল থেকে আপীল করতে পারে। রায়ের নকল পায় বিনা ফী-তে। সমস্ত নথিপত্র তন্নতন্ন করে মন দিয়ে পড়েন ব্রহ্মচারী। তারপর আপীলকারীর বক্তব্য শুনে নিয়ে বহু যত্ন এবং পরিশ্রম দিয়ে তৈরি হয় তার মুসাবিদা।

একদিন জেলা-জজ এলেন জেল পরিদর্শনে। কথা প্রসঙ্গে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার স্টাফে কি কোনো উকিল আছে?

উকিল!

হ্যাঁ। মানে, ওকালতি পাস, কিংবা আগে প্র্যাকটিস করত ?

কেন বলুন তো ?

জেল থেকে যে-সব আপীল যায়, সেগুলো লেখে কে ?

জেল-স্টাফের কেউ নয়, লেখে একজন সাধারণ কয়েদী।

কয়েদী ! বিস্মিত হলেন জজ-সাহেব।

বললাম, হ্যাঁ। তার ব্যবসা ছিল কথকতা আর গুরুগিরি, ওকালতি নয়। আপনিই পাঠিয়েছেন তাকে।

কী নাম বলুন তো ?

ব্রহ্মচারী সদানন্দ।

ও-হো, সেই লোকটা ? আপীল যা লেখে মশাই পাকা উকিলও পেরে উঠবে না। অথচ মজা দেখুন, নিজের মামলায় সে কোনো ডিফেন্স দেয় নি।

আপনার রায়ে পড়লাম সে-কথা।

আরও তাজ্জব ব্যাপার শুনুন, যা রায়ে লিখি নি। ওকে যখন জিজ্ঞেস করলাম, তুমি দোষী না নির্দোষ, জোড়-হাত করে বলল, প্রশ্নটা কি নিরর্থক নয়, ধর্মাবতার ? জানতে চাইলাম নিরর্থক কেন ? জবাব দিল, যদি বলি, দোষী, সে কথার উপর নির্ভর করেই তো আপনি আমাকে শাস্তি দিতে পারেন না, সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন হবে। আর যদি বলি, আমি নির্দোষ, তা হলেও আপনি আমাকে ছেড়ে দেবেন না। সেখানেও ওই সাক্ষ্য-প্রমাণ। তবে, আর এই অনাবশ্যক প্রশ্নের সার্থকতা কোথায় ?

বললাম, এই লোক যে পাকা উকিলের মতো আপীল লিখবে, তাতে আর আশ্চর্য কি !

কিন্তু ওকালতি জ্ঞানটা ওর নিজের কাজে লাগাতে চাইল না, এইটাই আশ্চর্য।

শুনেছি, অনেক বড় বড় শিষ্য আছে ওর। তারাও তো একজন উকিল লাগাতে পারত।

সে চেষ্টা তারা কম করে নি। কিন্তু আসামী ওকালতনামায় সই· না করলে, উকিল দাঁড়াবে কেমন করে? উকিল না দিক, নিজেও তো লড়তে পারত। সেদিক দিয়েও যায় নি। বাদীপক্ষের যা কিছু বক্তব্য সব আগাগোড়া শুনে গেছে। একটি কথাও বলে নি। অনেক মামলা করেছি মশাই, এ রকমটা কখনও দেখি নি।

এই পর্যন্ত এসে জজ-সাহেব কেমন গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, আপনাকে বলতে বাধা নেই, লোকটা সত্যিই দোষী কিনা, সে সম্বন্ধে মনে মনে আমি নিঃসন্দেহ হতে পারি নি। কোথাও কোনো রহস্য আছে নিশ্চয়ই, যা আড়ালেই রয়ে গেল। জুরির মনের কথাও বোধ হয় তাই। কিন্তু আমাদের রাস্তা একেবারে বাঁধা। এভিডেন্সের বাইরে এক চুল নড়বার উপায় নেই। সেখানে এমন কোনোও খুঁত পাওয়া যায় নি, যার ওপর দাঁড়িয়ে জুরির পক্ষে দোষী ছাড়া অন্য ভার্ডিক্ট দেওয়া চলে। আর ওঁদের সঙ্গে আমারও একমত না হবার কারণ ছিল না। যাক, এবার উঠি। কোর্টের সময় হল।

জুরি হবার সৌভাগ্য আমার কোনোদিন হয় নি। তবু রায় পড়ে আমারও ওই কথাই মনে হয়েছিল। কোথাও কোনো রহস্য রয়ে গেল যা ভেদ করা যায় নি।

বাদীপক্ষের কাহিনী সরল ও সংক্ষিপ্ত।

একটি কুড়ি-বাইশ বছরের মেয়ে একদিন সকালের দিকে কেঁদে পড়ল গিয়ে নবদ্বীপ থানার বড় দারোগার কাছে। তিনি জানতে চাইলেন, কি হয়েছে? মেয়েটি বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে, আর কিছুই বলতে চায় না। তার পর এল এক মোক্ষম পুলিসী ধমক, যার উত্তরে বলে উঠল, আমার ধম্মোনাশ করেছে কথক-ঠাকুর।

কোন্ কথক-ঠাকুর? জানতে চাইলেন বড়বাবু।

ওই মাঝের পাড়ার বেহ্মচারী।

দারোগা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন মেয়েটার মুখের দিকে। তারপর বললেন, কোথায় করল তোমার ধম্মোনাশ?

ওর বাড়িতে।

তুমি সেখানে কী করছিলে?

বাসন মাজতে গিয়েছিলাম।

কি নাম তোমার?

ময়না।

ঠিকে-ঝি, না দিন-রাতের?

ঝি নই আমি।

ঝি নও, তবে বাসন মাজতে গিয়েছিলে কেন?

উত্তর দিতে গিয়ে একটু বোধ হয় ইতস্তত করেছিল মেয়েটি। তারপর আর-এক ধমক খেয়ে খুলে বলল ঘটনার বিবরণ।

ব্রহ্মচারীর বরাবরকার ঝি পাঁচীর মা ওদেরই পাড়ার লোক। আগের দিন সন্ধ্যা থেকে জ্বরে পড়েছিল। সকালে আর কাজে বেরোতে পারে নি। অন্য সব বাড়ি, যেখানে সে কাজ করত, তাদের জন্যে বিশেষ ভাবনা ছিল না। তারা একরকম করে চালিয়ে নেবে। কিন্তু কথক-ঠাকুর একা মানুষ। সেই সকালে বেরিয়ে যায়, দেড়টা দুটোর আগে ফিরতে পারে না। তারপর নিজে হাতে দুটো চাল ফুটিয়ে খায়। বাসন দুখানা মাজা না পেলে বড্ড কষ্ট হবে বেচারার। ময়নার মা শুনে বললেন, তার জন্যে কী? ময়না গিয়ে মেজে দিয়ে আসুক না! একলা মানুষের ভারী তো বাসন!

কথক-ঠাকুরের বাড়ি চিনত ময়না। দরজা খোলাই ছিল। রান্নাঘর থেকে বাসন তুলে নিয়ে কুয়োতলায় বসে যতক্ষণ কাজ করছিল কারও কোনো সাড়া পাওয়া যায় নি। তারপর যখন হাত ধুয়ে চলে আসবে, ঠাকুর এসে দাঁড়াল তার সামনে। বললে, আমার শোবার ঘরটা একটু গুছিয়ে দিয়ে যাও না?

ঠাকুরের চোখের দিকে তাকিয়ে ভয় হল ময়নার। বলল, 'না,

আমি যাই। অনেক দেরি হয়ে গেছে! পা বাড়াতেই ওর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঠাকুর। বাঁ হাতে জাপটে ধরে ডান হাতে মুখ চেপে ধরল। তারপর টানতে টানতে নিয়ে গেল ঘরের মধ্যে।

মুখ ছেড়ে দিতেই চেঁচাতে যাচ্ছিল ময়না। কিন্তু গলা দিয়ে স্বর ফুটল না। ঠাকুরের হাতে ঝকঝক করছে মস্ত বড় কাটারি। চাপা গলায় বলল, নড়েছিস কি কেটে দু-টুকরো করে ফেলবো। তারপর দরজায় খিল তুলে দিল।

দারোগা জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর?

ময়না জবাব দিল না। বসে রইল মাটির দিকে মুখ করে।

কোথায় সে ঠাকুর?

কাপড়-গামছা নিয়ে চলে গেল গঙ্গার দিকে। আমিও অমনি ছুটে এলাম থানায়।

গঙ্গার দিকে! লাফিয়ে উঠলেন দারোগাবাবু। টুপিটা মাথায় চড়িয়ে একজন সিপাই নিয়ে বেড়িয়ে পড়লেন। সহকারীকে বলে গেলেন মেয়েটাকে আটকে রেখো।

ঘাটে পৌঁছেই নিরাশ হতে হল। একবুক জলে দাঁড়িয়ে সরবে গঙ্গার স্তব আবৃত্তি করছেন ব্রহ্মচারী।

টুপিটা খুলে অসহিষ্ণু হাতে চুলগুলো ধরে একবার টানলেন বড়বাবু। একটা কুৎসিত গালাগালি উচ্চারণ করলেন মেয়েটার উদ্দেশে—আসামী জলে নামবার আগে এজাহারটা দিতে পারল না!

আপাততঃ মনের ক্ষোভ মনে চেপে অপেক্ষা করতে লাগলেন, এবং ঘাট থেকে উপরে উঠতেই গ্রেপ্তার করা হল।

ব্রহ্মচারী কারণটা জানতে চাইলেন।

দারোগা বললেন, পরে জানানো হবে।

কোথায় যেতে হবে?

থানায়।

চলুন।

থানায় পৌঁছবার পর যখন জানতে পারলেন, তার বিরুদ্ধে অভিযোগটা কী, চকিত দৃষ্টিতে একবার বড়বাবুর মুখের পানে চাইলেন, তারপর তাকালেন সেই মেয়েটার দিকে, হা-না কোনো কথাই বললেন না।

প্রত্যক্ষদর্শী এ-জাতীয় মামলায় বড় একটা থাকে না। এ ক্ষেত্রেও ছিল না। কিন্তু পরোক্ষ সাক্ষ্যের অভাব হয় নি। ময়নাকে পরীক্ষা করেছিলেন যে সরকারী ডাক্তার, তাঁর রিপোর্ট তো ছিলই, তা ছাড়া মাতব্বর-গোছের দুজন পাড়ার লোক হলপ করে বলেছিলেন, মেয়েটা যখন কাঁদতে কাঁদতে থানার দিকে যাচ্ছিল, তখনই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তার মুখ থেকে তাঁরা সংগ্রহ করেছেন তার লাঞ্ছনার কাহিনী, আর তার সঙ্গে আসামীর নাম এবং পরিচয়। সঙ্গে সঙ্গে আসামীর খোঁজও তারা নিয়েছিলেন, কিন্তু তাকে পাওয়া যায় নি।

আর একজনের সাক্ষ্যে জানা গেল, স্নান করে ফেরবার পথে তিনি দেখতে পেলেন, কথক-ঠাকুর হনহন করে ছুটে চলেছে গঙ্গার দিকে। অনেক দিনের জানাশোনা, কিন্তু বার বার প্রশ্ন করেও তার গন্তব্য স্থান বা এত ব্যস্ত হবার কী কারণ সে সম্বন্ধে কোনো উত্তর পাওয়া যায় নি।

উত্তর দিয়েছিলেন সরকার পক্ষের উকিল। ঐ অবস্থায় জলে গিয়ে পড়াটাই যে আসামীর দিক থেকে একান্ত প্রয়োজন ছিল, সেটা তিনি স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন।

এই কটি তথ্যের উপর নির্ভর করে আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় কি না, বিচক্ষণ বিচারক সে প্রশ্ন এড়িয়ে যান নি। ময়নার মতো মেয়ের জীবন-নাট্যে অন্য কোনো নায়কের আবির্ভাব অসম্ভব ছিল না। কিন্তু তেমন যদি কেউ এসে থাকে তাকে নেপথ্যে সরিয়ে রেখে এই নিরীহ লোকটাকে বিনা কারণে টেনে আনবার কোনো যুক্তি খুঁজে পান নি। সাক্ষীদের অবিশ্বাস করবারও কোনো

হেতু ছিল না। তা ছাড়া, অভিযোগের উত্তরে অভিযুক্তের নির্বাক ঔদাসীন্য—তার মধ্যে রহস্য যতই থাক—জজ বা জুরিদের মনে অনুকুল আবহাওয়ার সৃষ্টি করে নি।

কিন্তু কী সে রহস্য, বিচারক যা ভেদ করতে পারেন নি, জুরিরা যার সন্ধান পান নি, তার সম্বন্ধে কৌতূহল আমার যতই থাক, সেটা মেটাবার পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা এই চেয়ার। আমার ও আমার বন্দীর মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। সে দূরত্ব ঘোচাতে পারি, এমন কোনো মন্ত্র আমার জানা নেই। সে যখন আমার সামনে আসে, তার চারিদিকে জড়িয়ে থাকে কয়েদীর খোলস। ভেতরের যে মানুষ, তাকে আমি পাই না। আমি যখন তার কাছে গিয়ে দাঁড়াই, সেও আমার নাগাল পায় না। যদি বা কেউ হাত বাড়ায়, সে হাতে ঠেকে শাসকের লৌহবর্ম।

আমার সাহিত্যিক বন্ধুদের বলতে শুনেছি, আমি তো প্লটের রাজা! অপরাধী মানুষের অন্তর্লোকে যেমন—'সাইকলজি'র ছড়াছড়ি তার বহির্জীবনেও তেমনিই গড়াগড়ি যাচ্ছে 'ড্রামাটিক সিচুয়েশন'। ট্যাপ করলেই রসের স্রোত! ধরে নিয়ে শুধু পরিবেশন করা। আমি প্রতিবাদ করি না, মনে মনে শুধু হাসি। স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে কবিরা নাকি বলেছেন, তাদের বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না। কিন্তু এই কয়েদী-জাতটার শুধু বুক নয়, মাথা ফাটিয়ে দিলেও যে মুখ ফোটে না, সে কথা যদি জানতেন আমার বন্ধুগণ।

সহদেব ঘোষের গায়ে যে খোলসটা ছিল, সেটা মাঝে মাঝে হঠাৎ খুলে পড়ত। ক্ষণেকের তরে বোধ হয় ভুলে যেত, সে জেলখানার লোক। এমনই একটা অসতর্ক মুহূর্তে একদিন চেপে ধরলাম : সেদিন যে বলেছিলে মিথ্যা মামলায় জেল খাটছে তোমার গুরু, তার প্রমাণ দাও।

হেসে ফেলল ঘোষের পো। সামনের দুটো দাঁত ভাঙা। বছর কয়েক আগে একটা মরা তালগাছ বাঁচাতে গিয়ে ওই দুটিকে বিসর্জন

দিতে হয়েছিল। সেজন্যে তার মনে কোনো ক্ষোভ নেই। গাছের মূল্য থাক বা না থাক, সেটা যে ওর পৈতৃক সম্পত্তি!

সেই ভাঙা দাঁতের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল গভীর বিস্ময়ঃ প্রমাণ! প্রমাণ আমি কোথায় পাব হুজুর?

তবে এতগুলো সাক্ষীর কথা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিচ্ছ কিসের জোরে?

জোর আমার কিছুই নেই ধর্মাবতার, মিথ্যাবাদীও কাউকে বলতে চাই না। আমার চোখ যা দেখে, মন যা বলে, তাই আমি জানি। আদালতে দাঁড়িয়ে কোন্ সাক্ষী কী বলল আর না বলল, তা দিয়ে আমার কিসের দরকার?

যে ব্যাপারে, মানে যে ঘটনায় জড়িয়ে ওঁর সাজা হল, তার সম্বন্ধে তুমি কিছু জান?

সহদেব দাঁতে জিভ কেটে বলল, না হুজুর। ওসব নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।

আমি হেসে ফেললামঃ কিছু না জেনেই, অতবড় একজন জজ বিচার করে যা স্থির করলেন, সেটা বলতে চাও ভুল?

আমার উচ্চাঙ্গের হাসি দেখে সহদেব যে কিছুমাত্র অপ্রতিভ হয়েছে, তার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। কয়েক মুহূর্ত চোখ বুজে থেকে হাত জোড় করে বলল, হুজুর, মুখ্যু মানুষ আমি, তায় জাতে গয়লা। গরিবের কথায় অপরাধ নেবেন না। আমার গুরুকে আমি দেখছি সেই জোয়ান বয়স থেকে। আর জজ-সাহেব তাঁকে দেখেছেন সবে দুটো দিন। নিজের চোখ দিয়ে নয়, অন্য লোকের চোখ দিয়ে। তবু তাঁরই কথা আমাকে মেনে নিতে হবে, আর আমি যা দেখলাম, যা পেলাম, সব ভুয়ো।

শিষ্যের মুখে এ-হেন যুক্তি শোনবার পর গুরুর মামলা-ঘটিত রহস্য-মোচনের সব আশায় জলাঞ্জলি দেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ রইল না। সে চেষ্টাও ছেড়ে দিলাম।

তিন

ব্রহ্মচারীর সঙ্গে আমার দেখা হত কদাচিৎ, তাও দূর থেকে এবং কথাবার্তা কদাচ নয়। তার কোনো উপলক্ষই ছিল না। জেল-সুপারের সঙ্গে একজন সাধারণ কয়েদীর যোগ-সূত্র মাত্র একটি - তার নাম "নালিশ"। জেলখানায় ঐ শব্দটির অর্থ অনেক ব্যাপক— অভিযোগ, আবেদন, ক্ষোভ প্রচার, ক্রোধ ইত্যাদি বিভিন্ন মনোবৃত্তির প্রকাশ। ব্রহ্মচারীর মনে হয় তো এর কোনোটারই উদয় হয় নি, হলেও আমার কাছে তাঁর অভিব্যক্তি ঘটে নি।

তার কাজও ছিল নেপথ্যে। অন্যান্য কয়েদীর মতো কোনো কার্যশালায় কর্মরত অবস্থায় তাকে দেখবার আমার সুযোগ ছিল না। নানা জায়গায় ঘুরে-ঘুরে নানা জনের কাছ থেকে দুটো অসংলগ্ন কথা শুনে এসে কোনখানে বসে সেগুলোকে এক একটি সুসংবদ্ধ রচনার রূপ দিয়ে আমার আপিসে পাঠাতেন, আমার জানা ছিল না। শুধু সেই গোটা-গোটা অক্ষরগুলোর সঙ্গে আমার নিত্য সাক্ষাৎ ঘটত, যখন তার নিচের দিকে রবার ষ্ট্যাম্প-চিহ্নিত একটি নির্দিষ্ট জায়গায় আমি দ্রুত বেগে আমার সইএর লাঙ্গল চালিয়ে যেতাম। বাইরে পাঠাবার জন্য ঐ সইটাই ছিল অত্যাবশ্যক। তার বেশী আর কিছু আমার তরফ থেকে প্রয়োজন ছিল না।

এই লেখাগুলোর একটা বড় অংশ যে জেল আপাল, সেটুকু আমার জানা ছিল। জজ সাহেব যেদিন সেগুলো সম্বন্ধে উদার কণ্ঠে তারিফ জানিয়ে গেলেন তারপর থেকে আমিও খানিকটা কৌতূহলী হলাম। সই করবার আগে মাঝে মাঝে একটু চোখ বুলিয়ে নেবার ইচ্ছা হত। তার ফলে বেশ খানিকটা কাজ বেড়ে গেল। চোখ বুলোতে গিয়ে দেখলাম, চোখ দুটো শেষ পর্যন্ত না গিয়ে থামে না,

এবং উপর উপর দেখে নিয়েও ছাড়তে চায় না, নিবিষ্ট হয়ে দেখতে চায়।

'কথক-ঠাকুরের' যে নতুন পরিচয় পেলাম তার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। আগে পরিচয় বাকী ছিল। হয়তো বাকীই থেকে যেত। যদি না সেদিন নিতান্ত অসময়ে অকস্মাৎ জেলখানায় আমার ডাক পড়ত। যে কারণে পড়ল সেটি একটি তাজ্জব ঘটনা। দুর্ঘটনাই বলা যেতে পারে, যদিও তার মধ্যে কৌতুক রসের অংশটা অল্প নয়।

অতএব অপ্রাসঙ্গিক হলেও সুরসিক পাঠক মহলের নেহাৎ অপছন্দ হবে না।

বৈশাখের মাঝামাঝি। বেলা প্রায় দেড়টা। কিছুক্ষণ হল হাজার লোকের ভোজনপর্ব নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হয়েছে। এখন চলছে মধ্যাহ্নিক বিরামের পালা। ওয়ার্কশপগুলো খালি। বড় বড় ব্যারাকে আরাম করছে কয়েদীরা। বেশীর ভাগই হাত-পা ছড়িয়ে গড়িয়ে নিচ্ছে খানিকক্ষণ। কোথাও কোথাও গোল হয়ে বসেছে দশ-পঁচিশের আসর। কারও বা ঝোলার ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে লুকিয়ে রাখা ময়লা তাসের প্যাকেট। একটা গোপন কোণ বেছে নিয়ে শুরু হয়েছে বিন্তি বা টোয়েনটি-নাইনের জুয়ো। কান রয়েছে বাইরে, ইয়ার্ডের পানে, কোন দিকে শোনা যায় টহলদার সিপাহীর ভারী বুটের আওয়াজ।

রুদ্র আকাশের অগ্নিবর্ষণ মাথায় নিয়ে টহল আর দিচ্ছে কে? পাগড়িটা খুলে বারান্দার কোণে কিংবা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে গেছে একটুখানি, কিংবা সুযোগ বুঝে বসেও নিচ্ছে কয়েক মিনিট। দুঃসাহস যাদের বেশী, তারা এরই মধ্যে দেওয়ালে কিংবা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছে পা দুটো। জানে না, কখন নেমে এসেছে অবাধ্য চোখের পাতা। কতক্ষণ আর? হঠাৎ কখন কানের কাছে ফেটে পড়বে শ্লেষতিক্ত ব্যাঘ্রগর্জন: "শো গিয়া"। চোখ খুলেই দেখতে পাবে জমাদারেব রক্তচক্ষু। ধড়মড়িয়ে উঠে বেল্ট আঁটতে

আঁটতে বলবে, নেহি হুজুর, জরাসে আঁখ লাগ দিয়া। জমাদারের দয়া হলে ওখানেই শেষ। নয়তো ডিউটি-অন্তে যেতে হবে ওয়ার্ডার-গার্ডের ডেপুটিবাবুর কাছে। একদফা শুনানীর পর অর্ডার-বুকে লেখা হবে রিপোর্ট: ডোজিং হোয়াইল অন ডিউটি। শাস্তির ডোজটা নির্ভর করবে দুটো জিনিসের উপর, দণ্ডিতের ম্যানার এবং দণ্ডদাতার মুড্।

বিশেষ একটি জায়গা আছে জেলখানায়, রৌদ্রদগ্ধ মধ্যাহ্ন ও যেখানে বিরামহীন কর্ম্মমুখর। সেটি হচ্ছে এই বিরাট গোষ্ঠীর অন্নসত্রের যজ্ঞশালা। ভোর চারটেয় তার আরম্ভ, বেলা চারটেয় আহুতি। পূর্ণাহুতি নয়, সাময়িক বিরতি মাত্র। রাবণের চিতার মতো অগ্নি সেখানে অনির্বাণ; কখনও ধিকিধিকি, কখনও দাউদাউ। মোটা লোহার পাত দিয়ে তৈরি একটি অতিকায় বাক্স, যার পোশাকী নাম কুকিং-রেঞ্জ, কয়েদীরা বলে—বাইলট। (কথাটা বোধ হয় বয়লারের কারা-সংস্করণ)। তার ডালার উপর সারি সারি গর্ত, ভেতরে জ্বলছে মোটা কাঁচা কয়লার চাঁই, ওপরে বসানো একটা করে প্রকাণ্ড পিপে-আকারের লোহার ডেক, তার ব্যাস চব্বিশ ইঞ্চি, দৈর্ঘ্য তিন ফুট। তার অর্ধেক অংশ ডুবে গেছে আগুনের মধ্যে, বাকী অর্ধেক জেগে আছে রেঞ্জের উপর। এক-একটা ডেকে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ সের করে চাল কিংবা ডাল অথবা মন দুই করে তরকারী চাপিয়ে দিয়ে দুদিক থেকে খুন্তিনামধারী পাঁচ হাত লম্বা লোহার ডাণ্ডা চালায় যেসব কয়েদী, তাদের বর্ণ বা পরিধির সঙ্গে ওই ডেক-গুলোর বিশেষ তফাৎ নেই।

তাদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছেন দুটি ব্যক্তি—কানায় লাগানো রাক্ষুসে কড়ার ভিতর দিয়ে প্রকাণ্ড বাঁশ চালিয়ে দিয়ে 'বাইলটের' দু-পাশে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ফুটন্ত ভাত-ভর্তি ডেকগুলো যারা অনায়াসে টেনে তোলে, তারপর জলে-ভেজা সিমেণ্টের মেঝের উপর দিয়ে বয়ে নিয়ে ঢেলে দেয় মাড়-নিকাশের

অতিকায় ছাঁকুনির মুখে। যাকে-তাকে দিয়ে এ কাজ চলে না। এর পেছনে চাই একদিকে যেমন অমিত গায়ের জোর, আর একদিকে তেমনই যত্নায়ত্ত কৌশল, এবং সকলের উপরে অবিচল সতর্কতা। কোনো একটার অভাব হলে যে বিপর্যয় ঘটে, তার নিদর্শন আমি নিজের চোখেই দেখেছি। একটা তো এই সেদিনের ঘটনা। হঠাৎ পা পিছলে ডেক উলটে দিয়ে সেই যে পড়ল লোকটা আর উঠল না। সহবন্দীরা স্ট্রেচারে করে ঝলসানো দেহটাকে পৌঁছে দিয়ে এল হাসপাতালে। তার পর ফিরে এল কপালের ঘাম মুছতে মুছতে। শুধু কি ঘাম? তার সঙ্গে বোধ হয় খানিকটা চোখের জল। সে কথা এখন থাক।

সেদিন অসময়ে টেলিফোন এল জেলবাবুর কাছ থেকে, ওই মানিক-জোড়ের এক মানিক হঠাৎ কি কারণে বাঁশ ফেলে দিয়ে গুদামের বারান্দায় গিয়ে সটান শুয়ে পড়েছে। জরুরী অবস্থায় কাজ চালাবার মতো দু-একজন যারা ছিল, সময় বুঝে কারও ঘাড়ে চেপেছে বাত, কারও বা হাঁটুতে নেমেছে রস। এদিকে চার ডেক ভাত ক্রমাগত খুন্তির ঘায়ে লেই হবার উপক্রম। খুন্তি থামালেই তলা থেকে উঠছে পোড়া গন্ধ।

খবর পেয়ে জেলর এসে লোকটাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, জানতে চেয়েছিলেন কী তার অভিযোগ। উত্তরে প্রথমে কিছুই বলতে চায় নি, অনেক পীড়াপীড়ির পর জানিয়েছে, 'বড়া সাব কো বোলেগা।' শাসন এবং তোষণ সমভাবে ব্যর্থ হবার পর, অন্য কোনো অশক্ত বা অনিচ্ছুক লোকের ঘাড়ে ডেক চাপানো বিপজ্জনক মনে করে, গত্যন্তর না দেখে তিনি আমাকে স্মরণ করেছেন।

রান্না মহলের বারান্দায় আসামীকে আমার সামনে হাজির করতেই নিখুঁত মিলিটারী কাদায় সেলাম করে বলল, নালিশ হ্যায় হুজুর।

সঙ্গে সঙ্গে বললাম, না। ওই ডেক যতক্ষণ না নামছে, ততক্ষণ কোনো নালিশ নেই।

একটু যেন থমকে গেল লোকটা। চোখ দেখে বুঝলাম, এ উত্তর সে আশা করে নি। মিনিট খানেক আমার দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল। তার পর সঙ্গীকে ইশারা করে কোণ থেকে এক ঝটকায় বাঁশটা তুলে নিয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল।

পর পর চারটা ডেক যখন নামানো হয়ে গেল, ডাকিয়ে এনে বললাম, বলো, কী তোমার নালিশ ?

গম্ভীর তাচ্ছিল্যের সুরে উত্তর এল, কুছ নেহি। বলেই, সরে গেল সামনে থেকে।

জেলখানার বড় সাহেব আমি। একটা সাধারণ কয়েদীর এই উদ্ধত আচরণে অবশ্যই অপরাধ নেবার কথা। না নেওয়াটাই বরং আমার পক্ষে অপরাধ বলেই গণ্য হত। তা জেনেও নিজেকে ঠিক তাতিয়ে তুলতে পারলাম না। ওই ছ-ফুট লম্বা শিশুটার মুখের দিকে চেয়ে মনে মনে হাসি পেল। বুঝলাম, এটা নিছক অভিমান। হয়তো কোনো বড় রকম প্রত্যাশা ছিল আমার কাছে, যা পায় নি। কিসের প্রত্যাশা ? আমি তার মনের কথাটা বুঝতে চাইব, প্রথমেই শুনতে চাইব, কী তার 'নালিশ'। সে তো জানে না, আমাকে আর একটা দিক দেখতে হয়, তার নাম জেল ডিসিপ্লিন। আমাদের কাছে, মানুষের সুখদুঃখের চেয়ে তার দাম বেশী।

তারই মহিমা বজায় রাখতে গিয়ে মনের হাসি মনে চেপে রেখে তখনই আবার তাকে ডাকিয়ে আনতে হল। আমার অনুচরবৃন্দ চারিদিকে যারা দাঁড়িয়েছিলেন—জেলর থেকে মেট পর্যন্ত, সকলেই রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিলেন। এবার নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

আসামী এসে দাঁড়াতেই কঠোর স্বরে বললাম, কী নাম তোমার ?

গুলাব সিং।

মিথ্যা কথা বলছে হুজুর। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানাল রন্ধন-শালার মেট, ওর আসল নাম নসরুল্লা।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাতেই মাথা নেড়ে বলল, জী, ওভি মেরা নাম হ্যায়।

সকলের মুখেই কিঞ্চিৎ চাপা হাসির দেখা দিল। জেলবাবু বললেন, একই সঙ্গে গুলাব সিং আর নসরুল্লা! কোন্ জাত তুমি?

উত্তরে যা শুনলাম, সে এক বিচিত্র ইতিহাস।

গুলাব সিং আসলে শিখ। বাড়ি ছিল পাঞ্জাবের কোন্ গ্রামে। ওর বয়স যখন তিন বছর, বাপ চলে গেল ফৌজে, আর ফিরল না। থাকবার মধ্যে ছিল শুধু মা। বছরখানেকের মধ্যে সেও চোখ বুজল। চার বছরের শিশুর আশ্রয় জুটল এক প্রতিবেশী মুসলমান-পরিবারে। সেইখানেই সে মানুষ, এবং তাদেরই দেওয়া নাম ওই নসরুল্লা।

আঠারো বছরে পড়তেই ফৌজে নাম লিখিয়ে বর্মা ফ্রণ্টে চলে গেল গুলাব সিং। লড়াই মিটে যাবার পর ঘরে ফিরে দেখল, তার আশ্রয়দাতাও ওপারে পাড়ি দিয়েছেন। সংসারে তার কোনো বন্ধন রইল না। দিন কয়েক এখানে ওখানে টহল দিয়ে রোজগারের খোঁজে চলে এল বাংলা মুলুকে। নকরিও জুটে গেল হুগলির এক চটকলে। কিছু দিন পরে পাশের বস্তির একটি মেয়ের সঙ্গে হল মন-জানাজানি, তাকে নিয়েই ঘর বাঁধল। কিন্তু সে ঘর তার টিকল না। শয়তানের নজর পড়ল ওর সুন্দরী বিবির উপর। আর সেও গোপনে সাড়া দিয়ে বসল।

সন্দেহের জ্বালা নিয়ে ছটফট করে দিন যায় নসরুল্লার। একদিন অসময়ে কাজ পালিয়ে ঘরে ফিরে যা দেখল, তার পর আর মাথা ঠিক রাখা সম্ভব হল না। পাশেই ছিল একটা নেপালী পরিবার। ছুটে গিয়ে তার ঘর থেকে নিয়ে এল ভোজালি।

এই পর্যন্ত এসে হঠাৎ থেমে গেল নসরুল্লা। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ দূরে একটা গাছের দিকে। আমারা রুদ্ধনিঃশ্বাসে অপেক্ষা করে রইলাম। তারপর চমকে উঠলাম।

হুনোকা কাট দিয়া। সহজ শান্ত সুরে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল নসরুল্লা।

চমকে উঠেছিলাম। 'কাট দিয়া' শুনে নয় (আমার রাজ্যে ওটা নতুন নয়, অসাধারণ বস্তুও নয়), যে ভাবে, যে নিরুত্তাপ ঔদাসিন্যে কথাটা আউড়ে গেল তাই দেখে। ভোজালির মুখে যেন উড়ে গেল দুটো হাঁস কিংবা মুরগির গলা।

হাকিমের কাছে সব কসুরই কবুল করেছিল গুলাব সিং। চরম দণ্ডের জন্যে তৈরিও ছিল মনে মনে। কিন্তু কোর্টের কী মরজি হল। দশ বছর জেল দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন জেলখানায়।

মাস খানেকের মধ্যে ছোট জেল থেকে চালান হয়ে এল বড় জেলে। ফৌজী চেহারা দেখে বড় জমাদার লাগিয়ে দিল চৌকোয়। তার পর থেকে ওই ডেক বয়ে-বয়ে কড়া পড়ে গেছে কাঁধের ওপর। তার জন্যে তার কোনো ক্ষোভ নেই। নোটিশ যা ছিল, তাও আর জানাতে চায় না।

বললাম, তোমার বিরুদ্ধে জেলের যে নালিশ, তার বিচার এখনও হয় নি।

উসকো বাস্তে হাম হাজির হায়, সাব। এ্যাটেনশন হয়ে তৎক্ষণাৎ জবাব দিল নসরুল্লা।

কতদিন ফৌজে ছিলে?

পাঁচ বরষ।

আজ এখানে যে কসুর তুমি করেছ, সে ঘটনা যদি ঘটত তোমার পল্টনের কুক-শেডে, বলতে পার কী হত সেই বাবুর্চীর?

কোর্ট মার্শাল।

তার পর?

গোলি। বলে, বুকের উপর আঙুল রাখল গুলাব সিং।

আর কিছু আমি বলতে চাই না। মনে রাখতে চেষ্টা কোরো, যেখানে আছ, এও তোমার সেই ফৌজ।

নসরুল্লা জবাব দিল না। তার সেই মিলিটারী স্যালুট ঠুকে নিঃশব্দে জানিয়ে দিল, সে কথা সে ভুলবে না।

গুলাব সিং মুখ ফুটে না বললেও তার নালিশের আসল বিষয়টা জানতে চেষ্টা করলাম। গোপন সূত্র থেকে কয়েকদিন পরেই সমস্ত ব্যাপারটা পাওয়া গেল।

ডেক-তোলা পল্টনের সৈন্যসংখ্যা ছিল তিন। বাকী দুজনের নিয়মিত ডিউটি বদল হতো। এ-বেলা যার খাটনি, ও-বেলা তার মাপ। কিন্তু নসরুল্লা ছিল কমন ফ্যাক্টর। ও-পাশে যেই থাকুক, এ পাশের বাঁশ পড়বে তার কাঁধে। তার কারণ, মেট নামক ব্যক্তিটিকে খুশি করবার যে সব আর্ট, সেগুলো সে আয়ত্ত করতে পারে নি, কিংবা ইচ্ছা করেই করে নি। এ সব দিকে খেয়ালও বিশেষ ছিল না। হঠাৎ সেদিন কি মনে করে আপত্তি জানিয়ে বলে বসল, সব কাম বাই নাম্বারসে হোনা চাইয়ে।

মেট এবং তার দলবল পল্টনিয়া বলে ওকে প্রায়ই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। বাই নাম্বার শুনে তারই মাত্রা গেল বেড়ে। মেজাজ চড়ে গেল নসরুল্লার। বাঁশ ফেলে দিয়ে বেরিয়ে গেল চৌকা থেকে। বাকী দুজন যারা ছিল, তাদের মধ্যে একটি মেটের ইঙ্গিতে 'পেটমে দরদ হুয়' বলে চলে গেল হাসপাতাল। একজন দিয়ে তো আর ডেক টানা চলে না। দেখা দিল, যাকে বলে গুরুতর পরিস্থিতি। একটা বাই নাম্বার থেকে এক হাজার লোকের অনশনের উপক্রম।

রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবার পর রন্ধনশালার দিকে যথোচিত নজর দিলেন কর্তৃপক্ষ। মেটকে যেতে হল 'চক্কর'-পাহারায়। অর্থাৎ, তার মেটগিরির এলাকা মানুষের ওপর থেকে সরে গেল দেওয়ালের ওপর। নির্জন পাঁচিলের একটা নির্দিষ্ট অংশে উদয়াস্ত টহল দেওয়া —ওইখান দিয়ে কেউ না পালায়। তার দুষ্টচক্রে আর যারা ছিল, তাদের কেউ গেল ডাল ভাঙতে, কারও হাতে উঠল তাঁতের মাকু

কিংবা বাগানের কোদাল। ডেকের লোক বাড়িয়ে দিতে নিয়মমত 'সুস্থি' বা বিশ্রামের ব্যবস্থা হল নসরুল্লার।

দিন চারেক পরে চৌকা-মহলে রাউণ্ডে গিয়ে দেখি বাঁশ হাতে দাঁড়িয়ে আছে গুলাব সিং। ঠিক সামনেই টগবগ করে ভাত ফুটছে, কখন তৈরি হবে তারই অপেক্ষায় সজাগ-দৃষ্টি। জিজ্ঞাসা করলাম, কী খবর গুলাব সিং? এবার বাই নাম্বারসে কাজ হচ্ছে তো?

সলজ্জ হাসির একটা ঝিলিক বিদ্যুৎচমকের মতো খেলে গেল তার মুখের ওপর। পরক্ষণেই গম্ভীর মিলিটারী কণ্ঠে সশ্রদ্ধ জবাবঃ জী সাব।

সেদিন গুলাব সিংয়ের মামলা মিটে যাবার পর সদলবলে আপিসের দিকে ফিরছিলাম। 'রাইটার'দের গুমটির কাছে আসতেই কানে গেল একটি পাঠরত উদাত্ত গম্ভীর স্বর ঃ

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ—
স্তমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥

ভগবদ্ গীতার সেই বহুশ্রুত অমর শ্লোক। কিন্তু এই পরিবেশে এমন করে কোনোদিন শুনি নি। আপনা হতেই যেন যতি পড়ল আমাদের সমবেত গতিচ্ছন্দে।

গীতা চণ্ডী কিংবা অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থ আবৃত্তিই ছিল ব্রহ্মচারীর অবসর যাপনের সঙ্গী। এ খবর আমি পেয়েছিলাম। কিন্তু সে আবৃত্তি যে এত মধুর, এমন স্বাচ্ছন্দ-সুরময়, তার আবেদন যে এত অনায়াসে অন্তরকে স্পর্শ করে, সেটুকু জানবার সুযোগ হয় নি। মিনিট কয়েক নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তার পর হঠাৎ খেয়াল হল, আমার পদমর্যাদা এবং অনুচরবৃন্দ-সহ এই মাঝপথে থেমে গিয়ে গীতাপাঠ-শ্রবণ —এ দুয়ের মধ্যে কোথায় যেন একটা অসংগতি রয়ে গেছে। অতএব ক্যারাভান সচল হল।

'সেল' ব্লক পেছনে ফেলে এক নম্বর বাগানের পাশ দিয়ে বড় সড়কে গিয়ে পড়লাম। গুমটি অদৃশ্য হয়ে গেল। স্তব্ধ মধ্যাহ্নের রৌদ্রক্লান্ত গাছপালার ভিতর দিয়ে তখনও ভেসে আসছিল বহুযত্নে অধীত সু-উচ্চারিত দেবভাষায় সুললিত ছন্দ —

অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্বং সমাপ্নোষি ততোহসি সর্বঃ।

বিশ্বরূপদর্শন যোগের এই শ্লোক কটি আমিও একদিন নিষ্ঠা এবং যত্নের সঙ্গে পাঠ করেছি। কিন্তু সে শুধু পাঠ এবং তার সঙ্গে কিঞ্চিৎ অর্থবোধ। শব্দ ও অর্থের বন্ধন অতিক্রম করে পঠিত বস্তু যে সমূর্ত ও সপ্রমাণ হয়ে উঠতে পারে, সে দৃশ্য আজ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলাম।

"হে অনন্তবীর্য, তুমি অমিতবিক্রমশালী। তুমি সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া আছ, অতএব তুমি সর্বস্বরূপ। তুমি ভিন্ন অন্য কিছুরই স্বতন্ত্র সত্তা নাই।"

প্রথম দিকে ব্রহ্মচারীর গীতার আসরে শ্রোতার সংখ্যা ছিল সামান্য। তার প্রিয় শিষ্য সহদেব ঘোষ এবং তারই দু-একটি বন্ধু। ক্রমশঃ পাঠচক্র বিস্তৃত হল, এবং কয়েক সপ্তাহ যেতেই দেখা গেল, রবিবারের মধ্যাহ্ন-সমাবেশে শ্রোতার দল রাইটারদের গুমটি ঘর ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সামনেকার আঙিনায়। বেলগাছের ছায়ায় ঠাসাঠাসি ভিড়। তারা এসেছে বিভিন্ন ইয়ার্ড থেকে, এবং এই বে-আইনী ব্যাপারে—জেলকোডে যার নাম 'ব্রেকিং ফাইল'—স্থানীয় আইন-রক্ষকদের বিশেষ কোনো কড়াকড়ি নেই।

ভিড়টা শুধু কয়েদীর নয়, কোণের দিকে সাদা পোশাকে বসে গেছে কোনো তিলকধারী দেশোয়ালী সিপাই কিংবা পঞ্চাশোর্ধ্ব জমাদার।

ব্যাপারটা সরকারীভাবে আমার গোচরে আনলেন সরকার-নিযুক্ত অবৈতনিক ধর্মশিক্ষক, সাপ্তাহিক আড়াই টাকা রাহাখরচের বিনিময়ে যিনি আমার পাপমগ্ন পোষ্যদের কানে কিঞ্চিৎ ধর্মোপদেশ দান করে

থাকেন। কয়েদীমহলে ধর্মের প্রতি ঔদাসীন্য যে ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে, সেজন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি কিঞ্চিৎ উষ্মার সঙ্গে বললেন, জঘন্য অপরাধ করে যে লোকটা জেল খাটতে এল, সে যদি ধর্মশিক্ষক হয়ে দাঁড়ায় —

কথাটা সম্পূর্ণ হল না। বাকিটুকু মুখে একটা শব্দ করে হাতের ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিলেন। পণ্ডিত মশায়ের ক্রোধ-সঞ্চারের কারণ ছিল। লোকসংখ্যা তাঁর ক্লাসে বরাবরই কম। সম্প্রতি সেটা দু-তিনজনে এসে ঠেকেছিল।

বিষয়টা যে গুরুতর, সবিনয়ে স্বীকার করে যথারীতি প্রতিকারের আশ্বাস দিলাম। কিন্তু তিনি বিশেষ আশ্বস্ত হলেন বলে মনে হল না। পরের সপ্তাহে তিনি এলেন না, তার বদলে এল তাঁর ছুটির দরখাস্ত।

ব্রহ্মচারীকে ডেকে পাঠিয়ে বললাম, শুনেছি, জেলে আসবার আগে আপনি নাকি কথকতা করতেন?

উত্তর এল সলজ্জ হাসির সঙ্গে, জীবিকার জন্যে লোকে অনেক কিছু করে। আমিও করতাম। তবে ওটা কথকতা নয়, কথা বেচা।

বললাম, এখানে অবিশ্যি সে সুবিধে নেই। কিছুদিন বিনামূল্যে চালাতে আপত্তি কী?

আমার ওপর আপনার অশেষ অনুগ্রহ! কিন্তু এ দায়িত্ব নেওয়া কি আমার পক্ষে উচিত হবে?

অনুচিত মনে করছেন কেন?

আমিও ওদের মতো কয়েদী? ওরা আমার কাছে আসবে কি?

গীতাপাঠ শুনতে তো আসে, দেখেছি।

ব্রহ্মচারী যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে বললেন, ওই পবিত্র গ্রন্থের ওপর যাদের শ্রদ্ধা আছে তারাই বোধ হয় আসে। পাঠটা এখানে নিতান্ত গৌণ।

বললাম, আমিও ঠিক তাই চাই, ব্রহ্মচারী ঠাকুর। ধর্মের

ওপর যদি কারও অন্তরের টান থাকে, তারাই এসে বসুক আমাদের এই রবিবারের ধর্মসভায়। যাদের নেই, কিংবা বক্তব্যের চেয়ে বক্তার নাম-ধামের দিকে যাদের নজর বেশী, তাদের টেনে এনে কী লাভ? আমার বিশ্বাস, জোর করে অনেক কিছু করা যায়, কিন্তু মানুষকে ধার্মিক বানানো যায় না।

ব্রহ্মচারী এ প্রসঙ্গের কোনো উত্তর দিলেন না। জোড়হাত করে বললেন, আমাকে কী আদেশ করছেন?

যা করতে বলছি, ঠিক আদেশের কোঠায় পড়ে না, বরং অনুরোধ বলতে পারেন। নতুন কিছু নয়। যা করছিলেন, ওটাই একটু ব্যাপকভাবে করতে হবে। অর্থাৎ রবিবারের আসরটা গুমটি-ঘরের সামনে থেকে তুলে নিয়ে যেতে হবে পাঁচ নম্বরের বারান্দায়। আর বক্তব্য বিষয়? সেটা আর আপনাকে কী বলব? সকলের না হলেও অনেকের যা মাথায় ঢোকে এবং মনটাও একটু ছুঁয়ে যায় এমনি ধারা কিছু একটা বেছে নিলেই হল।

আমার তরফে চেষ্টার কোনো ক্রটি হবে না। বলে, নমস্কার করে প্রস্থান করলেন ব্রহ্মচারী।

একটা রবিবার পেরিয়ে যাবার দু-তিন দিন পর মাতব্বরগোছের কয়েকজন কয়েদী জেলরবাবুর আপিসে এসে জানালেন, তাঁরা আমার দর্শনপ্রার্থী। প্রার্থনা মঞ্জুর হল। ওঁদের মধ্যে সবচেয়ে যিনি বিজ্ঞ, মুখপাত্ররূপে নিবেদন করলেন, বাইরে থেকে যে পণ্ডিতজী এসে থাকেন, তাঁকে আর কষ্ট দেবার প্রয়োজন নেই। এখন থেকে তাদের সাপ্তাহিক ধর্মোপদেশের ভারটা ব্রহ্মচারীর উপরেই ছেড়ে দেওয়া হোক। তাঁকে সমর্থন করলেন ডেপুটেশনের দ্বিতীয় মেম্বর, আমাদের গোশালার মেট, হাঁ হুজুর, ওই ব্যবস্থাই পাকা করে দিন। আহা! পাগলা ঠাকুরের গল্প যা শুনলাম, কেউ আর শুকনো চোখে উঠে যেতে পারে নি।

পাগলা ঠাকুরের গল্প!

পরমহংসদেবের কথা বলছে, স্মর—সস্নেহ হাসির সঙ্গে বললেন মুখপাত্র। তাঁরই লীলা-প্রসঙ্গ আলোচনা করছিলেন ব্রহ্মচারী।

হংস-টংস জানি না বাপু। একটু বিরক্তির সুরে মন্তব্য করলেন মেট, সোজাসুজি বুঝি আমাদের পাগলা ঠাকুর। বিছানার তলায় কোথায় দুটো পয়সা পড়ে আছে, তার জন্যে সারারাত ঘুম নেই, এক হাতে টাকা আর এক হাতে মাটি নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে—টাকা মাটি, মাটি টাকা, তারপর সবসুদ্ধ গঙ্গার জলে ছুঁড়ে ফেলে তবে নিশ্চিন্দি। এ কি যে-সে পাগল?

অথচ সেই টাকার জন্যে কী না হচ্ছে দুনিয়ায়!—দার্শনিক গাম্ভীর্যের সঙ্গে যোগ করলেন তৃতীয় ব্যক্তি, আমাদের দরজিশালায় পাহারা। টুপির চারদিকে লাল ফিতার বর্ডার দেখে বুঝলাম, তিনি একটি দায়মলি, অর্থাৎ খুনের অপরাধে যাবজ্জীবন দণ্ড নিয়ে এসেছেন জেলখানায়।

মেটের তখন রীতিমতো ভাব এসে গেছে। সেই আবেগের সুরেই বলে চললেন, অনেকটা আপন মনেঃ মাঘ মাসের কনকনে শীত। কোঁচার খুঁট ছাড়া দ্বিতীয় বস্তুটি নেই। রানীমা নিজে হাতে একখানা দামী শাল দিয়ে গেলেন। গায়ে দিয়ে কোথায় বাঁচবে, না, হাঁপ ধরে গেল ঠাকুরের। টান মেরে ফেলে দিয়ে প্রাণটা জুড়োয়।…কি সুন্দর করে বললে আমাদের ব্রহ্মচারী, মা যাকে দু-হাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে আছেন, শাল দিয়ে সে করবে কী? মাঘের শীত তার গায়ে লাগলে তো?

জেলখানার জনমত যাই হোক, একজন কয়েদীকে সরকারীভাবে তাদের ধর্মশিক্ষক নিযুক্ত করা যায় না। সে এক্তিয়ারও আমার নেই। রিলিজিয়াস টীচারদের নিয়োগকর্তা ডিভিশনাল কমিশনার। সে নিয়োগ ঘোষণা করে সরকারী গেজেটে। ব্রহ্মচারীর পক্ষে এ-হেন পদলাভ কোনোমতেই সম্ভব ছিল না। কিন্তু সপ্তাহান্তে পদহীন শিক্ষকের বেসরকারী আসন প্রায় স্থায়ীভাবেই তার দখলে এসে গেল।

আমাদের পণ্ডিতজী লোকটি সত্যিই পণ্ডিত। ধন এবং মান দুটো যেখানে ধরে রাখা সম্ভব নয়, বুদ্ধিমানের মতো 'অর্ধং ত্যজতি' সূত্র গ্রহণ করে প্রথমটা, অর্থাৎ মাসিক দশ টাকার মায়া ত্যাগ করলেন। ছুটি ফুরিয়ে যাবার পরেও প্রতি রবিবারে তাঁর 'কাজের চাপ' কিংবা 'শারীরিক অসুস্থতা' নিয়মিতভাবে দেখা দিতে লাগল, এবং আমার গোশালার মেট ও তার বন্ধুদের পাগলা ঠাকুরের গল্প শোনার কোনো বাধা রইল না।

চার

অনেক দিন আগে একটি ভ্রমণকারী ইংরেজ-দম্পতি আমার জেল দেখতে এসেছিলেন। কথায় কথায় মহিলাটি প্রশ্ন করলেন, যারা জেল খাটে, ডু-দে আর্ন এনিথিং ?

বললাম, না। ভদ্রলোক সহাস্যে প্রতিবাদ করলেন, হোয়াই, দে আর্ন দেয়ার ফ্রীডম !

ঠিকই বলেছিলেন ভদ্রলোক। আমার এই পান্থশালায় অনির্দিষ্ট বাস নিষিদ্ধ। নির্ধারিত কাল শেষ হলে সবাইকেই যেতে হয়। একটি করে দিন যায়, আর সেই মুক্তির দিনটি এক ধাপ করে এগিয়ে আসে। জেলখাটা মানেই মুক্তি-অর্জনের সাধনা। সে দিন কারও দ্রুত আসে, কারও বা বিলম্বে। ডোরাকাটা জাঙিয়া কুর্তা এঁটে, কোমরে গামছা জড়িয়ে দিনের পর দিন যাকে দেখে এসেছি মাকু চালাতে কিংবা লোহা পিটতে, হঠাৎ একদিন সকালবেলা আপিসে গিয়ে দেখলাম, সদ্য-কাচা ধুতি আর পাটভাঙা শার্ট পরে সে অ্যাটেনসন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমার টেবিলের ও-পাশটিতে।

খালাস-দপ্তরের ডেপুটিবাবু ওয়ারেণ্ট থেকে উচ্চকণ্ঠে মিলিয়ে নিলেন তার নাম-ধাম বিবরণ। তারপর তার প্রসারিত হাতের ওপর গুণে দিলেন খোরাকির পয়সা আর সেই সঙ্গে একখানা রেলের পাস।

সেলাম করো। শেষ হুঙ্কার দিলেন বড় জমাদার। শেষবারের মতো পালিত হল তাঁর অমোঘ আদেশ।

কেউ আবার সেলামের ঠিক ভঙ্গিটা এড়িয়ে গিয়ে মৃদু হেসে হাত দুখানা তুলল একবার কপালের কাছাকাছি। বোধ হয় জানাতে চাইল, এতদিন যে সম্পর্ক ছিল আমাদের মধ্যে—শাসক আর শাসিতের সম্পর্ক—আজ তার অবসান; তাই রেখে যাচ্ছে একটি সসঙ্কোচ নমস্কার, বিদায় বেলার শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শন।

এমনি ভাবেই একদিন দেখা হয়ে গেল সহদেব ঘোষের সঙ্গে। অ্যাটেনশন নয়, নত হয়ে জোড় হাত করে দাঁড়িয়ে ছিল আমার টেবিলের ও-পাশে খালাসী-কয়েদীর নির্দিষ্ট জায়গায়। বড় জমাদারের হুকুম শুনে না ঠুকল সেলাম, না জানাল নমস্কার। একেবারে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল, এবং সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল পা দুটো, যেমন করে ধরেছিল আর একদিন, আদায় করেছিল গুরু-সেবার অধিকার। সেদিনের অভিজ্ঞতার পর, আজ আর বাধা দেবার চেষ্টা করলাম না। খানিকক্ষণ পরে ও নিজেই উঠে বসল এবং চোখ মুছে বলল, আমার গুরুকে দেখবেন। আমার তো আর থাকবার উপায় নেই। ছেলেটা রইল, ওই দুটো ভাত ফুটিয়ে দেবে।

বললাম, বেশ, তাই হবে।

আর একটা ভিক্ষা চাইছি যাবার সময়। জানি, না বললেও আপনি করবেন। তবু মন মানে না। আপনার কলমে যতখানি আছে, মাপ দিয়ে গুরুকে আমার তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবেন।

কিন্তু আমার কলমের দাক্ষিণ্য পুরোপুরি বর্ষণ করবার আগেই হঠাৎ একদিন হুকুম এল স্ট্রাইক দি টেণ্ট। শুরু হল প্যাকিং।

ওখানকার মেয়াদ আমার শেষ হল। কিন্তু ব্রহ্মচারীর মেয়াদ তখনও বছর তিনেক বাকী। চার্জ দেবার আগের দিন সমস্ত কয়েদীর স্পেশাল 'ফাইলের' হুকুম দিলেন জেলরবাবু। শেষবারের মতো শুনতে হবে বাকী রইল কার কী নালিশ, অপূর্ণ রইল কার কোন্ আবেদন। শুনলাম, এবং যা শুনলাম, তার কতক মিটিয়ে আর বেশীর ভাগ মেটাবার বৃথা আশ্বাস দিয়ে আপিসে ফিরে এসেই ব্রহ্মচারীকে ডেকে পাঠালাম। সঙ্গের সিপাইটিকে ইঙ্গিতে সরিয়ে দিয়ে বললাম, কই, তুমি তো কিছুই চাইলে না ব্রহ্মচারী?

কুণ্ঠানত চোখ দুটো হঠাৎ একবার চমকে উঠে তাকাল আমার দিকে। তার কারণ বোধ হয় যাবার দিনে আমার এই প্রথম 'তুমি' সম্বোধন। আমার মুখে 'আপনি' শুনতেই সে অভ্যস্ত। এই কথাটির মধ্যে যে দূরত্ব আছে, তার জন্যে সদানন্দের মনে মনে একটা গোপন দুঃখ ছিল, যা কোনোদিন মুখ ফুটে না বললেও আমি টের পেয়েছি। তবু আমার রাজ্যে সে একক, সকলের চেয়ে স্বতন্ত্র, এই সুস্পষ্ট সত্যকে স্বীকৃতি দেবার জন্যেই বোধ হয় আমার মুখ থেকে আপনা হতেই 'আপনি' বেরিয়ে যেত। চলে যাবার ক্ষণে তেমনি আপনা হতেই আজ 'তুমি' বেরিয়ে গেল।

ব্রহ্মচারীর শীর্ণ মুখের উপর ফুটে উঠল একটি জোর করে টেনে-আনা ম্লান হাসি। আমার প্রশ্নের সরাসরি জবাব পেলাম না। তার বদলে এল একটি সনিঃশ্বাস স্বগতোক্তি—না চাইতেই যা পেয়েছি, সে শুধু আমার অন্তর্যামীই জানেন।

হয়তো তাই। দার্শনিক মানুষ। কী দেখেছে, কী পেয়েছে, সে-ই জানে, আর জানেন তার অন্তর্যামী। আমার অ-দার্শনিক সাদা চোখে তা পড়বার কথা নয়। আমি জানি, ওর জন্যে যা করব ভেবেছিলাম, তা করতে পারি নি। ভেবেছিলাম, আরও কিছুদিন গেলে বাকী মেয়াদটা মকুব করবার সুপারিশ জানিয়ে একটা প্রস্তাব পাঠাব সরকারের কাছে। কোন্ ভরসায় এবং কোন্ যুক্তিবলে এ

ইচ্ছা আমি মনে মনে পোষণ করেছিলাম, সেটা একটু বিশদভাবে বলা প্রয়োজন।

বিচারককে যে রাস্তায় চলতে হয়, তার পরিসর অতি সংকীর্ণ, চারদিকে প্রসিডিওর কোড এবং এভিডেন্স-অ্যাক্টের বেড়া দিয়ে ঘেরা। সেখানে হৃদয়বৃত্তির প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু সরকার নামক যে সর্বশক্তিমান যন্ত্র মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে, তার পথ অনেক প্রশস্ত। সেটাও আইনের প্লাস্টার দিয়ে গাঁথা কংক্রীট রোড, কিন্তু তার মাঝে মাঝে আছে নরম মাটির ফাঁক, কিংবা কোমল ঘাসের আস্তরণ।

আদালতের প্রধান লক্ষ্য অপরাধী নয়, তার অপরাধ। যে ব্যক্তিটি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে, সে লঘু না গুরু, সে প্রশ্ন অবান্তর। বিচার্য বিষয় তার কৃতকর্মের লঘুত্ব বা গুরুত্ব। বিচারককে অন্ধ বলা হয়। আসলে তিনি অন্ধ নন একচক্ষু। রেল-কোম্পানীর একমুখী লণ্ঠনের মতো তাঁর দৃষ্টিও শুধু একটি দিকে প্রসারিত—উপস্থাপিত অভিযোগের সঙ্গে অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্পর্ক কী এবং কতখান, সাক্ষ্যপ্রমাণের আলোয় তারই সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিশ্লেষণ। সম্পর্ক সাব্যস্ত হল কি না এবং কতটা সাব্যস্ত হল, একটুকু দেখেই তিনি নিশ্চিন্ত। পিছনে দাঁড়িয়ে যে বিচিত্র মন, যে দুর্জ্ঞেয় প্রেরণা, যে অবাঞ্ছিত জটিলতা ওই লোকটিকে টেনে নিয়ে গেছে ওই বিশেষ অপরাধের আওতার মধ্যে, বিচারশালার একদর্শী লণ্ঠনের সন্ধানী আলো সেখানে পৌঁছয় না।

কিন্তু সরকারের হাতে যে লণ্ঠন, সেটা চতুর্মুখ। অপরাধের যে চিত্র আদালতে উদ্ঘাটিত হল, তারই মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তার আলো ছড়িয়ে আছে ওই অপরাধী মানুষটার পেছনে, সামনে, ডাইনে বাঁয়ে। সে কোথায় ছিল, কোথায় এসেছে, কেন এল এবং ভবিষ্যতে কোথায় যাবে, সব দিকে দৃষ্টি রেখে রাষ্ট্রকে চলতে হয়।

বিচারক দণ্ড দিয়েই ক্ষান্ত। পরের অংশ অর্থাৎ দণ্ডিতের বোঝা পড়ল গিয়ে শাসকের ঘাড়ে। সে ভার বইতে গিয়ে তাকে তাকিয়ে

দেখতে হয় কাঠগড়া এবং কারাপ্রাচীরের বাইরে, খুঁজতে হয় অপরাধ নামক ওই বিশেষ কার্যটির অন্তরালে লুকিয়ে আছে কোন্ রহস্যময় গোপন শক্তি, কোন্ সামাজিক, পারিবারিক কিংবা পারিপার্শ্বিক ব্যাধির তাড়না। সেইখানেই শেষ নয়। সেই সঙ্গে দেখতে হয় তাদেরও, অপরাধী লোকটার চারিদিকে যারা ছড়িয়ে আছে কিংবা একদিন ছড়িয়ে ছিল।

তা ছাড়া যাকে আমরা ক্রিমিন্যাল বলি, তার সবখানিই তো ক্রিমিন্যাল নয়। জেলের মধ্যে তার যে পরিচয়, তার বাইরেও তার একটা সত্তা আছে, সেখানে সে বৃহত্তর সমাজের জীব, মানুষের দরবারে একাধারে দাতা এবং প্রার্থী। সমাজকে সে কিছু দিতে চায়, কিছু আবার পেতেও চায় তার হাত থেকে। সেই আদান-প্রদানের জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে দীর্ঘ অবরোধে যখন তার জীবন কাটে সেটা শুধু তার ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ক্ষতি নয়, সামাজিক অপচয়।

এই সব দিকে তাকিয়ে এবং এই কথা মনে রেখে, আদালত যে দণ্ডবিধান করেন, রাষ্ট্র তাকে অনড় ও অব্যয় বলে মেনে নিতে পারে না। মানবগোষ্ঠীর সর্বব্যাপী স্বার্থের দিকে চেয়ে আইনপ্রদত্ত অবরোধ বা কারাবন্ধনের কবল থেকে কোনো কোনো বন্দীকে ফিরিয়ে আনতে হয় তার ফেলে-যাওয়া বৃহত্তর জীবনের মধ্যে; প্রয়োগ করতে হয় দণ্ডিতের দণ্ড হ্রাস করবার বিশেষ ক্ষমতা। আইনের দাবি অলঙ্ঘ্য হলেও চূড়ান্ত নয়। তার কারণ, আইনের চেয়েও মানুষ বড়।

এই সূত্রে সুধীন ব্যানার্জি নামে একটি ছোকরা-কয়েদীর কথা এসে পড়ল। সেটুকু শেষ করেই আসল প্রসঙ্গে ফিরে আসব।

ঘন ঘন খানাতল্লাশ জেল-ডিসিপ্লিনের একটি প্রধান অঙ্গ। এমন অনেক জিনিস আছে, যেগুলো জেলের বাইরে নিতান্ত নির্দোষ, কিন্তু পাঁচিল পার হয়ে ভিতরে এলেই মারাত্মক। আপনার পকেটে

একখানা ছুরি বা হাতে একটুকরা দড়ি দেখলে আমি বিচলিত হব না। কিন্তু ওই দুটি তুচ্ছ বস্তু যখন বেরিয়ে আসে আমার কয়েদীর কম্বলের ভাঁজ কিংবা স্যাণ্ডালের সুকতলার তলা থেকে তখন আর আমি নির্বিকার থাকতে পারি না। নস্যের মতো নিরীহ দ্রব্য সংসারে আর কী আছে? মানুষের সমাজে সবচেয়ে যা নির্বিরোধ, যাদের আমরা বলি ব্রাহ্মণপণ্ডিত, তাদেরই ওটা নিত্যসহচর। পাত্রাধার তৈল কিংবা তৈলাধার পাত্র এই জাতীয় সূক্ষ্ম নৈয়ায়িক তর্কের সহজ মিমাংসার জন্যেই নস্যের প্রয়োজন, এই কথাই তো জানা ছিল। জেলখানায় এসে দেখলাম, নস্য নামক মহাবস্তুর আর এক মূর্তি, বড় বড় পণ্ডিতের কল্পনায় যা কোনোদিন আসে নি।

একদল ভারী-মেয়াদী দুর্দান্ত কয়েদী চালান হয়ে যাচ্ছিল এক জেল থেকে আর-এক জেলে। লোহার-জালে ঘেরা সুরক্ষিত প্রিজন-ভ্যান। চল্লিশ মাইল বেগে ছুটে চলেছে ফাঁকা মাঠের মধ্য দিয়ে। দুপাশে দুটি রাইফেলধারী সিপাই। হঠাৎ এক কয়েদীর দেহের কোনো গুপ্ত স্থান থেকে বেরিয়ে এল একটি সুদৃশ্য নস্যের ডিবা এবং তারই সুগন্ধিচূর্ণে আচ্ছন্ন হয়ে গেল দু জোড়া সতর্ক চক্ষু। চোখের পলকে একখানা ক্ষিপ্র হাত তাদেরই একজনের পকেট থেকে তুলে নিল চাবির গোছা। দরজা খুলতে লাগল কয়েক সেকেণ্ড। সিপাইদের হল্লা শুনে ড্রাইভার গাড়ির গতি কমিয়ে দিয়েছিল। খানিকটা গুঁড়ো চোখে পড়তেই পায়ের চাপ পড়ল ব্রেকের উপর। মিনিট কয়েক পরে তাকাবার মতো অবস্থা যখন ফিরে পেলেন সিপাইজীরা, দেখলেন, প্রিজন-ভ্যান শূন্য এবং ফাঁকা মাঠের এখানে ওখানে দু-চারজন নিরীহ গোপালক ছাড়া জনমানবের চিহ্ন নাই।

যথাসময়ে সার্চ বা তল্লাশি নামক অস্ত্রটি যদি সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করা হত, ওই ডিবাটি এতবড় একটা বিপর্যয় ঘটাতে পারত না। সুতরাং জেলকর্মীদের কর্মসুচীর একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে ওই সার্চ। যখন-তখন ছোট-বড় দল নিয়ে এখানে-ওখানে

হানা দিয়ে তারা খুঁজে বেড়ায়, জেল কোডের ভাষায় যার নাম prohibited article বা নিষিদ্ধ বস্তু। এই বিশাল গ্রন্থের একটা গোটা পাতা জুড়ে রয়েছে তার দীর্ঘ তালিকা। অস্ত্রশস্ত্র, দড়ি, বাঁশ, টাকাকড়ি, হরেক রকম নেশার উপকরণ—এ সব তো বটেই, তা ছাড়াও ওই দলে পড়ে বই, খাতা, চিঠিপত্র কিংবা অন্য কোনো জিনিস, তার পেছনে যদি না থাকে কর্তৃপক্ষের অনুমতি বা অনুমোদন।

এমনি এক সার্চ-পার্টি একদিন সুধীন ব্যানার্জির কম্বলের তলা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এল খান দুই চিঠি, যার উপরে না ছিল জেল-আফিসের রবার-স্ট্যাম্প, না পাওয়া গেল সুপারের স্বাক্ষর। মাল সমেত আসামীকে আমার দরবারে হাজির করা হল। তার সঙ্গে লিখিত অভিযোগ—ফাউণ্ড ইন পজেশন অফ্ আন্‌অথরাইজ্ লেটারস্। দুখানা চিঠিই ওর চিঠির উত্তরে লেখা। এসেছে ওর মায়ের কাছ থেকে, এবং কারা-প্রবাসী পুত্রের জন্যে মায়ের যে স্বাভাবিক ব্যাকুলতা তার বেশী, অর্থাৎ জেলের তরফ থেকে আপত্তি করবার মতো কিছুই নেই তার কোনোখানে। কাগজ দুখানা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কী করে এল এগুলো? কাকে দিয়ে আনলে?

অনুনয়ের সুরে উত্তর এল, অন্যায় করেছি স্যর। এবারটির মতো মাপ করুন।

আমার কথার জবাব দাও।

সুধীন ক্ষণেকের তরে আমার মুখের দিকে চেয়ে চোখ নামিয়ে বলল, এনেছে একজন সিপাই, কিন্তু তার কোনো দোষ নেই। আমিই তাকে আনতে বলেছিলাম।

তোমার চিঠিও বুঝি সে-ই নিয়ে গিয়েছিল?

মাথা নেড়ে সুধীন জানাল, হ্যাঁ।

বললাম, জেল থেকে চিঠি পাঠাবার নিয়ম কী, জানো?

জানি, আপিসে দিতে হয়।

তা না করে, গোপনে লোক দিয়ে পাঠালে কেন? কী ছিল চিঠিতে?

সুধীন নিরুত্তর। একটু জোর দিয়ে বললাম, বলো।

উত্তর এল মৃদু ভীরু কণ্ঠে, তার সঙ্গে জড়ানো অনেকখানি সঙ্কোচ ও লজ্জা—মা বড্ড কান্নাকাটি করছিল আসবার সময়।···আর কোনো দিন করব না স্যর।

চোখের কোণ বেয়ে দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি মুছে ফেলল।

আমার প্রশ্নের সোজাসুজি উত্তর পেলাম না। কিন্তু এটুকু বোঝা গেল, সে চিঠিতে যা ছিল সেটা বিশেষ কিছু না হলেও এমন কিছু, যা শুধু মায়ের কাছেই বলা যায়, সরকারী সেন্সরের স্থূল দৃষ্টির সামনে তুলে ধরা যায় না। অন্তত একটি পনেরো বছরের ছেলের পক্ষে তা অত্যন্ত কঠিন।

টিকিট উলটে দেখলাম, ৩০২ ধারার কেস। খুনের অপরাধে যাবজ্জীবন, অর্থাৎ কুড়ি বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন সেসন্স জজ। আপীলও না-মঞ্জুর হয়ে গেছে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলাম, খুন করেছিলে? অভ্যাসের বশে এ জাতীয় প্রশ্ন অনেককেই করে থাকি। উত্তরে 'না' শুনে শুনে কানও অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রেও তার পুনরুক্তির জন্য প্রস্তুত ছিলাম। বিস্মিত হলাম যখন কানে এল একটি মৃদু কিন্তু সুস্পষ্ট উত্তর: 'হ্যাঁ'।

মুখ থেকে আপনিই বেরিয়ে গেল, কাকে খুন করেছ?

দাদাকে।

দাদাকে! নিজের দাদা?

হ্যাঁ. সৎভাই।

কেন?

সুধীন উত্তর দিল না। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল, ঠিক পাশটিতে

দাঁড়িয়ে ছিল যে গার্ড তার মুখের দিকে। হাতের ইঙ্গিতে লোকটিকে সরিয়ে দিয়ে ওকে কাছে ডেকে নিলাম। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে দাঁড়াল আমার চেয়ারের হাতলের পাশে। কয়েক মিনিট তাকিয়ে রইল মুখের দিকে। তারপর হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল: আমার মায়ের অপমান সইতে পারি নি, স্যর।

শান্ত হবার সময় দিলাম। দ্বিতীয় প্রশ্নের আর প্রয়োজন হল না। দ্বিধাহীন সহজ সুরে সুধীন বলে গেল তার খুনের ইতিহাস, তা থেকে যে তথ্যটুকু সংগ্রহ কবা গেল, তাকে মোটামুটি রূপ দেবার চেষ্টা করছি।

সুধীনের মা ওর বাবার দ্বিতীয় পক্ষ। প্রথম স্ত্রী মারা যাবার পর বৃদ্ধবয়সে আবার যখন টোপর পরলেন ভদ্রলোক, তাঁর বড় ছেলের বয়স তখন বাইশ পেরিয়ে গেছে। অর্থাৎ নববধূর চেয়ে তিন-চার বছরের বড়। তা ছাড়া আরও চারটি ছেলে-মেয়ে। সবগুলোই নতুন মাকে বাইরে মেনে নিলেও মনে মনে সয়ে নিল না। বিশেষ করে তাঁর লক্ষ্মীপ্রতিমার মতো রূপ শুধু ওদের নয়, আত্মীয়স্বজন সকলের চক্ষুশূল হয়ে উঠল।

একবছর পরেই সুধীন এল তার কোলে, এবং তার বছর দুই পরে কর্তা হঠাৎ ওপারে যাত্রা করলেন। উইল একটা রেখে গিয়েছিলেন এবং তার মধ্যে মা ও ছেলের স্বচ্ছলভাবে চলার মতো ব্যবস্থাও ছিল। কিন্তু প্রথম পক্ষের ছেলেদের তরফে সেটাকে ভুয়ো প্রমাণ করবার জন্যে আদালতে মামলা দায়ের হল। তারপর যা হয়ে থাকে। নিম্ন আদালত থেকে উচ্চ আদালত এবং সেখান থেকে উচ্চতর আদালতে ঘুরে এসে বছর বারো পরে লড়াই যখন থামল, তার আগেই মামলার আসল লক্ষ্য, অর্থাৎ উইল-বর্ণিত বিষয়-আশয় তৃতীয় পক্ষের হাতে চলে গেছে এবং তার সঙ্গে গেছে বনেদী পরিবারের লোহার সিন্দুকের সঞ্চয়—নগদ টাকা-কড়ি এবং সোনা-দানা।

সুধীনের মামার বাড়ির অবস্থা ভালো ছিল না। ধন-জন দুয়েরই অভাব। বিপদের দিনে অসহায় বিধবাকে সাহায্য করবার জন্যে এগিয়ে এসেছিলেন একজন উকিল—ওর মায়ের দূর-সম্পর্কের কোনো জ্ঞাতি ভাই। যে হেতু সে ব্যক্তিটি বয়সে যুবক, ওদের দুজনকে যুক্ত করে নিত্য নতুন মুখরোচক কাহিনী পাড়ায় পাড়ায় ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সে সবগুলোর রচনা এবং প্রচারের প্রধান অংশে ছিল সুধীনের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও সাহায্যকারী তার ইয়ার-বন্ধুর দল। মামলায় হেরে যাবার পর ওই অস্ত্রটাকেই তারা সমস্ত শক্তি এবং উৎসাহ দিয়ে নির্লজ্জভাবে কাজে লাগাতে লাগল।

একদিন সন্ধ্যার পর কী একটা দরকারী কাজে সুধীনের সেই উকিল মামা তার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। কথা হচ্ছিল ভিতরের মহলে একটা বারান্দায়। এমন সময় হঠাৎ সেখানে বিমাতা-পুত্র এবং তার দলবল এসে হাজির। সুধীন ছিল তার পড়বার ঘরে। হৈ-হল্লা শুনে ছুটে এসে দেখল, দাদার দুটি বন্ধু তার মামাকে দু-দিক থেকে ধরে আছে, আর সবাই মিলে কুৎসিৎ চীৎকার করে যা বলতে চাইছে, তার অর্থ—এই মাত্র একটা অতি জঘন্য কাণ্ড তারা হাতে হাতে ধরে ফেলেছে। ও-তরফের সঙ্গে যুক্ত দু-একজন প্রতিবেশীও এসে পড়েছিলেন। তাঁর একজনের মন্তব্য শোনা গেল : দুটোকেই থানায় নিয়ে যাও। দঙ্গলের ভেতর থেকে মহাকলরবে উঠল তার সমর্থন।

সেই কদর্য দৃশ্যের একান্তে দু হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে নিঃশব্দে বসে আছেন তার মা। মনে হচ্ছিল যেন একখানা শ্বেতপাথরের মূর্তি। প্রবীণ প্রতিবেশীর প্রস্তাব শুনে নিশ্চল দেহটা যেন একবার নড়ে উঠল। সুধীনের দাদা তখন এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে মায়ের ঠিক সামনে। হাত-পা নেড়ে চীৎকার করে বলছে, কী হল ? গায়ে হাত দিতে হবে, না, নিজেই উঠবে ?

মায়ের কোনো সাড়া নেই। মাথাটা আরও নুয়ে পড়েছে মাটির

দিকে, জ্ঞান আছে কিনা বোঝবার উপায় নেই। কে একজন বলে উঠল, হাত ধরে টেনে তোল। যতসব নষ্টামি। সেই মতলবেই বোধ হয় আরও খানিকটা এগিয়ে আসছিল ওর দাদা। কিন্তু হাত বাড়াতে না বাড়াতেই গর্জে উঠল বন্দুক। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, যেখানে যা কিছু সব অন্ধকারে একাকার হয়ে গেছে।

কয়েকটা মুহূর্ত কেটে যাবার পর তার চেতনারাজ্যে আবার যখন আলো জ্বলে উঠল, সুধীন চোখ খুলে দেখল, বারান্দার উপর পড়ে আছে একটা নিশ্চল দেহ। কপালের একটা ধার থেকে গড়িয়ে পড়ছে রক্তের ধারা। সেইদিকে ভীতিবিহ্বল তীব্র দৃষ্টি মেলে তেমনই মূর্তির মতো চেয়ে আছেন তার মা। কানে গেল একটা ফিসফিস আওয়াজ ঃ 'এ কী করলি খোকা ?'

আঙিনায় জনমানবের চিহ্নমাত্র নেই।

সকলের অলক্ষ্যে কখন যে সে নিঃশব্দে সরে গিয়েছিল, মায়ের ঘরের আলমারির ভিতর থেকে তুলে এনেছিল গুলিভরা বন্দুক, কিছুই আর তার মনে পড়ে না।

আপনি বলুন তো স্যর, অন্যায় করেছি আমি ? উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল সুধীন।

খানিকটা বোধ হয় তন্ময় হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ যেন ধাক্কা খেয়ে আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। চেয়ে দেখলাম, সরল নিষ্পাপ দুটি কিশোর চোখ সাগ্রহ প্রশ্ন তুলে তাকিয়ে আছে আমার মুখের পানে। নরহন্তা জানতে চাইছে, সে অন্যায় করেছে কি না! তবু সহজ উত্তরটা আমার জিভে এসে আটকে গেল।

হ্যাঁ, একটা অন্যায় আমি করেছি।—এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল সুধীন, কিন্তু সে শুধু মার কথায়। আমার মাকে তো আপনি দেখেন নি, স্যর। দেখলে বুঝতেন, তাঁর চোখের দিকে একবার তাকালে কিছুতেই 'না' বলা যায় না।

জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম, কী সে অন্যায় ? তার আগেই

জবাব পাওয়া গেল—কোর্টে দাঁড়িয়ে কতগুলো মিথ্যে বলে এলাম। ইচ্ছে করে, মারব বলেই মেরেছি—এ কথা কিছুতেই বলতে দিলে না মা। বলতে হল, উকিলদের বানানো কথা—বন্দুক নিয়ে এসেছিলাম লোকগুলোকে ভয় দেখাতে। দাদা ছুটে এসে হাত চেপে ধরল, বন্দুকটা কেড়ে নিতে চাইল। আমি ছাড়তে চাই নি। ধস্তাধস্তির সময় কখন গুলি ছুটে গেছে, আমি জানি না। যখন বলি, হাকিম আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। একবার ইচ্ছে হল বলে দিই এসব মিথ্যা কথা, দাদাকে খুন করেছি আমি। বলতেও যাচ্ছিলাম। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, মার সেই চোখ দুটো, আর বলতে পারলুম না। কিন্তু জজ সাহেব বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন, সব বানিয়ে বলছি। তাই এত চেষ্টা করেও মা আমাকে ছাড়িয়ে নিতে পারল না।

মিনিট কয়েক বিরতির পর আবার শুনতে পেলাম, সুধীন বলছে, তার জন্যে আমার মনে কোনো কষ্ট নেই, স্যর। খুন করেছি তার শাস্তি তো পেতেই হবে। কিন্তু যখন মনে পড়ে, কুড়ি বছর পরে ফিরে গিয়ে মাকে আর দেখতে পাব না, মাথাটা একদম খারাপ হয়ে যায়।

শুষ্ক সান্ত্বনার সুরে বললাম, কেন, দেখতে পাবে না কেন?

মা কিছুতেই বাঁচবে না অতদিন।

চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। এবার আর মুছে ফেলবার চেষ্টা করল না। কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর বললাম, মাকে লিখে দাও, মাঝে মাঝে এসে তোমাকে দেখে যাবেন

তা হয় না, স্যর। বড্ড সেকেলে বনেদী ঘর আমাদের। মেয়েরা জেলখানায় আসতে পারে না। না আসাই ভালো। আমার এই পোশাক মা সইতে পারবে না।

খুনের অপরাধে এই ষোলো বছরের ছেলেটাকে যাবজ্জীবন দণ্ড দিয়ে বিচক্ষণ বিচারক তাঁর আইন-প্রদত্ত কর্তব্য পালন করেছিলেন।

তার উপরে ছিল মহামান্য হাইকোর্টের সমর্থন। বিচারে নিশ্চয়ই কোনো খুঁত ছিল না। তবু সেদিন মনে হয়েছিল, এইটাই কি শেষ কথা? এর পরে আর কিছু নেই? সুধীন ব্যানার্জি খুনী। সমাজের কাছে, রাষ্ট্রের কাছে, দুনিয়ার মানুষের কাছে এই কি তার একমাত্র পরিচয়? তার বাইরে সে আর কিছু নয়? কোনোদিন কিছু ছিল না, কোনোদিন কিছু হতেও পারবে না।

মনে হয়েছিল যে যাই বলুক, আইনের এই সূক্ষ্ম চোখটাই সর্বব্যাপী নয়। মানুষকে দেখবার চেনবার আরও অনেক চোখ আছে, অনেক দিক থেকে দৃষ্টি ফেললে তবে তার পূর্ণ রূপ ধরা পড়ে। মানবসমাজের পক্ষ থেকে দৃষ্টিপাতের দায়িত্ব সরকারের। হয়তো এই রকম একটা মনোভাব থেকেই একদিন সুধীনকে ডেকে বলেছিলাম, মাকে লিখে দাও লাটসাহেবের কাছে দরখাস্ত করতে।

কিসের জন্যে স্যর?

তোমার খালাসের জন্যে।

সুধীন হাসল। একটুখানি ম্লান হাসি। তারপর বললে, আপনি ভাবছেন, এসব কথা তাকে মনে করিয়ে দিতে হয়। কোনো দিকে কোনো চেষ্টাই বাকী রাখে নি মা। লাটসাহেবের কাছেও পিটিশন করতে চেয়েছিল। কিন্তু উকিল-মামা বড় বড় উকিলদের সঙ্গে পরামর্শ করে এসে বললেন, এখনও তার সময় হয় নি। আরও কিছুদিন না গেলে কোনো ফল হবে না।

হয়তো সেই কিছুদিন অপেক্ষা করেই আবেদন পাঠিয়েছিলেন উকিলবাবুরা এবং যথাসময়ে তার ফলও দেখা দিয়েছিল। কারাবাসের আড়াই বছর পূর্ণ হলে ফৌজদারী কার্যবিধির ৪০১ ধারা প্রয়োগ করে বাকী অংশটা মকুব করবার আদেশ দিয়েছিলেন প্রাদেশিক সরকার। আদেশ দেবার আগে যথারীতি তার চরিত্র এবং চালচলন সম্বন্ধে একটা রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছিলেন, এবং আমরা যে তার পূর্ণ সুযোগ নিয়েছিলাম সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

সুধীন ব্যানার্জির সঙ্গে ব্রহ্মচারীর কোথাও কোনো মিল নেই। অমিলের অংশটাই বরং অতিমাত্রায় ব্যাপক এবং গভীর। প্রথম জন হত্যা করেছিল মানুষ, দ্বিতীয় জন মনুষ্যত্ব। নরঘাতক একদিন ক্ষমা পেলেও পেতে পারে, কিন্তু নারীধর্ষকের মার্জনা নেই। সুধীনের তরফ থেকে মানবতার দুয়ারে আবেদন করবার অবসর ছিল। সংবেদনশীল মানবসমাজের পক্ষে সরকার সে আবেদন গ্রহণও করেছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মচারীর বেলায় সে অবকাশ কোথায়? সংসারের কাছে রোষ এবং ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই তার প্রাপ্য নেই। তবু যে সরকারী দাক্ষিণ্য লাভের জন্য সুপারিশ পাঠাবার কথা আমার মনে হয়েছিল, তার কারণ আমিও স্পষ্ট করে জানি না। হয়তো মনে করেছিলাম, জঘন্য অপরাধে দণ্ডিত এই সদানন্দের মধ্যে আর-একটা যে মানুষ আছে, যার পরিচয় আমি পেয়েছি, পেয়েছে আমার জেলখানার লোক, তাকে যদি দীর্ঘকাল ধরে এই পাঁচিলের আড়ালে পঙ্গু করে ফেলে রাখা হয়, তাতে কারও কোনো লাভ নেই। তার চেয়েও বড় কারণ, কোন্ যুক্তিবলে জানি না, আমার মনের কোণে একটা বিশ্বাস ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, ব্রহ্মচারী নির্দোষ। যে অপরাধের দণ্ড সে ভোগ করছে, সেটা সে করে নি, করতে পারে না। সেদিন বিদায়-মুহূর্তে ব্রহ্মচারীর সেই স্বগত উক্তির উত্তরে আমার এই যুক্তিহীন বিশ্বাসটাই বাইরে বেরিয়ে এল। বললাম, কী পেয়েছ, তা তুমিই জান। আমি তো জানি, কিছুই দিই নি, দিতে পারি নি। যা হয়তো পারতাম, মনে মনে যা ভেবে রেখেছিলাম, সেটুকুও শেষ পর্যন্ত করে উঠতে পারি নি। চক্রান্তের জালে জড়িয়ে একটা নির্দোষ মানুষ জেলে পচতে থাকল, আর—

হঠাৎ কেমন যেন বিচলিত হয়ে পড়ল ব্রহ্মচারী। চকিতে একবার আমার দিকে চেয়ে কথাটা শেষ করবার আগেই বলে উঠল, নির্দোষ! না-না, নির্দোষ আমি নই।

নির্দোষ নও! যন্ত্রচালিতের মতো আবৃত্তি করে গেলাম।

ব্রহ্মচারী সে প্রশ্নের আর জবাব দিল না। মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইল।

জীবনে অনেক কারণে অনেক আঘাত পেয়েছি। কিন্তু সেইদিন যা পেয়েছিলাম, আজও বোধহয় কাটিয়ে উঠতে পারি নি।

পাঁচ

জেলখানার লোক আমি। আমার সঙ্গে আমার বন্দীদের সম্পর্ক, যতক্ষণ তারা থাকে আমার পাঁচিলের মধ্যে। বাইরে এলে তাদের আলাদা রূপ। সেখানে তারা আমার কেউ নয়, আমিও তাদের কেউ নই। সুতরাং ব্রহ্মচারী-উপাখ্যান এইখানেই শেষ হবে, এইটাই ছিল সঙ্গত এবং স্বাভাবিক। কিন্তু হল না। বছর তিনেক পরে, আমার মনের কোণ থেকে যখন প্রায় নিঃশেষে মিলিয়ে গেছে, হঠাৎ আমার গৃহকোণে তার দেখা পেলাম। শুধু দেখা নয়, তার সঙ্গে পেলাম তার প্রমাণিত অপরাধ এবং তারও পূর্বেকার সুদীর্ঘ কাহিনী। এই কথাগুলো শোনাবার জন্যেই খালাস হবার অনেক দিন পরে আমার নতুন কর্মস্থলে তার আকস্মিক আবির্ভাব। কুশল-প্রশ্নাদির পর বলল, জেলে থাকতেই বলতে পারতাম। অনেক দিন বলবার আকাঙ্ক্ষাও যে না হয়েছে, তা নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে নিরস্ত করেছি।

বললাম, কেন ?

একটু ইতস্তত করে উত্তর দিল ব্রহ্মচারী, আপনার দয়ার ওপর নতুন করে আর এক দফা অত্যাচার করতে মন সায় দেয় নি।

. কথাটা এক রকম করে বুঝলাম। পাছে আমার মনে হয়, সত্য কাহিনী বলবার ছলে এ শুধু নিজের অপরাধ ঢেকে রেখে সুবিধা বা অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা, তাই নিজের সম্বন্ধে সে আগাগোড়া মৌন থেকে গেছে। আজ আর সে আমার কয়েদী নয়। তাকে দেবার মতো অনুগ্রহ বা নিগ্রহ কোনোটাই আমার হাতে নেই। তাই বলবার যে বাধা ছিল, তাও চলে গেছে।

কিন্তু সে কাহিনীর পুনরুক্তি করতে গিয়ে আমি যে মস্ত বড় বাধায় এসে ঠেকলাম! সেটা হচ্ছে তার ভাষা। সুনির্বাচিত সংস্কৃত শব্দের পরিমিত প্রয়োগ ব্রহ্মচারীর প্রতিটি বাক্যকে যে মার্জিত এবং মধুর রূপ দান করে থাকে, তার সামান্য অংশ আয়ত্ত করতেই আমার জীবন কেটে যাবে। তা হলে তো আর এ কাহিনী বলা চলে না। তাই নিরুপায় হয়ে এবং আপনাদের অনুমতি নিয়ে আমার এই জেলের তৈরি অন্ত্যজ ভাষাতেই শুরু করে দিলাম।

যে বংশে ব্রহ্মচারীর জন্ম, গুরুগিরি ও পৌরোহিত্যই তাদের কৌলিক পেশা। তার বাবা হৃষীকেশ আচার্য পর্যন্ত এই কুলধারা অব্যাহত ছিল। যজন, যাজন, অধ্যাপনা—এই ত্রিবিধ বৃত্তির অন্তত দ্বিতীয়টি তিনি সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু পুত্রদের আমলে এসে কোনোটাই আর বজায় রইল না। প্রথম পুত্র মোক্তারি পাস করে শহরে গিয়ে পসার জমিয়ে বসল। দ্বিতীয়টিও শহরের কোনো বড় রাস্তার মোড়ে সাজিয়ে বসল মনিহারী দোকান। তৃতীয় এবং কনিষ্ঠ এই সদানন্দ তখন গ্রামের ইস্কুলে উপরদিকের ছাত্র। হেডমাষ্টার মুক্তকণ্ঠে তার ইংরেজী-জ্ঞানের প্রশংসা করেন। তাই শুনে গোপনে নিশ্বাস ফেলেন হৃষীকেশ। ছেলেদের সম্বন্ধে বাবার মনের এই অনুক্ত ক্ষোভটুকু সদানন্দের কাছে লুকানো ছিল না। নিজের অবর্তমানে গৃহদেবতা নারায়ণ-শিলার ভবিষ্যৎ ভেবে

তিনি যে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন, তাঁর মুখের দিকে চেয়ে এটাও সে এক রকম করে বুঝতে পেরেছিল।

হঠাৎ একদিন দেখা গেল, তার আলজেব্রা এবং গ্রামারের আড়ালে একখানা নতুন বইয়ের আমদানি হয়েছে। তার নাম নিত্য-পূজা-পদ্ধতি। একটা ছুটির দিনের দুপুরবেলা সদ্য নিদ্রাভঙ্গের পর বড় বউঠাকুরানী যাচ্ছিলেন তার ঘরের পাশ দিয়ে। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। বন্ধ দরজার আড়াল থেকে ভেসে আসছিল অনুচ্চ কণ্ঠের গুঞ্জরণ – খর্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্র-বদনং লম্বোদরং প্রস্যন্দন-মদগন্ধলুব্ধ-মধুপব্যালোল গণ্ডস্থলং···। বামাকণ্ঠের হাসির শব্দে থেমে গেল গণেশের ধ্যান। দরজার এ পাশ থেকেই পরিহাসতরল কণ্ঠে বললেন বউদিদি, সাবাস! তুমিই দেখছি বংশের ধারা বজায় রাখবে ঠাকুরপো। যাই, নাপিত ডেকে পাঠাই। সামনের চুলটা কদমছাঁট করে পেছনে বেশ মোটা একটা—কী যেন বলে?

গড়িয়ে পড়ল হাসির ফুয়ারা। সদানন্দের কাছ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। কিন্তু বউঠাকুরানীর অপেক্ষায় না থেকে সে নিজেই নাপিত ডেকে পাঠাল, এবং চুল ছাঁটবার পর পিছন দিকের পুষ্ট শিখাটি কারও নজর এড়াল না। তার পরদিন সকাল সকাল পড়া শেষ করে স্নান সেরে ওই বইখানাকে নিয়েই ঢুকল গিয়ে ঠাকুর-ঘরে।

দৈনন্দিন রুটিন মতো হৃষীকেশ নদীতে স্নান সেরে কমণ্ডলু হাতে গঙ্গাস্তব পাঠ করতে করতে ফিরছিলেন। বাড়ি ঢুকতেই কানে গেল ঘণ্টার শব্দ। ঠাকুর-ঘরের সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। নিষ্পলক চক্ষে দেখতে লাগলেন, কিশোর পূজারীর সেই অপটু হাতের দেব পূজার প্রয়াস।

সদানন্দের চোখে পড়ল, বৃদ্ধ পিতার উপবাস-ক্লিষ্ট শীর্ণ মুখখানা হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কী যেন বলতে গিয়ে নিজেকে সংবরণ করলেন হৃষীকেশ। তারপর সহজ সুরে বললেন, আজ ইস্কুল নেই তোর?

পূজোটা সেরে নিয়েই যাব। লজ্জিত মৃদু সুরে উত্তর করল সদানন্দ, মুদ্রাটা কিছুতেই ঠিক হচ্ছে না, একটু দেখিয়ে দেবেন ?

সেইদিন থেকে কুলবিগ্রহের নিত্যপূজার ভার নিল বালক সদানন্দ। দাদাদের তর্জন, বউদিদের পরিহাস, সহপাঠীদের বিদ্রূপ, কিছুই তাকে নিরস্ত করতে পারল না। প্রথম দিকে ত্রুটি-বিচ্যুতি যেটুকু ছিল, পিতার সাহায্যে দু-দিনেই কাটিয়ে উঠল। একটু একটু করে অন্যান্য পূজা-প্রণালীও যত্ন করে শেখালেন হৃষীকেশ। ইস্কুলে যাওয়া বন্ধ হল না, কিন্তু পড়াশুনায় আগের মতো অখণ্ড মনোযোগ বজায় রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়াল।

হৃষীকেশকেও অনেক অনুযোগ শুনতে হল ছেলেদের কাছে। স্বর্গতা জননীর উল্লেখ করে মোক্তারবাবু বললেন, মা বেঁচে থাকলে কি তাঁর কোলের ছেলেটার ভবিষ্যৎ এমন করে নষ্ট করতে পারতেন আপনি ?

হৃষীকেশ প্রথমটা চমকে উঠলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, নষ্ট কাকে বলছ ?

ছেলের মেজাজ ফেটে পড়ল, পুরুতগিরি করতে গিয়ে লেখাপড়া যে গোল্লায় গেল, দেখতে পাচ্ছেন না ?

হৃষীকেশ ধীরভাবেই বললেন, ওর দাদারা যদি লেখাপড়া করেও গোল্লায় গিয়ে থাকে, ও না হয় না করেই যাবে।

বছর দুই পরে সদানন্দের ইস্কুলের পড়া শেষ হল। পাস করে গেল ভালোভাবেই। জলপানির আশা করেছিলেন হেডমাস্টার। তা আর হল না।

কিছুদিন থেকে ব্যাধি আর বার্ধক্যের ছাপে হৃষীকেশ প্রায় অচল হয়ে পড়েছিলেন। যজমান-বাড়ির ক্রিয়াকর্মে প্রায়ই গিয়ে উঠতে পারতেন না। সে দায়টাও এসে পড়েছিল সদানন্দের ঘাড়ে। পরীক্ষার ফল বের হবার কয়েকদিন পরে তার ভবিষ্যতের ভাবনা যখন নতুন করে দেখা দিয়েছে সমস্ত পরিবারের মনে, এমনি সময়ে

একদিন পাশের গ্রামের কোনো এক পুরাতন যজমানের বৃষোৎসর্গের অনুষ্ঠান শেষ করে বাড়ি ফিরেই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। দীর্ঘ চেষ্টায় জ্ঞান ফিরল, কিন্তু সে শুধু ক্ষণেকের জন্যে। মনে হল, শেষবারের মতো কাকে যেন খুঁজছেন। ছেলেমেয়েরা কাছেই ছিল। ছুটে এসে ঝুঁকে পড়ল। একে একে সবার দিকে চেয়ে চোখ দুটো স্থির হয়ে দাঁড়াল কনিষ্ঠ পুত্রের মুখের ওপর। ঠোঁট দুখানা নড়ে উঠল কয়েকবার, কিন্তু স্বর ফুটল না। চোখের কোণ বেয়ে বেরিয়ে এল কয়েক ফোঁটা জল। আর কেউ বুঝুক না বুঝুক, রুদ্ধবাক্ মৃত্যু-পথযাত্রীর সেই দুটি আকুল চোখের শেষ আবেদন সদানন্দের কাছে অস্পষ্ট রইল না। কানের কাছে মুখ নিয়ে অশ্রুজড়িত কণ্ঠে চীৎকার করে বলল, বাবা, আপনার সব কাজ আমি মাথায় তুলে নিলাম। আপনি নিশ্চিন্ত মনে ভগবানের নাম করুন।

ক্ষণেকের তরে মনে হল, সেই যন্ত্রণা-বিকৃত রেখাকীর্ণ মুখের উপর ফুটে উঠল প্রশান্তির চিহ্ন। আশ্বাসময় গভীর তৃপ্তিতে চোখ দুটো বুজে এল, আর খুলল না।

শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটে যাবার পর যথারীতি শহরে গিয়ে কলেজে ভরতি হবার তাগিদ যখন এল, সদানন্দ প্রস্তুত হয়েই ছিল, জবাব দিতে দেরি হল না, তা কী করে হয়? ঠাকুরপুজো কে করবে? তা ছাড়া, এত সব যজমান শিষ্য—

চুলোয় যাকগে যজমান শিষ্য, রুখে উঠলেন বড়দাদা। সারা-জীবন চাল-কলা বেঁধেই চলবে তোর? নিজের ভবিষ্যৎটাও দেখতে হবে না?

সদানন্দ হেসে ফেলল: কী করব, বলুন? ভবিষ্যতের চেয়েও বড় ভবিতব্য। তাকে কেউ খণ্ডাতে পারে না।

বড়দাদা আর সইতে পারলেন না, উঠে চলে গেলেন। বউদিদি বললেন, তার মানে, পড়াশুনা আর করবে না?

করব, তবে কলেজে নয়।

কলেজে নয় তো কোন্‌খানে ?

জায়গাটা তোমাদের পছন্দ হবে না।

তবু বলো না একবার, শুনি ?

টোলে।

বউদিদি হেসে উঠলেন : এইবার তা হলে ষোলো কলা পূর্ণ হল।

হৃষীকেশের এক সতীর্থ এবং বন্ধু ছিলেন সিলেটের কোন্ গ্রামে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত এবং টোলের অধ্যাপক। মাঝে মাঝে ওঁদের পত্র-বিনিময় হত। ঠিকানাটা বাড়িতেই ছিল। পিতৃ-বিয়োগের দুঃসংবাদ জানিয়ে তাঁরই আশ্রয় প্রার্থনা করে চিঠি লিখল সদানন্দ। সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল। দুঃখ প্রকাশ এবং যথারীতি সান্ত্বনা দিয়ে শেষের দিকে লিখেছেন অধ্যাপক—'ছাত্রাভাবে আমার চতুষ্পাঠী কিছুদিন হইল বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছে। উদরান্নের জন্য অন্য বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছি। নিয়মিত অধ্যাপনার ব্যবস্থা নাই। তবু তোমার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলাম। তুমি তো এখানে ছাত্র হিসাবে আসিবে না, পুত্র হিসাবে আসিবে। যত শীঘ্র সম্ভব চলিয়া আসিও।'

শুভলগ্ন দেখে একদিন সিলেটের পথে পা বাড়াল সদানন্দ। সঙ্গে রইল সামান্য পরিধেয় এবং তারই সঙ্গে সযত্নে জড়ানো গৃহ-দেবতা শালগ্রামশিলা। কয়েকজন শিষ্য এবং যজমান তার ভরণপোষণের ভার সমেত লেখাপড়া এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা করে দেবার প্রস্তাব করেছিলেন। সদানন্দ গ্রহণ করে নি। বিনীত কণ্ঠে জানিয়েছিল, আপনাদের দেবার মতো প্রাণ আছে, সামর্থ্যও আছে, কিন্তু আমার যে নেবার মতো যোগ্যতা নেই। সেইটুকু অর্জন করবার জন্যেই এটা আমার তীর্থযাত্রা। দুটো বছর সময় চাইছি। ফিরে আবার আপনাদের কাজেই লাগব।

সন্ধ্যার দিকে অধ্যাপকের ঘাটে এসে নৌকা ভিড়ল। সেই দিনটি তার সমস্ত প্রীতি, মাধুর্য বিস্ময় ও শঙ্কার শিহরণ নিয়ে আজও অম্লান হয়ে আছে সদানন্দের বুকের মধ্যে। হয়তো চিরদিন থাকবে।

এগিয়ে এসে সস্ত্রীক অধ্যাপক সস্নেহ সমাদরে এই বিনয়-নম্র প্রিয়দর্শন ছেলেটিকে গ্রহণ করলেন। দুজনকে প্রণাম করে হাসিমুখে উঠে দাঁড়াতেই চোখ পড়ল দরজার সামনে। হঠাৎ শিউরে উঠল সদানন্দ, এবং সঙ্গে সঙ্গে নেমে এল চোখের পাতা। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে পেছন দিকে তাকিয়ে অধ্যাপক-গৃহিণীর স্নিগ্ধ হাসিটিও অকস্মাৎ নিবে গেল। তার সঙ্গে বেরিয়ে এল একটি গভীর নিশ্বাস।

ভয়ে ভয়ে আর-একবার চোখ তুলল সদানন্দ। চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। মুখের বাঁ দিক জুড়ে বিস্তৃত দাহচিহ্ন। কুঁচকে-যাওয়া চামড়ার পাশ দিয়ে কয়েকটা দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। তার উপরে স্থির হয়ে আছে একটি বিকৃত বিকল চোখ। বাঁ দিকটা যেমন বীভৎস, মুখের ডান অংশটা তেমনই নিটোল সুন্দর। তার চেয়েও আশ্চর্য তার অপরূপ দেহশ্রী, একরাশ কালো কোঁকড়ান চুলের আড়ালে নাতিপ্রশস্ত কপাল। তার উপরে সযত্নরচিত কাঁচপোকার টিপ। গ্রীবার বাঁকটি অনবদ্য। সুগঠিত উন্নত বুক, সুঠাম পেলব বাহু। ক্ষীণ কোমর এবং যৌবনপুষ্ট নিম্নাঙ্গের চারদিক ঘিরে বুকের উপর দিয়ে কাঁধের আড়ালে নেমে গেছে সাধারণ শাড়িখানা, সে শুধু অঙ্গাবরণ নয়, অঙ্গশোভা—এমন একটি বিশেষ ভঙ্গিতে জড়ানো যাতে করে দেহকে আড়াল করেছে যতখানি, তার চেয়ে বেশী করেছে প্রকাশ।

কন্যার জন্মের পর তার অপূর্ব অঙ্গবিন্যাস ও তপ্তকাঞ্চনবর্ণের দিকে চেয়ে বোধ হয় মহাদেবীর ধ্যান মনে পড়েছিল ন্যায়রত্নের। তাই তার নাম দিয়েছিলেন চণ্ডী। সদানন্দের চোখে সে ধরা দিল আর-এক রূপে। অপরাহ্নের আবছায়া আলোয় ওই দ্বারলগ্ন নারী-মূর্তির দিকে তাকিয়ে বিচিত্র রোমাঞ্চে কেঁপে উঠল তার ভীরু হৃদয়।

বিস্ময়, বেদনা এবং ভয়ের সঙ্গে জড়ানো আর একটা অনাস্বাদিত অনুভূতি, যাকে সে চেনে না। তার জাগ্রত যৌবনের দুয়ারে এই প্রথম নারীর পদক্ষেপ। কিন্তু পূজারীর শ্রদ্ধাপ্লুত পুলকে মন ভরে উঠল কই? ওই নারীদেহ এবং তাঁর দাঁড়িয়ে থাকবার প্রগল্‌ভ ভঙ্গি, বিশেষ করে ডান দিকের ওই মোহন চক্ষুটির নির্লজ্জ চটুল হাসি গোপন অন্তর্লোকে কোন্ এক প্রবৃত্তির ঘুম ভাঙিয়ে দিল। কী কদর্য রূপ তার! নিজের অশুচি অন্তরের দিকে চেয়ে শিউরে উঠল সদানন্দ। চোখ বুজে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করতে চেষ্টা করল! কিন্তু তাঁর দ্বার জুড়ে দাঁড়িয়ে রইল ওই কদাননা নারী।

অপুত্রক গৃহে পুত্রের স্থান পেল সদানন্দ। নিজের বাড়িতে তার ডাকনাম ছিল সদা। এখানে হল আনন্দ, আর চণ্ডীর মুখে আনন্দদা, কখনও বা আরও সংক্ষেপে নন্দদা। আবেগে, উচ্ছ্বাসে, সোহাগে জড়ানো সে ডাক যখন কানে যায়, সমস্ত দেহমূল যেন নড়ে ওঠে। শান্ত, গম্ভীর, সংযমশীল ব্যাকরণের ছাত্র কিসের যেন উন্মাদনা অনুভব করে তার বুকের মধ্যে। এড়িয়ে চলতে চায়। গুরুনির্দিষ্ট নীরস পাঠের মধ্যে ডুবিয়ে দিতে চায় একাগ্র মন। তার পর হঠাৎ এক সময়ে অনুভব করে, কখন সে মন মোহাচ্ছন্ন হয়ে গেছে দুখানি শুভ্র, সুকোমল হাতের স্পর্শ-সুখের স্মৃতি-নেশায়, অজ্ঞাতসারে কামনা করছে সেই নিষিদ্ধ পঙ্কিল সুখের পুনরাবৃত্তি।

সে কামনা অপূর্ণ থাকে না। নির্জন ঘরে কখন ঝড়ের মতো পড়ে উদ্বেলিত প্রাণরসে ভরা একটি যৌবন-মত্ত দেহ। পিঠের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কানের কাছে মুখ দিয়ে বলে যায় অর্থহীন প্রলাপ। তারপর হঠাৎ সামনে এসে মুগ্ধবোধ বন্ধ করে দিয়ে তেমনই ঝড়ের মতো ছুটে চলে যায়।

কোনো কোনো দিন চুপি চুপি এসে বসে পড়ে একান্ত কাছটিতে। গলা জড়িয়ে ধরে আশ্চর্য করুণ কণ্ঠে বলে, 'আমাকে তুমি দু-চক্ষে দেখতে পার না। তাই না, নন্দদা?' সদানন্দের শিরায় শিরায় তপ্ত

রক্ত স্রোত উদ্দাম হয়ে ওঠে, বন্যার বেগে ভেঙে যেতে চায় সংযমের বাঁধ। ইচ্ছা হয়, নিবিড় পেষণে লুঠে নেয় ওই উত্তপ্ত উদ্ধত বুকের সুধার ভাণ্ডার। হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে আসে। খানিকটা সরে গিয়ে বলে, বিরক্ত কোরো না, পড়তে দাও।

না, দেবো না পড়তে।—কোঁকড়ানো খোলা চুলে ছন্দোময় দোলা দিয়ে বলে ওঠে মোহিনী। ব্যবধানটুকু আবার খুচে যায়। বলে, আচ্ছা নন্দদা, এই সব অং-বং পড়তে গেলে কেন তুমি? সুধার বর কেমন তিনটে পাস করেছে। মস্ত বড় চাকুরি পাবে এবার।

কে সুধা?

ও হরি! সুধাকে চেন না? ওই বোসেদের মেয়ে। কত ঘটা করে বিয়ে হল, তুমি আসবার ঠিক সাত দিন আগে। চাকরি পেলেই ওরা বাসা করবে, বলছিল সুধা।

বেশ, এবার একটু ওদিকে যাও দিকিন। জ্যাঠাইমা ডাকছেন।

চণ্ডীর কানে বোধ হয় সে কথা পৌঁছল না। কেমন উদাস কোমল হয়ে এল কণ্ঠস্বর। আপন মনে বলে চলল, সুধা আর আমি একসঙ্গে তিন বছর পড়েছি শিবু পণ্ডিতের পাঠশালায়। সবাই বলত, চণ্ডীর কাছে সুধা দাঁড়াতেই পারে না। রূপেও না, গুণেও না। তারপর এই দশা হল। বাবা বললেন, এ মুখ নিয়ে আর পাঠশালায় যেতে হবে না। কারও বাড়ি গিয়ে একটু বসি, তাও পছন্দ করেন না। লুকিয়ে লুকিয়ে যেতে হয়। একলা একলা কি ভালো লাগে সব সময়, বলো নন্দদা?

সদানন্দ উত্তর দিল না। এ দুর্ঘটনার ইতিহাস সে আগেই শুনেছিল। মামার বাড়িতে স্টোভ জ্বালতে গিয়ে হঠাৎ কী করে আগুন লেগেছিল মুখের বাঁ দিকটায়, তার পর কেমন করে ওই অত রূপ চিরদিনের তরে হারিয়ে প্রাণটুকু শুধু ফিরে পেল হতভাগিনী, সব কথাই শুনিয়েছিলেন অধ্যাপক-গৃহিণী। কিন্তু নিজের মুখে সে কিছুই বলে নি। জীবনের এত বড় একটা বিপর্যয় তাকে যে

কোথাও স্পর্শ করেছে, কথায় বা চালচলনে তার আভাস পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। এটা যেন কিছু নয়। তার জীবনে কোথাও যেন কোনো দুঃখ নেই, আছে শুধু উল্লাস।

আজকের এই সুর একেবারে নূতন। 'একলা একলা কি ভালো লাগে সব সময়? বলো নন্দদা, লাগে?' কথাগুলো সদানন্দের অন্তরে অন্তরে অনুরণিত হল। কিন্তু তার কাছে এর কোনো উত্তর ছিল না।

পরক্ষণেই আবার ফিরে এল সেই উচ্ছল কণ্ঠ: জান নন্দদা, সুধার ছোড়দা ওই অশোকটা কী পাজী! বলে কি শুনবে? 'অনেক রাত্তিরে একবার আসিস চণ্ডী। দরজা ভেজানো থাকবে।' কি অসভ্য!

সদানন্দের মনে হল, এই গোপন অভিসারের লালাসিক্ত প্রলোভন উপচে পড়ছে ওই মেয়েটার চোখ-মুখের প্রতিটি রেখায়। প্রতিটি অঙ্গে ফুটে উঠেছে সেই নেশার মত্ততা। হঠাৎ ছুটে এসে তার গায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে চিবুকে হাত দিয়ে বলল, মুখ গোমড়া করে রইলে যে বড়? হিংসে হচ্ছে বুঝি? সত্যি, ব্যাটাছেলেগুলো ভারী হিংসুটে! তবু অমন করে থাকবে? বেশ চললাম আমি অশোকের কাছে। বলেই লুটিয়ে-পড়া আঁচলখানি কুড়িয়ে নিয়ে হাসির লহর তুলে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে চলে গেল।

ছয়

নারীর সঙ্গে নদীর এবং যৌবনের সঙ্গে জোয়ারের মিল আছে—এটা কাব্যের কথা। কবিরা বলেন, নদীর যেমন রূপ বদলায়, গতি বদলায়, তেমনি ক্ষণে ক্ষণে নব রূপ এবং নতুন পথ নেয় নারী! তার হৃদয়স্রোত বেশীদিন এক খাতে বয় না।

সদানন্দ কাব্যচর্চা করে না, নীরস ব্যাকরণের ছাত্র। তবু গুরুগৃহে মাস কয়েক কেটে যাবার পর এই রকম একটা অনুভূতি তার মধ্যে জেগে উঠল। মনে পড়ে, তাদের গ্রামের নদীতে একবার বান ডেকেছিল। কোথা থেকে এক উন্মত্ত জলোচ্ছ্বাস নির্লজ্জের মতো দু' তীরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভেঙে দিয়েছিল কঠিন মাটির বন্ধন, ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল গৃহস্থের সম্ভ্রম ও আশ্রয়। তার পর দেখা গেল, সে প্রচণ্ড গতিবেগ আর নেই, পড়ে আছে শুধু একটা নিস্তেজ জলধারা। কিন্তু নদীর গতি কোনোদিন শেষ হয় না, শুধু তার দিক বদলে যায়। তাদের গ্রাম ছেড়ে নবগঙ্গাও চলে গেল দূরান্তরে। আর এক গ্রামের বুক চিরে বয়ে চলল তার বিপুল স্রোত।

বাড়ি থেকে মাইল খানেক দূরে অধ্যাপকের কয়েক বিঘা জমি ছিল। মাঝে মাঝে যখন-তখন তিনি শিষ্য পরিক্রমায় বেরুতেন, চাষ-বাস তদারক করবার ভার পড়ত সদানন্দের উপর। একদিন দুপুর-রোদে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে দেখল, চণ্ডী বসে বসে কী একটা সেলাই করছে। কিছুদিন আগেও এমনি মাঠ থেকে ফিরে এলে সে পাখা নিয়ে ছুটে আসত, গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে হাওয়া করতে শুরু করত, ঘামে ভেজা জামা গেঞ্জি জোর করে টেনে খুলে দিত। বাধা-নিষেধ, সঙ্কোচ-আপত্তি কিছুই টিকত না, সব উড়ে যেত তার উচ্ছ্বসিত হাসির ঝড়ো হাওয়ায়।

আজ তার ওঠবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। একবার শুধু চোখ তুলে দেখে সেই সেলাই নিয়েই ব্যস্ত হয়ে রইল।

সদানন্দ নিজের ঘরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে সেখান থেকেই এক গেলাস জল চাইল। আগে আগে সাড়া দিয়ে জল নিয়ে ছুটে যেত চণ্ডী। আজ নিঃশব্দে উঠে গিয়ে জল গড়িয়ে গেলাসটা রাখল একটা টুলের ওপর। খাওয়া হলে তুলে নিয়ে তেমনি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সেই অপস্রিয়মান দেহের দিকে চেয়ে সদানন্দের মনে পড়ল তার গ্রামের নদী নবগঙ্গার কথা। তার মতো

এই নারীও একদিন উত্তাল তরঙ্গ তুলে এসেছিল তার জীবনে, আশৈশব-গড়ে-তোলা কঠোর সংযমের বাঁধের উপর হানা দিয়ে তার অস্তিত্বের মূল ধরে নাড়া দিয়েছিল। আর একটু হলেই হয়তো সব ভেঙে পড়ত। কিন্তু তার আগেই সে সরে গেছে। পড়ে আছে শুধু ওই নির্জীব নিস্তরঙ্গ রূপধারা, এইমাত্র যে চলে গেছে তার সুমুখ দিয়ে। কিন্তু শ্রোত সরে গেলেও মরে যায় নি। অনুকূল হাওয়ায় এখনও সেখানে জোয়ারের আলোড়ন দেখা দেয়। আর-এক কূলে গিয়ে আছড়ে পড়ে তার ঢেউ।

কুলনাশিনীর এই নতুন অভিযান সদানন্দের কাছে গোপন ছিল না। বোধ হয় গোপন রাখতে সে চায়ও নি। চরম উপেক্ষায় নিতান্ত অবহেলাভরে নিজেকে সে সরিয়ে নিয়ে গেছে এই নীরস শুদ্ধাচারীর নিরুত্তাপ সংস্রব থেকে। সব দেখে সব জেনেও একটি কথা বলে নি সদানন্দ। সে যেন শুধু নিস্পৃহ দর্শকমাত্র, তার বেশী আর কিছু নয়। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, এই যে সে নির্বাক্ ঔদাসীন্যে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে আছে, এটা সংযম নয়—কাপুরুষতা, ক্ষমা নয়—অক্ষমতা। এগিয়ে গিয়ে পথ রোধ করাই পৌরুষের লক্ষণ। কেউ নেমে যেতে চাইলেই তাকে পাপের পথে ছেড়ে দেওয়া যায় না। তা ছাড়া, ও তো শুধু 'কেউ' নয়। ওর সঙ্গে সম্পর্ক যদি নাও থাকে, যাঁরা তাকে স্নেহ এবং আশ্রয় দিয়ে আপনজনের অধিকার দিয়েছেন, সেই পরিবারের মান-সম্ভ্রম-কুল-মর্যাদার দিকে চেয়ে তাঁর এই বিপথগামিনী কন্যাকে রক্ষা করা তার কর্তব্য।

এই সব যুক্তি দিয়ে নিজেকে বোঝাতে চেয়েছে সদানন্দ। কিন্তু এই কর্তব্যবোধের অঙ্কুশ তাকে সাময়িকভাবে সজাগ করে তুললেও কাজের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে নি। নিজের মনের দিকে চেয়ে সন্দেহ জেগেছে, এর সবটাই হয়তো আত্মপ্রবঞ্চনা। যে-বস্তু তাকে চালনা করছে, সে কি নিছক শুভাকাঙ্ক্ষী, আশ্রয়দাতার প্রতি কর্তব্যবোধ, না, তার সঙ্গে জড়ানো কোনো কামনাবিদ্ধ প্রবৃত্তির

তাড়না? অন্তর গহন থেকে কানে এল তার নিজেরই কণ্ঠস্বর— যে ধরা দিতে এসেছিল, যাকে অনায়াসে লাভ করা যেত, নিজেই তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি। আজ যদি সে অন্য কারও হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে থাকে, আমার অন্তরে এ যন্ত্রণা কেন? এরই নাম কি ঈর্ষার জ্বালা? একেই কি বলে পরাজয়ের গ্লানি? কিংবা, আমি স্বেচ্ছায় তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি, এ কথা সত্য নয়। অক্ষম বলে তাকে ধরে রাখতে পারি নি। আমি হেরে গেছি, আর জয়ী হয়েছে ওই অশোক। আমার অত্যুচ্চ আদর্শের ধ্বজা আঁকড়ে ধরে আমি ছটফট করে মরছি, আর আমার এই অশক্ত মুষ্টির বন্ধন থেকে আমার কামনার ধন কেড়ে নিয়ে ভোগ করছে এমন একজন, রূপে গুণে বিদ্যায় চরিত্র-গৌরবে মহত্তর জীবনের মাপকাঠিতে যে আমার চেয়ে সর্বাংশে নিকৃষ্ট।

দুর্বল মুহূর্তে এই সব কথা যখন মনে হত, সমস্ত দিন কোনো কিছুতে মন বসত না, কখনো বা সমস্ত রাত এপাশ ওপাশ করে কেটে যেত। কোনো কোনো দিন উঠে গিয়ে গভীর রাত্রির অশান্ত প্রহরগুলো বাড়ির পেছনে নির্জন মাঠে পায়চারি করে কাটিয়ে দিত।

এমনি এক বিনিদ্র রাত্রে সেই মাঠের ধারে একটা গাছের গোড়ায় বসে নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করছিল সদানন্দ, এই যে আজ সে দেশ ছেড়ে, আত্মীয়-পরিজন সকলের একান্ত ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য করে চলে এসেছে, বরণ করে নিয়েছে এই অধ্যয়ন-কঠোর নিরানন্দ জীবন, তার একমাত্র উদ্দেশ্য স্বর্গত পিতার শেষ অভিলাষ পূর্ণ করে তাঁর আধ্যাত্মিক আদর্শকে রূপ দান করা। একটা চটুল-প্রকৃতি দুশ্চরিত্রা নারীর সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে সেই পবিত্র ও মহৎ ভবিষ্যৎকে নষ্ট করতে সে আসে নি। সেই নারী যে আজ তাকে স্বেচ্ছায় মুক্তি দিয়ে গেছে, এটা নিতান্ত বিধাতার আশীর্বাদ। সে একান্ত ভাগ্যবান। স্বর্গত পিতার পুণ্যবলই তাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করেছে। আর ভয় নেই। এবার সে নিশ্চিন্ত, নিরাপদ।

মনের ভার কেটে গিয়ে একটা গভীর স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল।

কিছুক্ষণ আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। খণ্ড-খণ্ড মেঘে শুক্লপক্ষের স্বচ্ছ আকাশ আচ্ছন্ন। তারই একখানার আড়াল থেকে হঠাৎ যেন ডুব-সাঁতার দিয়ে বেরিয়ে এল দ্বাদশীর চাঁদ। দিকে দিকে ছড়িয়ে গেল জ্যোৎস্নার প্লাবন। হেসে উঠল সিক্ত-পত্র গাছপালার দল। পাতার আড়ালে এখানে ওখানে শোনা গেল দু-চারটি হঠাৎ-জেগে-ওঠা কাকের ডাক। আলো দেখে মনে করেছিল, ভোর হয়ে গেছে। ভুল ভাঙতেই আবার নেতিয়ে পড়ল ঘুমের কোলে। বিশ্বপ্রকৃতির এই স্থির প্রসন্ন মূর্তির দিকে চেয়ে সদানন্দের সমস্ত অন্তর নির্মল আনন্দে ভরে উঠল। ইষ্টদেবতাকে প্রণাম জানিয়ে হৃষ্ট মনে পা বাড়াল ঘরের দিকে।

কয়েক পা গিয়েই থমকে দাঁড়াল। এত রাতে কার ছায়া পড়ল ওই হিজল গাছের ধারে? শুধু ছায়া নয়, তার পিছনে কায়াও আছে, যার প্রতিটি রেখা ওর চেনা। একটিবার তাকিয়েই গভীর ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিল, কিন্তু ফিরে যেতে পারল না। মুহূর্ত-পূর্বেকার সমস্ত সংকল্প ভাসিয়ে দিয়ে বুকের মধ্যে জ্বলে উঠল দুর্নিবার জ্বালা। কঠোর স্বরে বলল, দাঁড়াও।

কায়া সদানন্দের কথায় দাঁড়াল কিন্তু এগিয়ে এল না। সদানন্দই এগিয়ে গেল তার কাছে। কায়া এবার সবাক হল। যেন কিছুই হয় নি এমনিভাবে অত্যন্ত সহজ সুরে বলল, কী বলছ?

কোথায় গিয়েছিলে?

তুমি বুঝি পাহারা দিচ্ছিলে বসে বসে? বলে হেসে উঠল চাপা গলায়।

চুপ করো। হাসতে লজ্জা করে না?

না, করে না। দীপ্ত কণ্ঠে বলে উঠল চণ্ডী।

এত অধঃপাতে গেছ!

যদি গিয়ে থাকি, তোমার কী ? তুমি সে কথা বলবার কে ?

ডান চোখের ভিতর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে এল অগ্নিশিখা। জ্যোৎস্নালোকে স্পষ্ট দেখতে পেল সদানন্দ। কিন্তু বলবার মত আর কোনো কথা খুঁজে পেল না। তার জন্যে সে অপেক্ষাও করল না। আর একবার সেই জ্বলন্ত দৃষ্টি বিকীর্ণ করে দৃপ্তভঙ্গিতে দ্রুত পায়ে চলে গেল। তার পরেই শোনা গেল খিড়কির কপাট বন্ধ করবার শব্দ।

কম্বল-শয্যায় ফিরে গিয়ে আত্মস্থ হবার চেষ্টা করল সদানন্দ। ঠিকই বলেছে চণ্ডী। 'তুমি সে কথা বলবার কে ?' সত্যিই কেউ নয়। এ তো কেবল চণ্ডীর কথা নয়, কিছুক্ষণ আগে সে নিজেও মনে মনে এই সঙ্কল্পই গ্রহণ করেছে, এই পথেই চালিত করতে চেয়েছে তার ভবিষ্যৎ-জীবনধারা। ওই মেয়েটা তার কেউ নয়। ওর শুভাশুভের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই। ওই পাপস্পর্শ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখাই তার সাধনা। সুস্পষ্ট ভাষায় সেই একই কথা ও জানিয়ে দিয়ে গেল। তার অভীষ্ট-সিদ্ধির পথটাকেও সহজ এবং সুগম করে দিয়ে গেল। তবে কিসের এ ক্ষোভ ? কেন মনে হচ্ছে এটা তার অপমান, এটা তার পরাজয় ? বুকের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত মুচড়ে উঠছে কিসের বেদনায় ? কেন বলছে তার কানে কানে, যে তোমার ছিল মনের গোপন গহনে, একদিন মোহ-সঞ্চার করেছিল যার মোহনস্পর্শ, আজ সে তোমার কেউ নয়। তোমার জীবন থেকে সে হারিয়ে গেছে, আর তারই জন্যে তোমার অন্তর-জোড়া এই হাহাকার।

না, না। তীব্র প্রতিবাদের আঘাতে সমস্ত সত্তাকে সচেতন করে উঠে বসল সদানন্দ। সেই দৌর্বল্য তাকে জয় করতেই হবে। নির্মম হাতে ছিঁড়ে ফেলতে হবে এই মোহপাশ। তার আবাল্যশুদ্ধ অন্তরের এক কোণে দেখা দিয়েছে যে পাপের অঙ্কুর, তাকে সমূলে উপড়ে ফেলতে হবে। সেই সন্ধ্যা থেকে যে কলুষ-চিন্তা তাকে অবিরাম অনুসরণ করে চলেছে, চোখ বুজলে পাছে আবার তার কবলে গিয়ে

পড়তে হয়, তাই বাকী রাতটুকু জেগে কাটিয়ে দেবে, এই হল তার সিদ্ধান্ত। শুধু জেগে থাকা নয়, নিজেকে সঁপে দেওয়া কোনো ধর্ম-গ্রন্থের পবিত্র আশ্রয়ে।

কম্বল গুটিয়ে রেখে রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বেলে গীতা খুলে বসল সদানন্দ। দ্বিতীয় অধ্যায়, সাংখ্যযোগ। মোহাবিষ্ট অর্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের উদাত্ত বাণী—ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ হে পার্থ, কাপুরুষতাকে আশ্রয় কোরো না। ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ—ওঠো, হৃদয়ের এই তুচ্ছ দুর্বলতা ত্যাগ করো।

গোবর-নিকানো আঙিনার কোণে উত্তর ভিটিতে একখানা লম্বা-ধরনের ঘর। খড়ের ছাউনি, মুলিবাঁশের বেড়া, মাটির দাওয়া। পূবে পশ্চিমে ছোট বড় দুটি কামরা। তাদের মাঝখানেও ওই ছ্যাচা বাঁশের দেওয়াল। ছোটটিতে থাকে সদানন্দ, বড়টি অধ্যাপকের। তারই পাশে আড়াআড়ি ভাবে আর-একখানা পূব-দুয়ারী চালাঘর। সেখানে থাকেন সকন্যা গৃহিণী। দুদিন হল শিষ্যবাড়ি গেছেন অধ্যাপক। এখনও ফিরতে পারেন নি। নিজের ঘরে খোলা দরজার দিকে মুখ করে গভীর রাত্রির গীতাধ্যয়ন প্রথমে নীরবেই শুরু করেছিল সদানন্দ। তারপর কখন সেই পাঠ ক্রমশঃ মৃদু থেকে কিঞ্চিৎ উচ্চতর গ্রামে এসে গেছে বোধ হয় বুঝতে পারে নি। হঠাৎ দরজায় কার সাড়া পেয়ে চোখ তুলতেই কণ্ঠ থেমে গেল। রুক্ষ দৃষ্টি মেলে বিস্ময় মেশানো বিরক্তির সুরে বলল, তুমি এখানে!

ভয় নেই—মুখ টিপে হেসে জবাব দিল চণ্ডী, কেউ দেখে ফেলবে না। মা অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

ঘরে যাও। আমার কাজ আছে।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কোথায় গিয়েছিলাম, জানতে চেয়েছিলে। তাই বলতে এলাম।

কোনো দরকার নেই।—বইয়ের দিকে চোখ রেখেই বলল সদানন্দ।

রাগ করেছ বুঝি ?

সদানন্দ এ কথার কোনো জবাব দিল না। চৌকাঠ ডিঙিয়ে ঠিক তার সামনেটায় মেঝের উপর বসে পড়ল চণ্ডী। কিছুক্ষণ নীরবে চেয়ে থেকে যখন কথা বলল, তার কণ্ঠের সেই চাপল্য কোথায় মিলিয়ে গেছে, তার জায়গায় ফুটে উঠেছে একটি গভীর করুণ সুর।

আমার দিকে একবার চেয়ে দেখো।

সদানন্দ ক্ষণেকের তরে চোখ তুলেই আবার নামিয়ে নিল। বোধ হয় সে দৃষ্টি সইতে পারল না। সেই সুরেই বলল চণ্ডী, আমি কুৎসিত। আমার মুখের দিকে চাইলে লোকে আঁতকে ওঠে। তাই বলে আমার এই রক্তমাংসের শরীরটাও কি মিথ্যা হয়ে গেছে ? আমার কোনো সাধ নেই, লোভ নেই ? সংসারে মেয়েমানুষ যা চায়, তার কোনোটাই আমার জন্যে নয় ?

সদানন্দের কাছে এ প্রশ্নের কোনো জবাব ছিল না। থাকলেও বোধ হয় দিতে পারত না। ক্ষণকাল অপেক্ষা করে চণ্ডী আবার বলল, আমার বয়সী যে সব মেয়ে, যাদের সঙ্গে একসঙ্গে বড় হয়েছি, একে একে তারা সবাই চলে গেল – ঘর পেল, বর পেল। আমি কী পেলাম ? আমি কী পাব ? কী নিয়ে কাটবে আমার সারা জীবন ? কেউ ভেবে দেখেছে সে-কথা ? কেউ না। তাই আমার পথ আমি নিজেই বেছে নিলাম। অশোক আমার মুখের দিকে চায় না, চাইতে ভয় পায়। আমার মনের খবরও সে রাখে না। সে চেয়েছিল আমার এই দেহ। আমি দিয়েছি। কেন দেব না ? আর কেউ তো তাও কোনোদিন চায় নি।

লজ্জাহীনা প্রগল্ভার দিকে ঘৃণারক্ত রূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সদানন্দ। শুধু ঘৃণা নয়, তার মধ্যে অপরিসীম বিস্ময়। পাপের এ কী অসঙ্কোচ স্বীকারোক্তি! বলতে ইচ্ছা হল ঃ এ পথ ধরবার আগে, এই কলঙ্কের কথা মুখ ফুটে উচ্চারণ করবার আগে ওই পুকুরটা কি একবার চোখে পড়েনি, কলঙ্কিনী ? বলতে ইচ্ছা হল,

কিন্তু বলা গেল না কিছুই। দীর্ঘদিনের বাক্-সংযম রসনার গতি রুদ্ধ করে দিল। কিন্তু অন্তরের সমস্ত ঘৃণা এবং রোষ বেরিয়ে এল ছুটি জ্বলন্ত চোখের ভিতর দিয়ে।

সেই দিকে চেয়ে চণ্ডীর মনেও বোধহয় লাগল তার উত্তপ্ত স্পর্শ। উত্তেজিত দীপ্তকণ্ঠে বলল, কী দেখছ অমন করে? তুমি বলতে চাও, আমি নষ্ট হয়ে গেছি? হ্যাঁ হয়েছি, কিন্তু তার জন্যে দায়ী কে?

সে কথা কেমন করে বলবে সদানন্দ? তাকে কিছুই বলতে হল না। চণ্ডীর নিজের মুখ থেকেই এল তার প্রশ্নের উত্তর দায়ী তুমি।

আমি!

হ্যাঁ, তুমি!

এই আকস্মিক আক্রমণে সদানন্দের স্নায়ুকেন্দ্র যেন হঠাৎ বিকল হয়ে গেল। এই বিমূঢ় মূর্তির দিকে চেয়ে বোধ হয় কিঞ্চিৎ দয়ার উদ্রেক হল নির্দয়ার। অনেকটা যেন সস্নেহ সমবেদনার সুরে বলল, সত্যি, তোমার জন্যে ছুঃখ হয়, নন্দদা। লোভ আছে, কিন্তু ভোগ করবার ক্ষমতা নেই, সাহস নেই! যার উপরে লোভ, তাকে আঁকড়ে ধরতে পার না। সেদিকে হাত বাড়াতেও ভয়। সেই না-পারাটাকে ফলাও করে বল—সংযম। আরও কী যেন একটা গালভরা নাম আছে তোমাদের শাস্ত্রে? ব্রহ্মচর্য···না?—বলেই খিলখিল করে হেসে উঠল।

সেই হাসির তীক্ষ্ণ ফলাগুলো কেটে কেটে বসে গেল সদানন্দের সমস্ত দেহের পরতে পরতে। ওই মধুবর্ষী রসনায় এত বিষ, কেমন করে জানবে সে? কিন্তু যতই বিষাক্ত হোক, ওই অভিযোগের প্রতিটি বর্ণ সতেজ ও প্রাঞ্জল। মিথ্যা বলে প্রতিবাদ করবার সাধ্য নেই, হীন বলে উপেক্ষা করবার শক্তি নেই। তাই বলে সয়ে নেওয়াও যায় না। নিষ্ফল ক্ষোভ এবং অক্ষম লজ্জায় মাথাটা আরও নুয়ে পড়ল বুকের ওপর।

সামনের দিকে আর একটু কাছে সরে এল চণ্ডী। আবেগভরা কণ্ঠে আবদার ঢেলে বলল, তুমি রাগ করলে? বাঃ! একটু ঠাট্টাও বুঝি করতে নেই? আচ্ছা, যা বলেছি, সব ফিরিয়ে নিলাম। এবার হল তো? শোনো। একটিবার তাকাও দিকি।···বেশ, এ পোড়া মুখ দেখতে না চাও, দেখো না। নিজের মনের দিকে চেয়ে বুকে হাত দিয়ে বলো তো—চণ্ডী তোমার কেউ নয়, কোনোদিন কেউ ছিল না। এই চোখেই কি দেখেছ তাকে এতদিন? বিশ্বাস করো নন্দদা, যতই নেমে গিয়ে থাকি, আজও আমি তোমারই আছি। তুমি আমাকে টেনে তোলো। একটিবার, শুধু একটিবার মুখ ফুটে বলো—

পায়ের উপর আচমকা স্পর্শে চমকে উঠল সদানন্দ। পদ্ম-কোরকের মতো দুখানা হাত, নবনীর মতো ক'টি আঙুল কবিরা যার নাম দিয়েছেন চম্পকাঙ্গুলি। একদিন যার মদির স্পর্শ নেশা ছড়িয়ে দিয়েছে সমস্ত চেতনায়, এই মুহূর্তে হঠাৎ মনে হল, কতগুলো কুৎসিত বিষধর সাপ, তার পা দুটো জড়িয়ে ধরেছে।

দু-হাত পেছনে ছিটকে গিয়ে চীৎকার করে উঠল: ছুঁয়ো না, সরে যাও।

সরে যাবো! আমায় তুমি ছোঁবে না। বিহ্বল করুণ কণ্ঠে বলল চণ্ডী, একথা তুমি বলতে পারলে?

দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের ছায়া মাড়ালেও পাপ। যাও, বেরিয়ে যাও আমার ঘর থেকে।

সমস্ত দেহটাকে একটা রূঢ় ঝাঁকানি দিয়ে ভয়াল ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল চণ্ডী। যেন একখণ্ড জ্বলন্ত ইস্পাত। ডান দিকের চোখটা জ্বলে উঠল। তর্জনী তুলে বলল, দুশ্চরিত্রা। বেশ, আমিও দেখে নেবো কোথায় থাকে তোমার চরিত্রের অহঙ্কার! যে পাঁকে আমি ডুবেছি, তোমাকেও তার মধ্যে নামতে হবে। তা যদি না পারি—

বাকী কথাগুলো অসমাপ্ত রেখেই বিদ্যুৎ-চমকের মতো অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

সাত

চণ্ডীকে সে ভালোবাসে, একদিন নিজের মনকে এই কথাই বোঝাতে চেয়েছিল সদানন্দ। আজ মনে হল, সে শুধু ভাবের ঘরে চুরি। ভালোবাসা নয়, রূপজ মোহ, নারী-মেধের দুর্বার আকর্ষণ। সেই কলুষ স্পর্শ দিনের পর দিন তার দেহে মনে যে ঝড় তুলেছিল তাকে শত চেষ্টাতেও শান্ত করতে পারে নি। মাঝে মাঝে আশঙ্কা হত, আজই হয়তো ঘটে যাবে তার ব্রহ্মচর্য-জীবনের সেই চরম পতন, যার দাগ কোনোদিন মোছে না। বহু কষ্টে সে পতন রোধ করে গেছে। তারপর ঘটনা-স্রোত চলে গেল অন্য পথে। সেই সঙ্গে সে আশঙ্কাও দূরে চলে গেছে. ফিরে এসেছে আত্মবিশ্বাসের জোরে। চণ্ডীর সেই গভীর রাত্রির স্পর্ধিত প্রতিজ্ঞা—'তোমাকে নেমে আসতে হবে পাঁকের মধ্যে'—আজ আর তাকে বিচলিত করে না। কিন্তু পতনের ভয় না থাকলেও ওই মেয়েটা তার জীবনের মধ্যে এমন ভাবে জড়িয়ে গেছে, এইখানে বসে তার গ্রন্থিমোচন কেমন করে সম্ভব? ওকে আশ্রয় করে যে বিপর্যয় ঘটে গেল তার অন্তর্লোকে, তার পর আর যাই হোক, বিদ্যার্থীর শান্ত সাধনার পথ খোলা থাকে না। গুরুগৃহবাস তার শেষ হল। এবারে চলে যাবার পালা। যে উদ্দেশ্য নিয়ে ঘর ছেড়েছিল, এখানে আর তার সিদ্ধির সম্ভাবনা রইল না।

মুগ্ধবোধ খুলে রেখে এই সব কথাই ভাবছিল সদানন্দ। অধ্যাপক ফিরে আসবার পর বিদায়ের প্রস্তাবটা কী ভাবে উপস্থিত করলে তাদের সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হবে না, অথচ ফললাভের পথ সুগম হবে, সেটাও ছিল চিন্তার বিষয়। এমন সময় এল তাঁর চিঠি। অন্যান্য কথার পর জানিয়েছেন, কোনো এক শিষ্যের বিশেষ অনুরোধে পক্ষকাল ভাগবতপাঠের ভার গ্রহণ করতে হয়েছে। মঙ্গলময়ের ইচ্ছা হলে

ওই শুভ কাজ শেষ করেই তিনি গৃহযাত্রা করবেন। চাষবাস এবং স্থানীয় যজমানদের ক্রিয়াকর্মের দায়িত্ব সদানন্দের উপর অর্পণ করে তিনি নিশ্চিন্ত আছেন……ইত্যাদি।

দিনের বেশীর ভাগ যতদূর সম্ভব বাড়ির বাইরেই কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করে সদানন্দ। বাকী সময়টা থাকে নিজের ঘরে। দু-বেলা খাবার সময় দেখা হয় অধ্যাপক-পত্নীর সঙ্গে। দু-চারটি সাংসারিক কথাবার্তাও হয়। চণ্ডী থাকে নেপথ্যে। দৈবাৎ একদিন সামনে পড়তেই চোখাচোখি হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিল দুজনেই। সদানন্দের মনে হল, কেমন যেন রক্তহীন পাণ্ডুর দেখাল মুখখানা। পরক্ষণেই নিজের মনকে সরিয়ে নিয়ে এল কোনো একটা কাজের মধ্যে।

একদিন সন্ধ্যার পর অধ্যাপক-গৃহিণী তার ছোট ঘরটিতে দেখা দিলেন। সদানন্দ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে একখানা জলচৌকি এগিয়ে দিল। তিনি সেটি গ্রহণ করে বললেন, বোসো বাবা, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

সদানন্দ তার কম্বলের আসনে বসে অপেক্ষা করে রইল। তিনি ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বললেন, কদিন থেকেই বলব মনে করছি। আজ-কাল করে হয়ে ওঠে নি। এদিকে ওঁরও ফেরবার সময় হল। তার আগেই সব ঠিকঠাক করে ফেলা দরকার। আর তো দেরি করা চলে না।

কার কথা বলছেন? কিসের দেরি! বিস্ময়ের সুরে প্রশ্ন করল সদানন্দ।

দেরি বইকি বাবা। দু-মাস পেরিয়ে তিন মাসে পড়ল। চোখ মুখের চেহারা যা হয়েছে! বেরুতে দেওয়া যায় না। এর পরে জানাজানি হয়ে পড়বে। এই মাসের মধ্যেই একটা ভালো দিন দেখে দু-হাত এক করবার ব্যবস্থা করে ফেলতে চাই।

একটা কালো পরদা যেন সরে গেল সদানন্দের চোখের উপর

থেকে। বেরিয়ে পড়ল তারও চেয়ে কুৎসিত দৃশ্যপট। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অন্তরাত্মা বিষিয়ে উঠল। ঘুলিয়ে উঠল দেহের ভিতরটা, হঠাৎ কোনো উত্তর দেবার মতো মনের অবস্থা রইল না।

গুরু-পত্নী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বললেন, দেশের বাড়ি থেকে কাউকে আনাতে চাও? আমি বলছিলাম, ভাইদের সঙ্গে যখন তেমন যোগাযোগ নেই, আর আমরাই যখন একরকম তোমার বাপ-মা, তখন—

তিক্ত কণ্ঠে বাধা দিল সদানন্দ: ও, সেই জন্যেই বুঝি ওই মেয়েকে আমার গলায় ঝুলিয়ে দিতে চান?

ও মা! সে কি কথা! গলায় ঝুলিয়ে দেব কেন? তুমি তো নিজেই ওকে পায়ে ঠাঁই দিয়েছ বাবা।

পায়ে ঠাঁই দিয়েছি! আমি!

তা না হলে কি ওই অত্তবড় আইবুড়ো মেয়েকে এতটা মেলা-মেশা করতে দিই, না, সব জেনে-শুনেও নিশ্চিন্দি হয়ে বসে থাকি?

সব জেনে-শুনে! অনেকটা যেন আপন মনে আবৃত্তি করে গেল সদানন্দ। তার পর সুর চড়িয়ে বলল, কী জানেন আপনি? কতটুকু জানেন? আপনার ধারণা, ওর এই অবস্থার জন্যে দায়ী আমি?

তুমি একা কেন দায়ী হবে বাবা? ও নিজেও দায়ী। সন্তানের দায়িত্ব মায়েরও কম নয়!

কী বলছেন আপনি!—চীৎকার করে উঠে দাঁড়াল সদানন্দ, সব ভুল, সব মিথ্যা। আমি এর কিছুই জানি না।

জান না! বিস্ময়াহত শুষ্ক ক্ষীণ স্বরে বললেন চণ্ডীর মা। ও যে বললে—

ও বলেছে এই কথা? মিথ্যাবাদী! শয়তানী! গর্জে উঠেই হঠাৎ থেমে গেল সদানন্দ। মনে পড়ল, সেই গভীর রাত্রীর দম্ভোক্তি:

'দেখে নেব কোথায় থাকে তোমার চরিত্রের অহঙ্কার।' এই ভাবে শোধ নিল শেষকালে।

গুরু-পত্নী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন ঃ এ তুমি কী বললে সদানন্দ? তোমাকে যে আমরা ছেলের চেয়েও আপনার বলে জেনেছি।

ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকল চণ্ডী। মাকে ধরে টেনে তুলে বলল, কি করছ এখানে? চলে এসো।

মেয়েকে দেখেই আরও ভেঙে পড়লেন তিনি ঃ এ কী করলি সর্বনাশী! তোকে নিয়ে কোথায় যাব আমি!

তুমি কোথায় যাবে! যেতে যদি হয়, আমি একাই যাবো। বলে, আর কোনো কথা বলবার আগেই মাকে এক রকম টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল।

গুরুগৃহে সেই রাতটাই সদানন্দের শেষ রাত। কয়েকখানা পাঠ্যগ্রন্থ সম্বল করে নিশীথ-রাত্রির অন্ধকারে চিরদিনের মতো যখন বেরিয়ে এল, তখন এ কথা তার মনে হয় নি, সকলের অলক্ষে এই যে পালিয়ে যাওয়া, এ শুধু কাপুরুষতা নয়, নিজের উপরে আরোপিত অপরাধের নীরব স্বীকৃতি। যে মিথ্যা কলঙ্কের ভয়ে সে গৃহত্যাগ করছে, তাই সকলের চোখে সত্য হয়ে উঠবে। এ-সব কথা সেদিন বিচার করে দেখবার অবসর হয় নি। শুধু মনে হয়েছিল, যে পরিকল্পিত জঘন্য অভিযোগ, যে হীন ষড়যন্ত্র অক্টোপাসের মতো অষ্টবাহু বিস্তার করে তাকে জড়িয়ে ধরেছে, তার কবল থেকে নিজেকে বাঁচাবার একমাত্র পথ দূরে চলে যাওয়া। তাই গিয়েছিল। তার পর যখন পূর্ণ দৃষ্টিতে নিজের দিকে তাকাবার অবসর হল, দেখতে পেল দূরে গিয়েও বাঁচতে পারে নি। সর্বাঙ্গে জড়িয়ে গেছে দলিতা নাগিনীর প্রতিহিংসার বিষ। অন্যের চোখে না পড়লেও নিজের চোখকে এড়াবে কেমন করে?

যে কারণে ওখান থেকে চলে আসা, ঠিক সেই কারণেই বাড়ি

ফিরে যাওয়া চলে না। দুর্নাম এবং কলঙ্কের বিষদাঁত নিয়ে অক্টোপাস সেখানেও ধাওয়া করবে। তাই সেই দিন থেকেই শুরু হল সদানন্দের নিরুদ্দেশ ভ্রমণের দীর্ঘ সূচী। সে এক বিচিত্র জীবন! কখনও অনাহারে, কখনও ভিক্ষা! কোথাও সাদর আহ্বান কোথাও বা রূঢ় প্রত্যাখ্যান। এমনি ভাবে কেটে গেল কতদিন। তার পর আশ্রয় জুটল নবদ্বীপে এক পুঁথি-পাগল পণ্ডিতের জীর্ণ বৈঠকখানায়। কাজ তাঁর চেয়েও জীর্ণ পুঁথির পাঠোদ্ধার, তার অনুলিপি-লেখন এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে কখনও মুগ্ধবোধ, কখনও ভট্টিকাব্য, কখনও বা রঘুবংশ।

সেই বৈঠকখানার অন্ধকার কোণ থেকেই একদিন বেরিয়ে এল নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীসদানন্দ আচার্য কাব্য ব্যাকরণ স্মৃতিতীর্থ।

ব্রহ্মচারী সদানন্দ আচার্যের বৃত্তি ছিল ত্রিবিধ—দার্শনিক ক্রিয়া, শিক্ষাদান এবং কথকতা। ক্রমে ওই তৃতীয়টিই প্রধান হয়ে দাঁড়াল। ওদিকেই দেখা দিল শক্তির বিকাশ। দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল খ্যাতি। অর্থ হল, প্রতিষ্ঠা হল। কর্মজীবনে পুরুষ যা কামনা করে, যা পেলে নিজেকে মনে করে কৃতী এবং সকলকাম, সবই পেল সদানন্দ। সাধারণ জনের প্রীতি ও সম্মান, পণ্ডিত জনের স্বীকৃতি, তবু এই কর্মময় জীবনের কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়ে গেল। গৃহ? হাঁ, গৃহ-বন্ধনের রঙিন আকর্ষণ নির্জন অবসরে দেখা দিত বইকি ব্রহ্মচারীর গোপন মনে। সে বন্ধনের মূল যে জায়গায়, যাকে আশ্রয় করে পুরুষ গৃহ-রচনা করে, গৃহী হয়, সেখানটার কথা ভাবতে গেলেই তার চোখের উপর ভেসে উঠত একটি কুৎসিত কিন্তু অনিন্দ্য তনু অতৃপ্ত-যৌবনার উগ্রমূর্তি। ওই একটি নারীই এসেছিল সদানন্দের জীবনে, দিয়েছিল তার উত্তপ্ত দেহ-মনের নিবিড় স্পর্শ। কিন্তু তার মধ্যে মধু নেই, গন্ধ নেই, নেই দীপশিখার স্নিগ্ধতা। নারী যে কল্যাণদাত্রী, আরও যে কত রূপ আছে তার—প্রেমময়, সুধাময়, সে কথা সে পেয়েছে শুধু কাব্যের মধ্যে, অন্তরের মধ্যে নয়। গৃহি

গৃহমুচাতে—মহাকবির এই বাণী রইল শুধু তার জ্ঞান এবং প্রচারের মধ্যে, জীবনের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠল না।

এমনি করেই অজানতে কখন গড়িয়ে গেল বেলা। হঠাৎ চমক ভেঙে দেখতে পেল ব্রহ্মচারী, তার জীবনের আঙিনায় নেমে এসেছে অপরাহ্নের ছায়া।

আট

রাস-পূর্ণিমার উৎসব চলছে নবদ্বীপে। কত যাত্রী এসেছে দেশ-দেশান্তর থেকে। রাস্তার দু ধারে কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে দেখছে দীর্ঘ শোভাযাত্রা, ভিড় করেছে মেলায়, মন্দিরে স্নানের ঘাটে। উৎসবের উদ্যোক্তারা পোড়ামাতলার মোড়ে বিস্তৃত শামিয়ানার নীচে এক বিরাট সভার আয়োজন করেছেন। কথকতা করবেন ব্রহ্মচারী সদানন্দ। তিলধারণের স্থান নেই কোনোখানে। সব স্তরের সব বয়সের নরনারী। মিশ্র কোলাহলে ভরে উঠেছে সভাঙ্গন। মঞ্চের উপর শীর্ণকায় দীর্ঘাঙ্গ ব্রহ্মচারীর গৈরিক আভাস দেখা যেতেই সব স্তব্ধ হয়ে গেল।

শহরের গণ্যমাণ্য ব্যক্তিরা প্রায় সকলেই উপস্থিত। তাঁদেরই মধ্যে একজন 'কথক-ঠাকুরের' গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, বাক্‌নিপুণ ইত্যাদি বহু গুণাগুণ উল্লেখ করে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন, যদিও তার প্রয়োজন ছিল না। ব্রহ্মচারী আসন গ্রহণ করে স্মিত মুখে বিশিষ্ট শ্রোতাদের দিকে চেয়ে জানতে চাইলেন, কোন্ কাহিনী তারা শুনতে চান?

প্রভুর যা অভিরুচি—বিনীত কণ্ঠে উত্তর দিলেন জনৈক প্রবীণ শিষ্য।

কয়েক মুহূর্ত বিশাল জনতার দিকে তাকিয়ে রইল সদানন্দ। তারপর শুরু হল কচ ও দেবযানীর অমর উপাখ্যান। অশ্রান্ত গতিতে এগিয়ে চলল অধ্যায়ের পর অধ্যায়। মহাভারতের মৌলিক বর্ণনার সঙ্গে মিশ্রিত হল রবীন্দ্র-কাব্যের মাধুর্য ও কল্পনা এবং তার সঙ্গে যুক্ত রইল ব্রহ্মচারীর নিজস্ব ভাষা, ভঙ্গী আর কণ্ঠের লালিত্য।

দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ। দৈত্যগুরুর দ্বারে ভিক্ষাপ্রার্থী। যে সঞ্জীবনী বিদ্যা দেবতার অনায়ত্ত, দেবলোকের হিতার্থে তাই তাঁকে অর্জন করতে হবে। সেই দুর্জয় আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এসেছেন শুক্রাচার্যের কাছে। সমস্ত দৈত্যকুল তাঁর প্রতিকূল। দৈত্যগুরু তার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেছেন। জানিয়ে দিয়েছেন, দেব-তনয়কে শিষ্যরূপে গ্রহণ করতে তিনি অনিচ্ছুক ও অসমর্থ। কিন্তু কচকে নিরস্ত করা গেল না। সমস্ত বিপদ-বাধা বরণ করে কঠোর তপস্যায় গুরুর অনুগ্রহ লাভের জন্য আত্মনিয়োগ করলেন।

শুক্রাচার্যের স্নেহধন্যা তরুণী কন্যা দেবযানী। শুধু কন্যা নয়, প্রিয়শিষ্যা এবং আচার্যের দুর্লভ বিদ্যার অধিকারিণী। এই দৃঢ়কাম তরুণী দেবপুত্রের অপূর্ব কান্তি, বিনয়নম্র সুমিষ্ট আচরণ এবং অনমনীয় অধ্যবসায় তাঁর নারীহৃদয়কে স্পর্শ করল। সকলের কাছে অবাঞ্ছিত এই নির্বান্ধব বিদেশী তার প্রসন্ন দৃষ্টি লাভ করলেন।

কন্যার অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে শুক্রাচার্য কচকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করলেন। গুরু-বলই বিদ্যার্থীর কঠোর জীবন। সহস্র-বৎসরব্যাপী দুরন্ত সাধনা। নিরলস কর্মে এবং সুদুর্লভ অবসরে দেবযানী রইল তাঁর পাশে, প্রীতিময়ী প্রবাস সঙ্গিনী। পাঠগৃহে, প্রাসাদের অলিন্দে, নির্জন বনচ্ছায়ায়, নিরালা নদীতীরে ছায়ার মতো দিল তাঁকে সঙ্গ সখ্য এবং সাহচর্য।

অকস্মাৎ একদিন রাত্রির অন্ধকারে নিভৃত শয্যায় কচের দৃষ্টি

পড়ল তাঁর গোপন অন্তরের পানে। কেউ জানে না, কখন কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে তারই উপরে অঙ্কিত হয়ে গেছে এক রূপময়ী দৈত্যবালার মোহিনী মূর্তি। নিমেষের তরে বিস্ময়ে, পুলকে, বেদনায় তাঁর তরুণ-হৃদয় ভরে উঠল। পরমুহূর্তেই ফিরে এল সেই কঠোর প্রতিজ্ঞা—যে-ব্রত গ্রহণ করেছি, যে উদ্দেশ্য নিয়ে বরণ করেছি এই শত্রুপুরীর লাঞ্ছনা, তার পরিপূর্ণ সাফল্যই আমার একমাত্র লক্ষ্য। তার পূর্বে নিজের সুখ, দুঃখ, শুভাশুভ কিছুই জানি না। কর্তব্যের কাছে হৃদয়বৃত্তির স্থান নেই।

এমনই করে কেটে গেল সহস্র বৎসর। গুরু প্রীত হলেন। দান করলেন বহুবাঞ্ছিত সঞ্জীবনী বিদ্যা।

উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পর যাত্রার আয়োজন করলেন কচ। আচার্যকে প্রণাম করে বিদায় নিতে গেলেন দেবযানীর কাছে। কিন্তু সে বিদায় কি এত সহজ? সেখানে যে রয়েছে সেই চিরন্তনী নারী, মাতৃরূপে, কন্যারূপে অনন্তকাল যে পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে বহির্মুখী পুরুষের; স্নেহ দিয়ে, প্রেম দিয়ে বাঁধতে চেয়েছে প্রিয়জনে; অশ্রু দিয়ে গাঁথা মায়াডোর জড়িয়ে দিয়েছে তার হাতে; কোমল বাহু প্রসারিত করে বলেছে 'যেতে নাহি দিব'। কিন্তু নির্মম পুরুষ সে ব্যাকুল ডাক কোনোদিন শোনে নি। যে শুনেছে, তাকেও ছিনিয়ে নিতে গেছে বৃহত্তর জীবনের দীর্ঘতর, প্রবলতর বাহু। যাবার সময় সব স্নেহপাশ সে বাসী ফুলের মালার মত পথ প্রান্তে ফেলে দিয়ে গেছে।

এখানেও তারই পুনরাবৃত্তি হল। সেই বিদায়ের ক্ষণে দেবতার কাছে প্রেম নিবেদন করল দৈত্যকন্যা দেবযানী। যথারীতি ব্যর্থ হল তার আবেদন।

নারী সব সইতে পারে। সংসারে এমন কোনো দুঃখ নেই, আঘাত নেই, যা সে যুগ-যুগ ধরে বুক পেতে গ্রহণ করে নি। কিন্তু সে সইতে পারে না প্রেমের প্রত্যাখ্যান। সে আঘাত যখন আসে, কেউ ভেঙে পড়ে, কেউ জ্বলে ওঠে নাগিনীর মতো। দেবযানীও জ্বলে উঠল। হৃদয়

ভরে অমৃতের ভাণ্ডার সঞ্চয় করে রেখেছিল যার জন্য, তারই উপরে ঢেলে দিল অভিশাপের বিষ—যে বিদ্যার অভিমানে প্রেমকে অবহেলা করেছ, সে বিদ্যা তোমার ব্যর্থ হবে, সে শুধু ভার হয়ে থাকবে তোমার জীবনে।

সভাভঙ্গের পর জনতার ভিড় হালকা হয়ে গেছে। অনুরাগী বন্ধু এবং শিষ্যদের কাছে বিদায় নিয়ে গৃহে ফিরছিল সদানন্দ। একাই চলেছিল গলি-পথ দিয়ে। অনেকেই এগিয়ে দিতে চেয়েছিল। কাউকে সঙ্গে নেয় নি। কেমন একটা একা থাকবার তাগিদ অনুভব করছিল মনে মনে। আনমনে পথ চলতে চলতে ভাবছিল, এইমাত্র যে কাহিনী সে শুনিয়ে এল, তার একটা ক্ষীণ সুর কোথায় যেন জড়িয়ে আছে তার নিজের জীবনের মধ্যে; কোথায় যেন একটুখানি মিল। শুধু কচের কথাই সে বলে নি, বলে এসেছে নিজের কথা। আর তার সঙ্গে—

রাস্তার মাঝখানে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সদানন্দ। ঠিক তার সামনে মুখোমুখি যে দাঁড়িয়ে আছে, সে কি সত্য না শুধু চোখের বিভ্রম? এতদিন পরে আপনার অজ্ঞাতে স্মৃতির কোঠায় যার ছায়া পড়েছিল, সে কায়া হয়ে দেখা দিল কেমন করে! অথবা এ শুধু তার বিভ্রান্ত কল্পনা।

দু-হাতে চোখ রগড়ে আর-একবার তাকিয়ে দেখল ব্রহ্মচারী। না, ভ্রান্তি নয়, সত্যিই সে দাঁড়িয়ে আছে। মুখের বাঁ দিকটা আঁচলে ঢাকা। ডানদিকের যেটুকু প্রকাশ, তার মধ্যে ভুল করবার অবকাশ নেই। কিন্তু এই কি সে, না তার মুখোশ পরে দাঁড়িয়ে আছে কোনো প্রেত? কোথায় গেল চোখের সেই বিদ্যুৎ-ঝলক, ওই কালো চোখের তারা থেকে যা ঠিকরে পড়ত একদিন! সর্বাঙ্গে দৃষ্টি পড়তেই শিউরে উঠল সদানন্দ। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হল না, এই দেহই একদিন তরঙ্গ তুলেছিল তার রক্তধারায়।

কেমন আছ? নিস্পৃহ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল চণ্ডী। বীণার ঝঙ্কার নয়, কেমন একটা ভাঙা-ভাঙা ধার-ক্ষয়ে-যাওয়া সুর।

ভালো। তুমি?

আমি? হাসির কুঞ্চনে আরও কুৎসিত দেখাল মুখখানা, যেমন দেখছ। বাসা কোথায়?

মাঝের পাড়ায়।

যাব একদিন। বলেই এগিয়ে গেল রাস্তার ধার ঘেঁষে।

একবার ইচ্ছা হল ব্রহ্মচারীর, ডেকে ফিরিয়ে বলে, না, আমার বাড়িতে এসো না তুমি। কোনো তরফেই তার আর প্রয়োজন নেই। কিন্তু বলা হল না।

তিন-চারদিন পরে প্রাতঃসন্ধ্যা সেরে বারান্দায় বেরোতেই একটা অপরিচিত লোক উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল। শরীর ও পোশাক দুই-ই অপরিচ্ছন্ন। কৃত্রিম হাসির ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল দুপাটি কদর্য দাঁত।

আপনার কাছে এলাম।

কে আপনি?

আমাকে আপনি ঠিক চিনবেন না। তবে আমার ইয়ে—মানে, ঘরের মানুষটি আপনার অনেক দিনের চেনা।

একটু থেমে ব্রহ্মচারীর সন্দেহ-কুঞ্চিত ভ্রূর দিকে চেয়ে যোগ করল: চণ্ডীর কথা বলছি।

চণ্ডী আপনার স্ত্রী?

না-না! জিব কেটে মাথা নাড়ল লোকটা, হাজার হলেও সে বামুনের মেয়ে। শুধু বামুন কেন, গুরুবংশের মেয়ে। তবে হ্যাঁ, এক সঙ্গেই যখন আছি আজ চব্বিশ-পঁচিশ বছর, তখন বুঝতেই তো পারছেন, জ্ঞানী লোক আপনি। বলে, আবার হেসে উঠল সেই কুৎসিত হাসি।

আমার কাছে আপনার কী দরকার?— রূঢ় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল সদানন্দ।

দরকার সামান্যই। মা মেয়ে দুজনকেই পুষতে হয়। যা দিনকাল। দেখুন না, কার বোঝা কে বয়!

আর কিছু বলবার আছে আপনার?

না, আর কিছু না। শুধু গোটা পঞ্চাশেক টাকা হলেই আপাতত—

মাফ করবেন। আপনি এবার আসতে পারেন।

আসবো বইকি। তবে টাকাটা দিয়ে দিলে পারতেন ঠাকুরমশাই। আপনার ভালোর জন্যেই বলছি।

ব্রহ্মচারী ঘরে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছিল। ফিরে দাঁড়িয়ে রুক্ষ-দৃষ্টি মেলে জানতে চাইল, তার মানে?

মানে, আপনার সঙ্গে ওর আসল সম্পর্কটা তাহলে গোপনই থেকে যেত।

কী বলতে চান আপনি?

আজ্ঞে, সেটা আমার চেয়ে আপনিই ভালো জানেন। এখানে অবিশ্যি এখনও কেউ জানে না। কিন্তু জানতে কতক্ষণ? ভেবে দেখুন, তারপরে—

জানেন, আপনাকে আমি পুলিসে দিতে পারি।

পুলিস!—বিকট শব্দ করে হেসে উঠল লোকটা: তাতে আপনার বিশেষ সুবিধে হবে না, পণ্ডিতমশাই। তাছাড়া করালী কুণ্ডু কারও চোখ রাঙানোকে পরোয়া করে না। যাক, এবার তাহলে আসি। পেন্নাম।

হনহন করে বেরিয়ে যাচ্ছিল করালী। ব্রহ্মচারী ডেকে ফেরাল: শোনো, চণ্ডী পাঠিয়েছে টাকার জন্যে?

না, তা ঠিক নয়।—আমতা আমতা করে বলল লোকটা, তবে টাকার দরকার তারই। অসুখে পড়ে আছে। কদিন কাজে বেরোতে পারে নি। আমিও বেকার বসে আছি। সেয়ানা মেয়েটাকে—

কথা শেষ করবার আগেই ঘরের মধ্যে চলে গেল ব্রহ্মচারী, সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে পাঁচখানা নোট ওর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, আর কোনোদিন এসো না।

না-না, আর আসতে হবে না। নোটগুলো কুড়িয়ে নিয়ে কোঁচার খুঁটে বাঁধতে বাঁধতে বলল করালী, এতেই কাজ হবে।

কিন্তু পাঁচ-সাত দিন না যেতেই আবার এসে দাঁড়াল সেই-খানটিতে। গড়গড় করে বলে গেল একঝুড়ি কথা, যার সারমর্ম—মা-মেয়ের কাপড় নেই, ঘরের বার হতে পারে না। গোটা দশেক—ইত্যাদি।

দশটা টাকা দিয়ে বিদায় করল ব্রহ্মচারী। তার কদিন পরেই এল মোটা অঙ্কের তাগিদ। ছ-মাস থেকে বাড়িভাড়া বাকী। চণ্ডীকে অপমান করে গেছে বাড়িওয়ালা। কুৎসিত ইঙ্গিত করেছে বয়স্থা মেয়েটাকে জড়িয়ে। ভয়ানক কান্নাকাটি করছে ওরা। সন্ধ্যার মধ্যেই যেমন করে হোক বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে।

সত্যিই তো, ওদেরই বা দোষ দিই কেমন করে?—হাত পা নেড়ে বিজ্ঞের ভঙ্গিতে বলল করালী, আজ না হয় সব গেছে। আসলে তো অত বড় একজন নামকরা পণ্ডিতের মেয়ে! সেই কথা বিবেচনা করে আমিও মশাই ফেলে আসতে পারলুম না। ওদের ওখানে গিয়েই জড়িয়ে পড়লাম। সেই যে চেপে ধরল, আর ছাড়বার নামটি নেই। কী করি বলুন? ঘাড়ে যখন এসে চাপল, একটা ঐ বয়সের মেয়েছেলেকে তো আর রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া যায় না। আমারও তখন বিশেষ কোনো ঝঞ্ঝাট নেই। বউ মারা যাবার পর আর সংসার করি নি। আপনার আশীর্বাদে অবস্থাও মন্দ ছিল না। তিনখানা বাড়ি ঢাকা শহরে। ভাড়া যা আসত—তিনটি তো মোটে প্রাণী—হেসে-খেলে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু হিন্দুস্থান-পাকিস্তান হতেই সর্বনাশ ঘটল। তার পরেও অনেকদিন পড়েছিলাম। ওই মেয়েটা সেয়ানা হয়ে উঠতেই চলে আসতে বাধ্য হলাম।···সে যাক গে। এবার

কোনোক্রমে দায় উদ্ধার করে দিন। আর আসব না আপনার কাছে।

ব্রহ্মচারী কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ কানে গেল, দায়টা তো আসলে আপনারই—

কী বললে? গর্জে উঠল সদানন্দ।

আজ্ঞে, মানে—

মনে করেছ, কতকগুলো মিথ্যা কুৎসার ভয় দেখিয়ে বরাবর এমনই টাকা আদায় করে যাবে, না?

আজ্ঞে না, ভয় দেখাব কেন? আমি বলছিলাম—

যাও। মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে দরজার দিকে আঙুল তুলে ধরল সদানন্দ।

কী বলছেন?

বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে।

করালী উঠে দাঁড়িয়ে রক্তচক্ষু মেলে বলল, এটাই কি আপনার শেষ কথা?

হ্যাঁ, শেষ কথা। আর কোনোদিন যেন তোমাকে দেখতে না পাই।

আচ্ছা!—লম্বা চুলগুলোয় একটা উদ্ধত ঝাঁকানি দিয়ে বেরিয়ে গেল করালী।

দিন তিনেক পরেই এল আবার বাই'র যাবার নিমন্ত্রণ। বর্ধমান অঞ্চলে পর পর গোটাকয়েক ধর্মসভায় ভাগবত-পাঠ শেষ করে কথকতার বায়না নিয়ে যেতে হল মুর্শিদাবাদ। সেখান থেকে মালদা হয়ে নবদ্বীপ ফিরতে মাস পেরিয়ে গেল।

ফিরে আসবার কয়েকদিন পর। অন্ধকার রাত। দশটা বেজে গেছে। বিশ্রামের আয়োজন করছিল ব্রহ্মচারী। দরজার কড়াটা নড়ে উঠল। একটু বিরক্তির সঙ্গে খুলে দিয়ে হ্যারিকেনের আলোটা উঁচু করে ধরতেই মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, তুমি!

খুব অবাক হয়ে গেছ, না? দরজা পার হয়ে ভিতরের দিকে পা বাড়াল চণ্ডী।

তুমি বোধহয় জান না, এ বাড়িতে আমি একা থাকি।

তার মানে, কেউ দেখে ফেললে দুর্নাম দেবে, এই তো?

মিথ্যা দুর্নামের ভয় আমি করি না।

একদিন কিন্তু করেছিলে। সে যাক। আজ নিশ্চিন্ত থাকতে পার। এ রূপ দেখে সে ভুল কেউ করবে না। বড় জোর ভাববে, ভিক্ষা চাইতেই এসেছি কোনো রাস্তার ভিখিরী। আর সত্যিই তাই। একটা ভিক্ষে চাইতে এসেছি তোমার কাছে। বলে, বসে পড়তে যাচ্ছিল উঠানের এক পাশে।

ব্রহ্মচারী বাধা দিয়ে বলল, বারান্দায় উঠে বোসো। আচ্ছা দাঁড়াও। বলে, ঘরের দিকে পা বাড়াল একটা কিছু এনে পেতে দেবার জন্যে।

থাক; আর কিছু লাগবে না। এই মেঝেতেই বসছি। একটুখানি দাঁড়িয়ে থাকলেই পা ধরে যায়।—সলজ্জ মৃদু হাসির সঙ্গে বলল চণ্ডী।

ব্রহ্মচারীর একবার ইচ্ছা হল জিজ্ঞাসা করে, শরীর এরকম হল কী করে? কী অসুখ করেছিল? তখনই মনে হল, করালীর মুখে সেদিন সামান্য যেটুকু জেনেছে তার পরে এ প্রশ্ন নিরর্থক। চণ্ডীই আবার কথা পাড়ল—যেন কতদূর থেকে ভেসে এল তার স্বর—তুমি তো চলে এলে। মাসখানেকের মধ্যে মাও সরে পড়ল। সেই যে বিছানা নিয়েছিল, আর উঠল না। আমার অবস্থা তখনো বাবার নজরে পড়ে নি। মা বলে যেতে পারে নি, হয়তো ইচ্ছা করেই বলে যায় নি। ওই লোকটা এসেছিল বাবাকে পৌঁছে দিতে। তারপর আর নড়তে চায় না। লোকের কাছে বলে বেড়ায়, গুরুকে এই অবস্থায় ফেলে যায় কেমন করে। কিন্তু তার আসল টানটা যে কোথায় আমি প্রথম দিনই টের পেয়েছিলাম। তার সুযোগ নিলাম। দুর্গা বলে ঝুলে পড়লাম ওই করালীর কাঁধে। তখনো ও সবকিছু জানে না। যখন জানল, লাথি মেরে দূর করে দিতে পারত। কিন্তু

দেয় নি। বরং অনেক কিছু করেছে আমার জন্যে—যা আপনার লোকেরা কেউ কোনোদিন করত না।

জ্যাঠামশাই কোথায় আছেন? চণ্ডী একটু থামতেই প্রশ্ন করল ব্রহ্মচারী।

কী করে জানব? বাড়ি ছাড়বার পর আর খবর পাই নি। এতদিন কি আর বেঁচে আছেন? থাকলেও কোথায় আছেন, কেমন আছেন, কোনোদিনই জানতে পারবো না।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে গলাটা একটু ধরে এল। একটুখানি ছেদ পড়ল কথার মাঝখানে। তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে আবার শুরু করল: যাক্, যা বলতে এসেছিলাম, শোনো। বুঝতেই পারছ, তুমি হঠাৎ চলে আসবার পর আমাকে জড়িয়ে অনেক কথাই রটেছিল তোমার নামে। করালীর কানেও গিয়েছিল নিশ্চয়ই। নবদ্বীপে এসে আমার আগে ও-ই জানতে পারে, তুমি এখানে আছ। মাঝে মাঝে বলতেও শুনেছি তোমার কথা। কিন্তু ও যে এখানে আসা-যাওয়া করে, ঘুণাক্ষরেও জানতে পারি নি। হঠাৎ একদিন শুনলাম, আমার নাম করে টাকার জন্যে উৎপাত করছে তোমার ওপর। ছিঃ ছিঃ, কী লজ্জা বল তো?

সদানন্দ প্রতিবাদ করল: না, না, উৎপাত করবে কেন? তা ছাড়া টাকা সে তোমার হয়ে চায় নি।

আমার হয়ে না চাক, টাকার দরকার যে আমার জন্যেই, সে কথা নিশ্চয়ই বলেছে। তা হলে আর বাকী রইল কী?

যেখান থেকেই হোক, সে দরকারটা যদি আমি জেনে থাকি, সেটা কি তোমার এতই লজ্জার কথা?

হয়তো একটু মৃদু অভিমান প্রচ্ছন্ন ছিল সদানন্দের এই প্রশ্নের অন্তরালে। চণ্ডীর কাছে কি তা ধরা পড়েনি? পড়লেও সে জানতে দিল না। স্থির সহজ সুরেই বলল, ঠিক বলেছ। কারও কাছে হাত পাততেই আজ আর আমার লজ্জা করা চলে না।

কারও কাছে। আহত হল সদানন্দ। কিন্তু কী বলবার আছে? যে দূরে ছিল, সে যদি দূরেই থাকতে চায়, একজনকে সবার থেকে আলাদা করে না দেখতে চায়, নালিশ জানাবে সে কার কাছে? তবু চুপ করে থাকতে পারল না। একটু ক্ষোভের সঙ্গে বলল, আমার কথাটা তুমি বোধ হয় বুঝতে পার নি।

বুঝে কি লাভ বলো?—সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল চণ্ডী: টাকা তুমি দিতে পার, দেবার ইচ্ছাও হয়তো আছে, কিন্তু নেবারও তো একটা অধিকার থাকা চাই। তা যদি থাকত, করালীর আগে আমি নিজেই আসতাম তোমার কাছে। সে যাক গে। আমার আসল কথাটাই যে এখনও বলা হয় নি। তোমাকে কিন্তু শুনতে হবে, নন্দদা। বলো, শুনবে?

আমি তো বুঝতে পারছি না, কী বলবে তুমি! সাধ্যমত হলে নিশ্চয়ই শুনবো।

চণ্ডী ক্ষণকাল নীরব থেকে বলল, তোমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে।

চলে যেতে হবে! কেন?—অতিমাত্রায় বিস্মিত হল সদানন্দ।

কারণটা যদি না বলি। না হয় মেনেই নিলে আমার একটা কথা।

ব্রহ্মচারী নিরুত্তর। মুখ ফোটা দূরে থাক মনে মনেও বলতে পারল না, বেশ, তাই নিলাম। মেনে নিলাম তোমার কথা।

চণ্ডী কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল, যদি জিজ্ঞেস কর, যা বলব কোনো প্রশ্ন না তুলে চোখ বুজে মেনে নেবার মতো কী পরিচয় আমি তোমাকে দিয়েছি, আমার কোনো উত্তর নেই। না যদি শোনো, তা হলেও আশ্চর্য হব না। শুধু ভেবে দেখতে বলব, বড় রকম কারণ না থাকলে এত রাত্রে এই অনুরোধ নিয়ে তোমার কাছে ছুটে আসতাম না।

সদানন্দ তখনও নির্বাক। কী সে বড় কারণ, এত কথার পর জানতে চাওয়াও যেমন সহজ নয়, না জেনে এই অনুরোধ রক্ষা করাও

তেমনই কঠিন। চণ্ডী অনুনয়ের সুরে বলল, যত শীগগির পার তুমি কোথাও চলে যাও, নন্দদা। ভগবান তোমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন, যেখানে যাবে, লোকে তোমাকে মাথায় তুলে নেবে। যশ বল, অর্থ বল, কোনো দিকেই কোনো ক্ষতি হবে না।

লাভ-ক্ষতিটাই একমাত্র জিনিস নয়।—শুষ্ক গম্ভীর সুরে বলল সদানন্দ, তার চেয়েও অনেক বড় জিনিস আছে মানুষের জীবনে। আমার যা কিছু সব এইখানে। নবদ্বীপের কাছে আমি অনেকভাবে ঋণী। হঠাৎ তাকে ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

সম্ভব নয়? - ক্ষীণ নৈরাশ্যের সুরে যেন আবৃত্তি করে গেল চণ্ডী। নিশ্বাস ফেলে বলল, তা হলে আর কী করতে পারি আমি?

সদানন্দ একটু ইতস্ততঃ করে বলল, কেন চলে যেতে বলছ, জানাতে বাধা আছে কি? তোমার যদি কোনো সুবিধা হয় তা হলে বরং—

চণ্ডীর মুখে ফুটে উঠল এক মর্মান্তিক হাসি। বাধা দিয়ে বলল, আমার সুবিধা! আর একদিন যে কাউকে কিছু না বলে গভীর রাত্রে চলে গিয়েছিলে, সেও কি আমার সুবিধার জন্যে?

না, তার মধ্যে নিছক দুর্বলতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বলতে পার, পালিয়ে গিয়েছিলাম। অপবাদ, তা সে যত বড় মিথ্যাই হোক, সাহস করে তার মুখোমুখি দাঁড়াতে পারি নি।

কিন্তু আজ আবার যদি আসে তার চেয়েও বড় কলঙ্কের অপবাদ, তার চেয়েও মিথ্যা, জঘন্য, কুৎসিত?

ব্রহ্মচারী হাসল, নিরুদ্বেগ প্রশান্ত হাসি। অত্যন্ত সহজ সুরে বলল, তা হলেও আজ আর পালাবার প্রয়োজন নেই। মিথ্যার ভয় আমার ঘুচে গেছে।

তুমি বুঝতে পারছ না, নন্দদা।—আর্তকণ্ঠে বলে উঠল চণ্ডী, ওই করালীকে তুমি চেন না। ও মানুষ নয়, সাপ। সাপের চেয়েও

নিষ্ঠুর। কখন কোন্ পথে, কী ভাবে যে ছোবল মারবে, স্বপ্নেও ভাবতে পার না।

এই জন্যেই কি তুমি আমাকে চলে যেতে বলছ?

একে তুমি তুচ্ছ করে দেখো না নন্দদা। তা ছাড়া—

তা ছাড়া কী, বলো?

বুঝতে পারছি, আমিই বোধহয় ওর অস্ত্র। আমাকে দিয়েই হয়তো শোধ তুলবে তোমার ওপর। নিজে থেকেই তোমার অনেক অনিষ্ট করেছি। এতদিন পরে আবার আমার হাত দিয়েই আসবে তোমার চরম ক্ষতি। না নন্দদা, তোমার পায়ে পড়ি আমার এই শেষ কথাটা রাখো। নবদ্বীপ ছেড়ে চলে যাও তুমি। দেরি করলে হয়তো সর্বনাশ হয়ে যাবে।

উঠানে নেমে ব্রহ্মচারীর পা দুটো চেপে ধরল। বেদনার্ত চোখ তুলে তাকিয়ে রইল তার মুখের দিকে। আজ আর সরে গেল না সদানন্দ। পা দুটোও ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল না। কিছুক্ষণ নির্লিপ্ত দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে বলল, রাত অনেক হল। এবার তুমি বাড়ি যাও।

আমি এখনই যাচ্ছি। তুমি কথা দাও।

কথা দিতে পারি না। তবে তোমার কথা আমি ভেবে দেখবো।

চণ্ডী আর কিছু বলল না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। তারপর আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে নির্জন অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত সদানন্দের বিনিদ্র চোখের উপর জেগে রইল দুঃখে দৈন্যে লাঞ্ছনায় ভেঙে-পড়া একটি কুরূপা নারীমূর্তি, কানে আসতে লাগল তার উৎকণ্ঠায়-ভরা ব্যাকুল আবেদন। অন্তরের তলদেশ থেকে ভেসে এল একটি তিরস্কারের সুর—একদিন, যাকে সব দিতে পারতে, আজ তার এই সামান্য কথাটা রাখতে পারলে না! এ

ভিক্ষা তো সে নিজের জন্যে চায় নি, চেয়েছে তোমারই জন্যে, তোমারই মঙ্গল কামনায়।

সে সুর ডুবিয়ে দিয়ে জেগে উঠল ক্ষুব্ধ উত্তর। কিন্তু কেমন করে ভুলি, এই নারীই একদিন চরম অভিশাপ নিয়ে এসেছিল আমার জীবনে। কে সে? তার সঙ্গে কী আমার সম্পর্ক যে তারই কথায় ছেড়ে যেতে হবে বহু যত্নে, বহু সাধনায় গড়ে তোলা এই যশ-খ্যাতি, অর্থ, আনুগত্য, এই বহুবিস্তৃত সামাজিক প্রতিষ্ঠা? এ তো ঠুনকো জিনিস নয় যে, একটা মিথ্যা অপবাদের ঘায়ে ভেঙে পড়বে?

তবু ভেঙে পড়ল। কদিন পরে এল সেই দুর্জয় আঘাত। এল ওই চণ্ডীর দিক থেকে, তারই মেয়ের রূপ ধরে। করালী কুণ্ডুর নিপুণ হাতে সাজানো রঙ্গমঞ্চে প্রধান ভূমিকা নিল মায়া। অত্যন্ত অতর্কিতে তারই হাত থেকে ছুটে এল ব্রহ্মচারীর মৃত্যুবাণ। অমোঘ সে অস্ত্র, এবং তারই আঘাতে ব্রহ্মচারী মরল—কলঙ্কময় অপঘাত মৃত্যু। এত বড় প্রতিষ্ঠা এবং এতদিনের সুনাম তাকে বাঁচাতে পারল না। অত বড় গর্ব ও গৌরবের ধন যে নবদ্বীপ, সেও তাকে রক্ষা করতে এগিয়ে এল না।

আমার সরকারী বাসভবনের এক কোণে লিখবার ঘরে বসে ব্রহ্মচারী যখন তার কাহিনী শুরু করে, তখন বেলা আছে। তারপর কখন সেই বেলাটুক ফুরিয়ে গিয়ে সন্ধ্যা নেমেছে, রাত্রি এসেছে। কিছুই বুঝতে পারি নি।

চাকর এসে আলোর সুইচটা টিপে দিতেই হঠাৎ খেয়াল হল, ব্রহ্মচারীর মৃদুকণ্ঠ কখন থেমে গেছে, এবং তার পরেও অনেকক্ষণ আমরা দুজনে অন্ধকারে মুখোমুখি বসে আছি, আলো জ্বালবার কথাটাও মনে হয় নি। এবার নড়েচড়ে বসে ডাকলাম, ব্রহ্মচারী! ক্ষীণ অস্পষ্ট কণ্ঠে সাড়া দিয়ে সদানন্দ মুখ তুলে তাকাল। বললাম, আমার সেদিনের কথাটা তোমার মনে আছে?

ব্রহ্মচারী জবাব দিল না। জিজ্ঞাসা করল না, কোন্ দিনের কথা জানতে চাইছি। তার মুখের উপর ফুটে উঠল একটি পরিম্লান করুণ হাসি, যার অর্থ কোন্ কথাটা মনে নেই জিজ্ঞেস করুন।

হয়তো আমার কণ্ঠস্বরেও সেই বিশেষ দিনটিতে ফিরে যাবার কোনো সুর শোনা গিয়েছিল, জেলখানার আপিসে শেষবারের মতো যেদিন ওর সঙ্গে আমার দেখা। বললাম, একটা নির্দোষ মানুষ জেলে পচতে লাগল, এই ভেবে অনেকখানি ক্ষোভ ছিল আমার মনে। তারই খানিকটা প্রকাশ করতে গিয়েছিলাম। তুমি বাধা দিয়ে বলেছিলে, 'আমি তো নির্দোষ নই।' শুনে বড় কষ্ট পেয়েছিলাম সেদিন।

জানি, স্থির মাথা নত করে বলল ব্রহ্মচারী, তবু যা সত্য, না বলে আমার উপায় ছিল না।

অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে বললাম, কোন্‌টা সত্য? কী বলতে চাও তুমি? এ কাহিনী যদি মিথ্যা না হয়—

কাহিনী আমার মিথ্যা নয়। শেষটুকু শুধু বাকী আছে। তাই বলেই আজকের মতো বিদায় নেবো।

আমি অপেক্ষা করে রইলাম। ব্রহ্মচারী একটু চিন্তা করে ধীরে ধীরে শুরু করল সাধারণভাবে বলতে গেলে নির্দোষ কথাটার অর্থ - যে দোষ করে নি। আইনের চোখেও তাই। অপরাধ মানে কোনো অপরাধমূলক কাজ। কিন্তু মনুষ্যত্বের দরবারে এইটাই কি দোষ-বিচারের মাপকাঠি? দোষ বলুন, অপরাধ বলুন, তার জন্ম আমার মনের মধ্যে। তাই যদি হয়, যে মুহূর্তে সে জন্মাল, তখন থেকেই কি আমি অপরাধী নই? অপরাধটা আমার কাজের মধ্যে দেখা দেয় নি বলেই সে নেই, দোষের কাজ করি নি বলেই আমি নির্দোষ, তা কেমন করে বলি?

বললাম, তত্ত্ব হিসাবে কথাটা মন্দ লাগছে না, যদিও বেশ জটিল। ওসব রেখে বরং আসল ব্যাপারটা খুলে বলো।

তাই বলব। শুধু একটা দিনের কথা। আমার জীবনের সেই মহা পরীক্ষার দিন।

প্রাতস্নান আমার চিরদিনের অভ্যাস। সেদিন একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি কাপড়-গামছা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়েছি, উঠোনের কোণে নজর পড়তেই চমকে উঠলাম। কুয়োতলায় বাসন মাজছিল একটি মেয়ে। কখনও দেখি নি, তবু তার দেহেব প্রতিটি রেখা যেন আমার চিরজীবনের চেনা। মুখ থেকে আপনা হতেই বেরিয়ে গেল, কে তুমি ?

আমার নাম ময়না।

কার মেয়ে তুমি ?

আমাব মায়ের নাম চণ্ডী দেবী।

মায়ের সঙ্গে মেয়ের মিল খুব বেশী নয়। সে রং পায় নি, গড়ন কিছুটা পেলেও সে রূপ পায় নি। তবু সব মিলিয়ে কী ছিল তার দেহে বলতে পাবব না। হঠাৎ যেন বহু বছর পিছনে ফিরে গেলাম, বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো আমার সমস্ত চেতনার মধ্যে জ্বলে উঠল এমনই একটা মুহূর্ত— যেদিন প্রথম দেখেছিলাম ওর মাকে। সেদিনের কথা আপনাকে আগেই বলেছি। নারীদেহের যে তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেছিলাম সেই প্রথম, প্রবৃত্তির তাড়না, তারই তাণ্ডবে মেতে উঠল আমার বার্ধক্যের শীতল রক্ত। তারই জ্বালা বোধ হয় ফুটে উঠেছিল আমার চোখের মধ্যে। সেদিকে একবার তাকিয়েই অস্ফুট চীৎকার করে সরে গিয়েছিল মেয়েটা।

নিজেকে কোনোমতে টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেলাম। দরজার ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল করালী। আমাকে দেখেই হেসে উঠল তার সেই পৈশাচিক হাসি—কি গো ব্রহ্মচারী, নির্জন বাড়িতে কোন্ ধর্ম-চর্চা হচ্ছিল ওই মেয়েটাকে নিয়ে ? চীৎকার করে বলতে গিয়েছিলাম চুপ করো। পারি নি। জোর পাই নি মনের মধ্যে। হঠাৎ হাসি থামিয়ে আমার মুখের উপর তর্জনী তুলে গর্জে উঠেছিল লোকটা—

বলো, টাকা দেবে কি না? সমস্ত শক্তি দিয়ে বলেছিলাম, না। তারপর কোনো দিকে না চেয়ে সোজা ছুটে চলে গিয়েছিলাম গঙ্গার ঘাটে।

ব্রহ্মচারীর উত্তেজিত কণ্ঠ আবার নীরব হল। কয়েক মিনিট বিরতির পর শুনতে পেলাম তার নিরুত্তাপ ধীর স্বর: তার পরের ঘটনা তো আপনি জানেন। জল থেকে উঠতেই আমাকে গ্রেপ্তার করলেন থানা-অফিসার। প্রতিবাদ করি নি। ওদের সেই ভয়ঙ্কর অভিযোগও অস্বীকার করতে পারি নি।

কেন? সে অভিযোগ তো সত্য নয়।

না, তা নয়। যে অপরাধে জড়িত হলাম, যে অপরাধ আমার সাব্যস্ত হল আদালতের বিচারে, তা আমি করি নি—

তবে?

তবু, নিজের অন্তরের দিকে চেয়ে কেমন করে বলি, আমি নির্দোষ?

শেষ

জায়গা আছে

এক

কাহিনীটি আমার নিজের নয়, সত্যদার কাছে শোনা। গল্পচ্ছলে শোনাননি, 'প্লট' হিসাবে দান করেছিলেন। বলেছিলেন, সুবিধেমত লিখে ফেলো।

তিনি নিজেও তো সে কাজটি করতে পারতেন এবং অনেক ভালো ভাবেই পারতেন। তা না করে আমার উপর এ বদান্যতা প্রকাশ করতে গেলেন কেন? কারণ বোধ হয় এই যে, এ হেন বস্তু তিনি তাঁর মত একজন প্রথম সারির লেখকের ব্যবহারযোগ্য বলে মনে করেন নি। আমার পাশের বাড়ির ক-দেবী (সিনেমা জগতের প্রদীপ্ত তারকা) যেমন তাঁর জন্মদিনের উপহার-স্তূপ থেকে বেনারসী-বাঙ্গালোরগুলো নিজের জন্যে রেখে টাঙ্গাইল-শান্তিপুরীর গোছাটা গরীব আত্মীয়দের বিলিয়ে দেন, দিগ্‌গজ সাহিত্যিক সত্যভূষণ চট্টরাজও ঠিক তাই করেছিলেন।

মুখবন্ধে এই ঋণ-স্বীকারটুকু আমি না করলেও পারতাম। আমার স্বজাতিমহলে এর রেওয়াজ কম। আমার চেয়ে অনেক বৃহত্তর ব্যক্তিও শুনেছি এই কাঁচা সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠেছেন। আমি যে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করি নি, তার একমাত্র কারণ সাহসের অভাব। কোনো নাছোড়বান্দা পূজা-সংখ্যা সম্পাদকের কঠোর পেষণ যদি কখনো সত্যদার কাছ থেকে এটি বের করে নিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে? সেই ব্যক্তিটি যখন একখানি স্ফীতোদর বিশাল পত্রিকা আমার নাকের ডগায় উঁচিয়ে ধরে সগর্জনে কৈফিয়ৎ চাইবে, কে রক্ষা করবে আমাকে?

এই জাতীয় সম্পাদকীয় আক্রমণের সম্ভাবনা অবশ্য কম। শুনেছি, 'পূজা-সংখ্যা'র প্রতি বাংলাদেশের পাঠক-পাঠিকার উদারতার সীমা নেই। সব নির্বিকারে গলাধঃকরণ করে থাকেন। প্রকাশকের গুদামে দু-চারখানা যদি বা পড়ে থাকে, আগামী পূজা-মরসুম শুরু হবার

অনেক আগেই সেগুলো শিশি-বোতল-কাগজওয়ালার মারফৎ দোকানে দোকানে ঠোঙারূপ ধারণ করে।

তবু সাবধানের মার নেই।

এ যে-সময়ের কথা, তখন সত্য চট্টরাজ 'আধুনিক' হবার সাধনা করছেন, অর্থাৎ লেখার মধ্যে কিঞ্চিৎ 'যুগযন্ত্রণা'র আমদানি করতে শুরু করেছেন। প্রেম নামক বস্তুটিকে হৃদয়ন্তরে না রেখে নরনারীর যে 'চিরন্তন দেহজ ক্ষুধা', তারই বহুমুখী প্রকাশের ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করছেন। তাঁর আগেকার লেখায় প্রেম ছিল প্রধানতঃ ইমোশন, ইদানীং তার সবটাই প্যাশন্।

লিখবার টেবিলে বসে 'প্যাশন্' সংগ্রহ করা যায় না, তার জন্যে চাই চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা। স্থানে-অস্থানে ঘুরতে হবে। জীবনের যে নগ্নরূপ তার সামনে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। প্রাচীনপন্থী লেখকেরা যেসব জিনিসকে কুৎসিত বলে পরিহার করে থাকেন, সেগুলোকে উন্মুক্ত করে দেখাতে হবে সাহিত্যের মধ্যে। তা না হলে সাহিত্য যে জীবন-বিচ্যুত হয়ে পড়বে।

সত্যবাবু প্রত্যহ একটু রাত করে ময়দান-ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে ইডেন গার্ডেনের উত্তরসীমা পর্যন্ত প্রসারিত বিশাল ভূখণ্ড, যার নাম গড়ের মাঠ, রাত্রির অন্তরালে জীবনের বহু রহস্য উদ্ঘাটিত হচ্ছে যার বুকে, বহু রসের কারবার চলছে। ইদানীং বেরসিক পুলিসগুলোর উৎপাতে তার স্বচ্ছন্দ, অনাবৃত রূপটি ঠিক ফুটে উঠতে পারছে না। চট্টরাজকেও তাই তাঁর বিচরণ-ক্ষেত্র বাড়াতে হয়েছে।

কোনো কোনো দিন তিনি বাস্-এ করে চলে যান শহর থেকে দূরে, শহরতলির ফাঁকা মাঠগুলোতে ঘুরে বেড়ান। ওখানে এখনো পুলিস গিয়ে জোটেনি, গাড়ি-ঘোড়া পথচলতি মানুষজন কচিৎ চোখে পড়ে। সুতরাং ওঁর চোখ না [illegible] [illegible] পেয়ে যান। [illegible] [illegible]-র মালমশলা কিছু কিছু জোটে।

'আমাদের ঠিক আগের যুগটায় এদিক দিয়ে ভারী সুবিধে ছিল,' কথায় কথায় একদিন বলেছিলেন সত্যবাবু, 'কোনো একটা বস্তিতে গিয়ে একখানা ঘর ভাড়া নিলেই চলত। কিংবা সেখানে যারা দেহের পসরা সাজিয়ে বসত, দু-এক রাতের মত তাদের খদ্দের হলেও অনেক কিছু পাওয়া যেত। এখন আর সেখানে কিছু নেই। অনেক বস্তিই এখন গৃহস্থপল্লী হয়ে গেছে। এককালে যারা নিজেদের বলত মধ্যবিত্ত, তারা সব বিত্ত হারিয়ে বস্তির বাসিন্দা হয়ে গেছে। সেখানে আর কী আশা কর?'

একদিন অমনি একটা দূরপাল্লার বাস্-এ চেপে এমন একটি অঞ্চলে গিয়ে পড়েছিলেন, যেটা আধা-শহর আধা-পল্লী। রাস্তা তৈরি হচ্ছে, মাঝে মাঝে দু-একখানা বাড়ি, বাকি সবটা খোলা মাঠ। ঘুরে ঘুরে বেশ খানিকটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। 'শিকার'ও তেমন পাননি। এদিকে রাত হচ্ছে। বড় রাস্তায় ফিরে বাস্-এর জন্যে অপেক্ষা করে করে যখন পা টনটন করছে, হঠাৎ নজরে পড়ল, খানিক দূরে একটু ভিতরের দিকে গাছতলায় একখানা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। এগিয়ে গেলেন। শিখ ড্রাইভার। মাথায় ময়লা পাগড়ি, মুখে দাড়ির জঙ্গল। পিছনের সীটে গা এলিয়ে দিয়ে আধ-শোয়া অবস্থায় পড়ে আছে। হয়তো ঘুমুচ্ছে। সাধারণত এদের সঙ্গে একজন করে 'দোস্ত' থাকে। বিশেষ করে যখন শহরের বাইরে যায়। এর কেউ ছিল না।

কেয়া সর্দারজী, কলকাত্তা যায়েঙ্গে? নরম সুরে জিজ্ঞাসা করলেন সত্যদা। রাষ্ট্রভাষায় তাঁর দখল খুব বেশী নয়।

সর্দারজী বোধহয় শুনতে পেল না। সত্যবাবু এবার একটু গলা চড়ালেন। শিখ মহারাজের দৈহিক অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হল না, দাড়িগোঁফের ভিতর থেকে দুটি শব্দ নির্গত হল—সওয়ারি হ্যায়।

এতদূরে আবার ট্যাক্সি করে এল কারা? সত্যদার কপাল কুঞ্চিত হয়ে উঠল। আসতে পারে, কাছাকাছি বাড়ি-ঘর যখন রয়েছে

দু-চারখানা। কিন্তু এই অসময়ে আবার কিছু যাবে? তাও না হয় গেল। ট্যাক্সি তো তাহলে সেই বাড়ির সামনে কিংবা কাছাকাছি অপেক্ষা করবে। এতটা দূরে এই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকবে কেন?

লেখক আর গোয়েন্দা এক বিষয়ে সমগোত্র। উভয়েই রহস্য-সন্ধানী। সত্যভূষণ চট্টরাজ কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। মনের মধ্যে একটা ক্ষীণ আশাও দেখা দিল। 'সওয়ারি'র সংখ্যা যদি বেশী না হয়, অর্থাৎ তাদের কুলিয়ে কোনো রকমে যদি একটু জায়গা থাকে, তাঁর যান-সমস্যার সমাধানও হয়ে যেতে পারে।

সেই ভরসা নিয়েই জানতে চাইলেন, কজন সওয়ারি?

সর্দারজী এবার মাথাটা সীটের উপর থেকে তুলে নিয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে সত্যবাবুর দিকে তাকাল। ছোট ছোট চোখ দুটিতে একটি কৌতুকহাসি ফুটে উঠল। মিশ্র ভাষায় বলল, দুজন। লেকিন, আপকা কোই সুবিস্তা হোবে না।

বলতে বলতেই সওয়ারি যুগলের দেখা পাওয়া গেল। মাঠের দিক থেকে জোরে পা চালিয়ে এগিয়ে আসছিল। সত্যবাবু গাছের আড়ালে সরে গেলেন। কাছেই একটা লাইটপোস্ট ছিল। তার আলোতে দেখলেন, মেয়েটা রোগা, চোখে-মুখে দারিদ্র্য এবং তার সঙ্গে লড়াইয়ের চিহ্ন। সস্তা পাউডারের প্রলেপে সেটা ঢাকা না পড়ে আরো যেন প্রকট হয়ে উঠেছে। তবে মুখের ডৌলটি মিষ্টি। পরনে সাধারণ ছাপা শাড়ি। বয়স কুড়ি বাইশের বেশী নয়। বাঙালী। চেহারায়, চালচলনে একটি বিশেষ অঞ্চলের ছাপ আছে, এককালে যার বাংলাদেশ বলেই পরিচয় ছিল পৃথিবীর কাছে, একটা কলমের আঁচড়ে হয়ে গেল নিষিদ্ধ পরভূমি। এরও হয়তো জন্মটা সেইখানে, জীবন কাটছে কলকাতা-শহরের দক্ষিণ কিংবা পূর্ব প্রান্তের কোনো 'কলোনী'তে যার নামের আগে দাঁড়িয়ে আছেন কোনো পুণ্যশ্লোক দেশনেতা, কিন্তু খোয়া-ওঠা রাস্তা আর কাঁচা নর্দমার ধারে জমে উঠেছে অনেক পাপ। [illegible] থেকে সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে একটি ছুটি করে বেরিয়ে

আসে এমনি ধারা অনেক মেয়ে। ছড়িয়ে পড়ে মাঠে-ময়দানে। সেখানে বায়ুভক্ষকের বেশে অপেক্ষা করে আছে নারীভক্ষকের দল।

সঙ্গের পুরুষটি হয়তো বয়সের দিক দিয়ে 'যৌবনসীমা' পেরিয়ে যায় নি কিন্তু ঘাড়ে পিঠে পেটে যে চর্বির বোঝাটি টানতে হচ্ছে, সেদিকে তাকালে তাকে মধ্যবয়সী বলেই ফেলতে হয়। সম্ভবতঃ গহুঁ ও ভঁয়ষা ঘিউ এলাকার লোক। রাবড়ি-রাজভোগপুষ্ট বঙ্গনন্দনও হতে পারে।

এদের সহযাত্রী হবার মত দুরাশা সত্যবাবুর অবশ্যই ছিল না। আবার বাস-স্ট্যাণ্ডের দিকে পা বাড়িয়েছিলেন। হঠাৎ ড্রাইভারের যে কথাগুলো কানে গেল, স্পষ্ট বুঝতে না পারলেও অনুমান করলেন, সে বোধ হয় তাঁর হয়ে কিছু সুপারিশ করছে। আরোহী-যুগলের নজর পড়ল তাঁর উপর। তিনি একটু দাঁড়ালেন। এবার শুনতে পেলেন, মেয়েটি বলছে তার সঙ্গীর উদ্দেশে, তাহলে কী করে যাবেন ভদ্দরলোক? চলুন না আমাদের সঙ্গে?

বাবুটি কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল, আরেকবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করল তাঁর দিকে। চোখ দুটি দেখা না গেলেও সেটি যে প্রসন্ন দৃষ্টি নয়, এটুকু বুঝে নিতে সত্যদার কোনো অসুবিধা হল না। পরক্ষণেই একটি মাথানাড়া দেখতে পেলেন এবং তারপরেই মেয়েটির বাহু ধরে মেদবহুল বপুখানা কোনোরকমে নীচু হয়ে গাড়ির ভিতরে ঢুকে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে এঞ্জিনের গর্জন এবং একরাশ কালো ধোঁয়া।

বাস্-এর আস্তানায় গিয়েও দুচোখে ধোঁয়া দেখলেন সত্যদা। কোনো কারণে—সম্ভবতঃ কোথাও কোনো একটি কণ্ডাক্টরের কথা বা আচরণের প্রতিবাদে কিছু যাত্রী কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত বীরত্ব প্রকাশ করে থাকবে, তার ফলে সব রুটের বাস অচল হয়ে গেছে।

অগত্যা পদযুগলের শরণ নিলেন সত্যভূষণ। ভাবতে ভাবতে চললেন ঐ আরোহী-যুগলের কথা। মেয়েটি তাঁকে সঙ্গে নিতে চেয়েছিল, তার সঙ্গী রাজী হয় নি। এইটাই প্রত্যাশিত। ওটা ঐ

বাবুর 'চার্টার্ড' গাড়ি, ওখানে তৃতীয় ব্যক্তির স্থান হতে পারে না। কিন্তু তিনি তো ড্রাইভারের পাশেই বসতেন, এবং ঘাড় ফিরিয়ে ওদের ক্রিয়া-কলাপের প্রত্যক্ষ দর্শক হবার চেষ্টা করতেন না নিশ্চয়ই। তবু তাঁর উপস্থিতিই একটা মস্ত বড় বাধা। তাঁর পিঠে দুটো চোখ না থাকলেও তার প্রতি মুহূর্তে অনুভব করত ওখান থেকে একটি অদৃশ্য তৃতীয় নয়ন তাদের দিকে তাকিয়ে দেখছে।

কিন্তু আর একটা লোকও তো বসে আছে সামনের আসনের কোণ ঘেঁষে, যার চোখ দুটি যদিও পথের দিকে নিবদ্ধ, তবু কখনো কোনো ফাঁকে চকিতে একবার পথভ্রষ্ট হবে না, এমন গ্যারান্টি সে দেয় নি। তাছাড়া তার মাথার ঠিক উপরে যে ছোট্ট আরশিখানা টাঙানো আছে, তাকে নেড়েচেড়ে এমনভাবে বসানো যায় যাতে করে পিছনের সব কিছু সোজা চোখেই ধরা পড়ে, চোরা চাহনির দরকার হয় না। তবে সে 'লোক' নয়, ড্রাইভার। 'ব্যক্তি' নয় বস্তু, যে বস্তু এদের ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে, তারই একটা অংশ। মানুষের সামনে যে কাজ প্রকাশ্য নয়, তার সামনে সেটা অনায়াসে করা চলে। করেও থাকে এইসব নৈশ-বিহারী যুগলদল। মেয়েটি যদি তাকে উদ্দেশ করে মৃদু আপত্তি তোলে, পুরুষটি তা এক কথায় কাটিয়ে দেয়—ও তো ড্রাইভার।

ড্রাইভারদের কাছ থেকেই এসব তথ্য সংগ্রহ করেছেন সত্যভূষণ, তাঁর উপন্যাসের জন্যে।

কিছুদিন পরে অমনি সন্ধ্যার পর পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে ট্রাম থেকে নেমে, মহাত্মা গান্ধীকে ডাইনে ফেলে পশ্চিম দিকে চলেছিলেন সত্যবাবু। ইচ্ছা ছিল, কোনো এক জায়গায় দক্ষিণের মাঠে নেমে পড়া। তার আগেই কে একজন বলে উঠল আবছায়া ঢাকা ফুটপাথের উপর থেকে, কী বাবুজী, ট্যাক্সি চাই?

ভাষা বাংলা হলেও উচ্চারণটা পাঞ্জাবী। গলাটাও যেন চেনা। আর একটু এগিয়ে ভালো করে লক্ষ্য করে আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

সেই ড্রাইভার। তাকে চিনল কেমন করে? মনে মনে বললাম, এরা তো দেখছি সাহিত্যিকের চেয়েও তীক্ষ্নদৃষ্টি। তিনি কিন্তু কিছুতেই চিনতে পারতেন না। এ বিষয়ে তাঁর আবার আরেকটা নিজস্ব অসুবিধা আছে। একটি শিখ থেকে আরেকটি শিখকে আলাদা করে দেখতে পারেন না। সব মুখগুলো মনে হয় এক। সেই খাঁকী পাগড়ি, সেই যথেচ্ছ বেড়ে ওঠা ঝোপের মত দাড়ি-গোঁফ, তার ভিতর থেকে উঁকি দিচ্ছে দুটি রক্তাভ চোখ। কথাও বলে প্রায় এক সুরে। গাম্ভীর্য নেই—অতবড় দেহ থেকে যা প্রত্যাশিত—কেমন একটা ক্যানকেনে আওয়াজ।

আজ পেতে পারেন। ওখান থেকেই বলল ড্রাইভার, 'আজ' কথাটার মধ্যে একটি বিশেষ ইঙ্গিত। অন্ততঃ সত্যবাবুর তাই মনে হল।

তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। অন্তরঙ্গ সুরে বললেন, কেন, ফেরত সওয়ারি নেই বুঝি?

সর্দারজী তার খিচুড়ি ভাষায় বলল, না, এক পিঠকা ভাড়া। এ দোসরা বাবু আছে। ঐসা চর্বিওয়ালা নেহি, দুবলা, পাতলা।

পকেট চাপড়ে যোগ করল এ ভি বহুৎ পাতলা। বলে হেসে উঠল।

'দোসরাবাবু' কথাটাও ইঙ্গিতময়। 'সওয়ারি' যে ঐ জাতীয়, সেদিন যাদের দেখেছিলেন, সেটা ওর কথার ভাবে গোড়াতেই অনুমান করেছেন। তাহলে কি সেই মেয়েটি?

সত্যভূষণ চট্টরাজের কৌতূহল জাগ্রত হল। নিছক সাহিত্যিক কৌতূহল বলা চলে না। সেদিন সামান্য ক্ষণের জন্যে হলেও তাকে দেখে তার চেহারায় যে ছাপ ছিল তার পিছনের ইতিহাস অনুমান করে (অনুমান কেন, ও বিষয়ে তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না) এবং তাঁর মত একজন নিতান্ত অচেনা মানুষকে সাহায্য করবার যে আগ্রহটুকু তার কথার সুরে বুঝতে পেরেছিলেন সে কথা স্মরণ করে,

মেয়েটির উপর একটি সস্নেহ আকর্ষণ অনুভব করলেন সত্যদা। সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন ড্রাইভারকে। সে জানাল, সেই মেয়েটার সচরাচর বা ঘটে থাকে, প্রায় সেই রকম। একটা তফাৎ, তার মধ্যে সত্যবাবুর একটি ভূমিকা রয়ে গেছে এবং কিছুটা ড্রাইভারের নিজেরও।

প্রথমটা সবটুকু বলতে চায় নি। তার কারণটা বুঝতে পারলেন সত্যবাবু। নিজের সম্বন্ধে লোকটার একটি স্বাভাবিক সঙ্কোচ আছে যার জন্যে ওকে তাঁর বিশেষ ভাবে ভাল লাগল। ওর ট্যাক্সিতেই বাড়ি ফিরে গেলেন এবং ভিতরে যেতে অনুরোধ করলেন। ড্রাইভার অবাক। সে ট্যাক্সি চালায়, তার দৌড় প্যাসেঞ্জারের দরজা পর্যন্ত। তার ওপারে তো কখনো ডাক পড়ে না; বিশেষ করে এমন সুন্দর বাড়ির। সত্যবাবু তার মনের কথাটি বুঝলেন। বললেন, আসুন না, একটু গল্প-সল্প করি আপনার সঙ্গে। একদিন না হয় কিছু কম রোজগার হল।

এবারে লজ্জিত হল ড্রাইভার। বলল, না বাবুজী, সেজন্যে নয়। আমি ট্যাক্সি চালাই, লেখা-পড়া জানি না, এই দেখুন না আমার পোশাক। আপনার মতো 'বড়া আদমি'র সঙ্গে কী কথা বলবো আমি?

সত্যভূষণ মিষ্টভাষী সাহিত্যিক। বললেন, না, না, বড় আদমি-টাদমি আমি নই। আপনার মত আমিও খেটে খাই। আপনি গাড়ি চালান, আমি কলম চালাই।

সুসজ্জিত ড্রইংরুমের সুদৃশ্য সোফার উপর বেশ খানিকটা সঙ্কোচের সঙ্গে গিয়ে বসল ড্রাইভার। কিন্তু সেটা কাটিয়ে উঠতে বেশীক্ষণ লাগল না। ঘনিষ্ঠ মিষ্ঠ ব্যবহারের সঙ্গে এল কিছু মিষ্টান্ন এবং আরেকটি অভিনব বস্তু—বাঙালীর তৈরী চা, ওরা যাকে অবজ্ঞা করে দূরে ঠেলে রেখেছে, এখন কিন্তু মন্দ লাগল না।

হুজনের ভিতরকার পরদাটা ধীরে ধীরে উঠে গেল। সর্দারজী কখন জমে গেল তার কাহিনীর মধ্যে নিজেও বোধ হয় জানতে পারল না। শুরুতে একটু ভুমিকা ছিল, বাংলা হামি ভালো বলতে পারি না বাবুজী, লেকিন বুঝতে পারি। সেদিন সেই বাবু আর মেয়েটির কথাও পুরো বুঝতে পেরেছিলাম।

গাড়িতে উঠেই বাবুটির প্রথম কথা হল—ঐ লোকটাকে তুমি চেন?

কোন্ লোকটা?

ঐ যে যাচ্ছে।

না তো।

তাহলে ওকে সঙ্গে আনতে চাইছিলে কেন?

এমনিই। একজন ভদ্রলোক বিপদে পড়ে—

কিসের বিপদ? ও তো বাসে করে যেতে পারত।

বাস বোধ হয় পান নি। পেলে আর আমাদের সঙ্গে আসতে চাইবেন কেন?

ওসব বাজে কথা। আসলে গাড়িতে আর একটা লোক থাকলে তোমার সুবিধে হয়, সেটা কি আর আমি বুঝি না?

কি সুবিধে?

বেশ দূরে দূরে থাকতে পার। গায়ে গায়ে ছোঁয়া না লাগে।

কোথায় দূরে দূরে আছি?

আছ বৈকি। আমি যা চাইছি কিছুই পাচ্ছি না। গাড়ির মধ্যে—'ওরে বাপরে! সামনে ড্রাইভার!' নিয়ে গেলাম ফাঁকা মাঠে। সেখানেও 'যদি কেউ এসে পড়ে!'—তাহলে কিসের জন্য এত টাকা খরচ করে এত দূরে নিয়ে এলাম তোমাকে?

মেয়েটি কোনো জবাব দিল না। লোকটা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গজগজ করতে লাগল, তুমি এ-রকম করবে জানলে আমি তোমাকে আনতাম না। অন্য ব্যবস্থা করতাম।

ড্রাইভার পিছন ফিরে না তাকালেও বুঝতে পারল মেয়েটি এবার আস্তে আস্তে ওর কাছে সরে গেল। যেটুকু ফাঁক ছিল তৎক্ষণাৎ ভরাট করে দিল অপর পক্ষ। বাবুর সুরও এবার অনেক নরম—তোমাকে তো অনেকবার বলেছি মীনা, এত লজ্জা আর ভয় করলে চলে না। আরেকটু ফ্রী হতে হবে। এই কাঠ-কাঠ ভাবটা কাটিয়ে উঠতে হবে। রোজ তো আর হয় না, মাঝে মাঝে এই একটুখানি মেলামেশা। তখনো যদি তুমি নিজেকে এমন গুটিয়ে রাখো, ছেড়ে না দাও, কিসের লোভে আসবো? আমার বাপু সোজা কথা।·· তাছাড়া এতে দোষটাই বা কী, শুনি? একটুখানি আনন্দ করা বৈ তো নয়।

এমনি আরো কত কী লেকচার দিয়ে গেল লোকটা। মীনা একটা কথাও বলল না। তার কোনো সাড়াই পাওয়া যাচ্ছিল না, যেন গাড়িতে ঐ বাবু ছাড়া আর কোনো সওয়ারি নেই।

মীনার এই চুপ করে যাওয়া থেকেই বাবুটির বোধ হয় মনে হল, এতক্ষণে ঔষুধ ধরেছে, তার লেকচারে কাজ হয়েছে, আরেকটু এগিয়ে যাওয়া চলে। কিন্তু সেটা যে ভুল তখনই বোঝা গেল।

আরশিটা ঠিক মত বসানো ছিল, কিন্তু রাস্তার আলোর তেমন জোর না থাকায় পিছনটা ঠিক দেখা গেল না। কেউ একটা কিছুতে বাধা দিচ্ছে, এই ধরনের একটা শব্দ শুধু কানে এল সর্দারজীর, এবং সেই সঙ্গে মেয়েটির গলায় একটা জোরালো—'না'।

ঠিক সেই সময়ে গাড়িটা এসে পড়ল একটা লাইটপোস্টের নীচে। ড্রাইভার দেখল, ওরা আর তেমন ঘন হয়ে বসে নেই। বাবুটার চোখ দুটো জ্বলছে, মীনা তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। বাবুও সেই জ্বলন্ত চোখ দুটো ওর ওপর থেকে এক ঝটকায় সরিয়ে নিয়ে বলল, আ-চ্ছা।

তারপর আর কারো কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। মাঝে

মাঝে ছোট্ট আয়না থেকে যেটুকু বোঝা গেল, দুজন দুদিকে তাকিয়ে আছে, মাঝখানে ফাঁক।

ওরা ট্যাক্সি নিয়েছিল শিয়ালদহ স্টেশনের বাইরে থেকে। বেলেঘাটার রাস্তা যেখানে এসে পড়েছে সেই মোড়ের কাছে মেয়েটি আগে থেকেই এসে দাঁড়িয়েছিল। সর্দারজী গাড়িতে বসে তাকে লক্ষ্য করছিল এবং ধরণ-ধারণ থেকে বুঝেছিল কারো সঙ্গে 'বন্দোবস্ত' আছে, এ তারই প্রতীক্ষা। এসব ওদের জানা হয়ে গেছে। কত দেখছে তো। চোখের দিকে তাকালেই ধরতে পারে। অনেক সময় তাও দরকার হয় না। চলা-ফেরা ভাব-ভঙ্গি থেকেই বোঝা যায়।

বাবুটা এল হ্যারিসন রোডের দিক থেকে। বেশ ব্যস্তসমস্ত ভাব। মেয়েটা একটু হাসল। ড্রাইভারের তখনই মনে হয়েছিল হাসিটা যেন জোর করে টেনে আনা, তার মধ্যে প্রাণ নেই। হয়তো পেটের দায়ে নেমেছে এই পথে। কিংবা লোকটাকে পছন্দ নয়, অথচ এড়াতে পারছে না। যাই হোক, ওসব ওদের ব্যাপার। ও নিয়ে মাথা ঘামানো তার কাজ নয়। সে শুধু ভাবছিল ভাড়াটা জুটলে হয়। বাবুটির চেহারা বেশ শাঁসালো, মনে হচ্ছে পকেটে রেস্ত আছে। যদি উঠে পড়ে, বেশ খানিকটা ছুটবে।

কপাল ভালো ছিল ড্রাইভারের। পেয়ে গেল এবং ট্রিপও বেশ লম্বা। যতটা আশা করেছিল তার চেয়েও বেশী।

গিয়েছিল গড়ের মাঠের ভিতর দিয়ে, আলিপুর পেরিয়ে তারাতলা হয়ে বজবজের দিকে। ফিরছিলও সেই পথে। চৌরঙ্গী-ধর্মতলার মোড়ে আসতেই বাবু হেঁকে উঠল, রোখো। রাস্তার ধার ঘেঁষে গাড়ি থামাতেই নেমে পড়ে এগিয়ে গেল মিটার দেখতে। মেয়েটি যেন হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠল। এদিকে ওদিক চেয়ে বলল, এ কোথায় এলাম?

প্রশ্নটা তার উদ্দেশে না হলেও জবাব দিল ড্রাইভার, ধরমতলা।

ধর্মতলা! এখান থেকে যাবো কেমন করে? ক্ষীণ স্বরে বলল সে। গলাটা একটু কেঁপে গেল। এটা বোধ হয় প্রশ্ন নয়। হলেও

কেউ উত্তর দিল না। বাবু ড্রাইভারকে ভাড়া বুঝিয়ে দিয়ে ভিতরের দিকে চেয়ে ধমকে উঠল, কী হল! নামবে না?

মেয়েটি নেমে এলে তুখানা এক টাকার নোট বাড়িয়ে ধরল তার দিকে। মীনা হাত না বাড়িয়ে শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল তার মুখের পানে, যার অর্থ অতি পরিস্কার। কিন্তু ও সম্বন্ধে কিছু বলল না। তার আগেকার সেই কথাটার পুনরুক্তি করল, এখান থেকে কী করে যাবো? আমি তো এদিকের কিছুই চিনি না।

কী করে যাবে তা আমি কী জানি। বাসে-ট্রামে চলে যাও।

বাস বন্ধ্ হো গিয়া—আবার অযাচিত ভাবে বলে উঠল ড্রাইভার।

বাবু কটমট চোখে তার দিকে একবার তাকাল, অর্থাৎ 'তোমাকে দালালি করতে কে বলেছে?' তারপর তাড়া দিল মেয়েটিকে, নাও।

মীনা এবারেও হাত পাতল না, শুষ্কমুখে ভয়ে ভয়ে বলল, আর কটা টাকা না হলে—

শেষ করবার আগেই জবাব পেয়ে গেল তারই অনুকরণে মেয়েলি সুরে, তার সঙ্গে একটি কুৎসিত ভেংচি—আর কটা টাকা না হলে··· কিসের জন্যে টাকা দেবো শুনি? ঐ তো রূপ, তার উপরে আবার অত তেজ!

নোট তুখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হন হন করে চলে গেল উলটো দিকে।

সর্দারজী বলছিল তার নিজস্ব অর্থাৎ কিঞ্চিৎ গ্রাম্য ভাষায়, 'আমার এই হাত তুখানা নিশপিশ করছিল বাবুসাব। ইচ্ছে হচ্ছিল ছুটে গিয়ে শালার গর্দানা ধরে টেনে এনে বলি, দিয়ে দে যা আছে তোর পকেটে। আর না যদি দিস, দেব ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে। কত আর? একটা ঘুঁষিই যথেষ্ট। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিলাম। দেশ-গাঁও ঘর-দোর সব গ্যাছে, পেছনে এসে দাঁড়াবে এমন কেউ নেই। অনেক বিপদ গ্যাছে মাথার উপর দিয়ে। শিরদাঁড়ায় আর জোর ছিল না বাবুসাব। আবার সেই থানা-পুলিসের হ্যাঙ্গাম। ঐ মেয়েটাকে সুদ্ধ জড়িয়ে

ফেলবে।···তা না হলে—থাক সে কথা।···

সেদিনকার ঘটনায় ফিরে গেল সর্দারজী।

বাবুর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে রাস্তা থেকে নোট দুখানা কুড়িয়ে নিল মীনা। যখন উঠে দাঁড়াল, ড্রাইভার দেখল, তার চোখ দুটোয় টলটল করছে জল। তাড়াতাড়ি মুছে ফেলে এদিক-ওদিক একবার তাকাল। যেন কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। তারপর ওকে জিজ্ঞাসা করল, বেলেঘাটা কোন্ দিকে বলতে পারেন?

বেলেঘাটায় থাকেন নাকি আপনি?

হ্যাঁ।

কোন্ রাস্তায়?

কী একটা রাস্তার নাম করল। ড্রাইভার চিনল না। মনে করবার চেষ্টা করে বলল, পুলের কাছে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। পুল পার হয়ে আর একটু গেলেই ডান দিকে।

উঠে আসুন। আমিও ঐদিকে যাবো।

মীনা ইতস্ততঃ করছিল। সর্দারজী বলল, তোমার যদি আপত্তি থাকে তো থাক্! চল, তোমাকে ট্রামে তুলে দিই। শেয়ালদ থেকেও অনেকটা হাঁটতে হবে। বাস তো নেই।

একটু হেসে বলল, তবে আমার গাড়িতে তোমার কোনো বিপদ হত না।

হয়তো কিছু ছিল এই কথায়, সুরে এবং সম্বোধনে যাতে করে মীনা মনে মনে লজ্জিত হল। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, না, না, সে কথা নয়। আমি ভাবছিলাম, আমি তো ভাড়া দিতে পারবো না। তাই যদি শুধু রাস্তাটা দেখিয়ে দিতেন—

ভাড়া লাগবে না। আমাকে তো ওদিকে যেতেই হচ্ছে।

বলে, পিছনের দরজাটা খুলে ধরল ড্রাইভার। মীনা সসঙ্কোচে উঠে বসল। কিছুক্ষণ পরে বলল, আপনি বুঝি বেলেঘাটায় থাকেন?

সর্দারজীকে বলতে হল, হ্যাঁ। তাতেও নিস্তার নেই। তারপরেই

প্রশ্ন হল, কোন্ রাস্তায় ?

সর্দারজী বেলেঘাটার কোনো রাস্তার নাম জানে না। কিন্তু উত্তর তো একটা দিতে হবে। বলল, তোমরা যেখানে থাক, তারই কাছা-কাছি।

আরশিতে লক্ষ্য করল, মেয়েটির মুখে একটা খুশির ভাব ফুটে উঠেছে। এতে খুশি হবার কী আছে সে ঠিক বুঝতে পারল না।

কারণটা সত্যবাবু মনে মনে উপলব্ধি করলেন। এই মীনা এবং মীনার মত মেয়েদের তিনি কিছু কিছু চেনেন। দারিদ্র এদের যতই নীচে নামিয়ে দিক, আত্মসম্মানবোধটুকু একেবারে কেড়ে নিতে পারে নি। বহু পাপের মধ্যেও এদের মনের সম্ভ্রান্ত রূপটা নষ্ট হয় নি। শিখ ড্রাইভারকে সে ঠিক সন্দেহ করে নি। কিন্তু এই বিদেশী বিধর্মী অপরিচিত লোকটি কেবলমাত্র দয়াপরবশ হয়ে তাকে এতটা অনুগ্রহ করছে এতে সে স্বস্তি পাচ্ছিল না। তারপর দেখল, দয়া ছাড়াও আরো কিছু আছে ওর মধ্যে—একটুখানি স্নেহস্পর্শ, তার এই চরম লাঞ্ছনা ও বিপদের মধ্যে একটুখানি সমবেদনা। সেটা যদি না পেত, হয়তো ওর গাড়িতে উঠত না। এই সস্নেহ উপকারের স্বীকৃতিস্বরূপ মীনার কৃতজ্ঞ মন এই শিখ ড্রাইভারের সঙ্গে একটা সম্পর্কের সূত্র খুঁজে বেড়াচ্ছিল। যেটুকু পেল তাতেই খানিকটা তৃপ্তি লাভ করল। হোক সে বিদেশী বিধর্মী, হোক না সম্পূর্ণ অপরিচিত, তবু তারই কাছাকাছি থাকে লোকটি, তারই নিকট প্রতিবেশী।

সেই মুহূর্তে ড্রাইভারের মনেও হয়তো রাস্তার মধ্যে একটি বিপন্ন মেয়েকে সাহায্য করবার যে নাগরিক কর্তব্যবোধ, তাছাড়া আরো কিছু থেকে থাকবে। তা না হলে কি দরকার ছিল মেয়েটির সম্বন্ধে এতসব খবর নেবার? আরশির ভিতরে ওর মুখখানা মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছিল। সেই দিকে চেয়ে বলল, বেলেঘাটাতেই বুঝি তোমাদের বাড়ি?

না, এখানে আমাদের বাসা।

• মুলুক ?

মীনা 'মুলুক' বুঝল না। জিজ্ঞাসা করল, কী বলছেন ?

সর্দারজী বাংলা করে বলল, দেশ, দেশ কোথায় ?

দেশ ছিল পাকিস্তানে। বলতে গিয়ে বোধ হয় অজ্ঞাতসারে একটা নিঃশ্বাস পড়ল।

আমারো দেশ ছিল পাকিস্তানে।

পাকিস্তানে ! মীনা কথাটা ঠিক বুঝতে পারল না। 'পাকিস্তান' বলতে সে জানে, যে দেশে তারা ছিল একদিন, যার নাম ছিল 'বাংলাদেশ', যেখানে আর কোনোদিন ফিরে যাবার উপায় নেই। এরা তো পাঞ্জাবী !

তাকে চুপ করে যেতে দেখে ড্রাইভার আন্দাজ করল কোথায় তার খটকা। বলল, আমরাও তোমাদের মত সব কিছু হারিয়ে চলে এসেছি। তোমাদেরই মত মেরে-ধরে তাড়িয়ে দিয়েছে আমাদের। বাড়ি নেই, ঘর নেই। এদেশের লোকেরা আমাদের বলে রিফিউজী।

আমাদেরও। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল মীনা।

জানি। এদিক দিয়ে তোমরা আর আমরা একেবারে এক জাত। বলে, হাসল ড্রাইভার।

মীনা হাসল না, কিছু বলল না, শুধু চেয়ে রইল। একটা লাইট-পোস্টের ধার দিয়ে যাচ্ছিল গাড়িটা। আরশির দিকে তাকিয়ে ড্রাইভারের মনে হল, তার মুখখানা আরো কোমল, আরো করুণ হয়ে উঠেছে। আবার প্রশ্ন করল, তোমার বাবা-মা আছেন ?

না। বাবাকে ওরা ওখানে থাকতেই কেটে ফেলেছিল, মা এখানে এসে মারা গেছে।

ভাই-বোন।

কেউ নেই।

কেউ নেই ! কার কাছে থাক তুমি ?

কাকা-কাকীমার কাছে।

কী করেন তোমার কাকা ?

মীনা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না। একটু বোধ হয় ইতস্ততঃ করল। তারপর বলল, কিছু করেন না। হাঁপানির অসুখ। বিছানায় পড়ে আছেন।

গাড়ি পুলের উপর এসে পড়েছিল। মীনার বোধ হয় খেয়াল ছিল না। ড্রাইভার ভোলে নি। পুল পার হয়ে জানতে চাইল, এবার কোন্‌দিকে যেতে হবে ?

মীনা বাইরেটা দেখে নিয়ে বলল, আপনি এখানেই আমাকে নামিয়ে দিন। আর যেতে হবে না।

কদ্দূর এখান থেকে ?

বেশী দূর না। খানিকটা গিয়েই ডান-হাতি রাস্তা।

তাহলে সেই মোড় পর্যন্ত চল। এতটা পথ হাঁটবে কেন ?

না, আমি এখানেই নামি।

বাসার বেশী কাছে না যাবার কারণটা ড্রাইভার বুঝতে পারল। এধারে ওধারে কৌতূহলী দৃষ্টির অভাব নেই। মীনাকে বহু হুঁশিয়ার হয়ে চলতে হয়। এই গাড়িচড়া অবস্থায় চেনা মুখের চোখে পরে যাওয়া একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়।

রাস্তার বাঁ-ধার ঘেঁষে গাড়িটা রেখে এতক্ষণে পিছনের দিকে ফিরল সর্দারজী। খানিকটা ইতস্ততঃ করল। তারপর বুক-পকেটের ভিতর থেকে একখানা মাঝারি আকারের কাগজ তুলে নিয়ে হাত বাড়িয়ে তার স্বাভাবিক কর্কশ গলাটাকে যতদূর সম্ভব মোলায়েম করে অনুনয়ের সুরে বলল, এটা রাখো।

সে কী! আপনি কেন আমাকে টাকা দিতে যাবেন! ভীষণ আশ্চর্য হল মীনা, টাকা তো দেবার কথা আমার। কিন্তু—

কী জানো ? ব্যাপারটাকে একটু হালকা রূপ দেবার চেষ্টা করল ড্রাইভার, আজকে আমার 'নসিব' খুব ভালো। অনেক টাকা কামিয়ে ফেলেছি, আর সেটা বলতে গেলে তোমার জন্যে। মানে, তোমরা

যদি আমার গাড়িতে না উঠতে, তাহলে তো পেতাম না। এটা আমার ফালতু রোজগার। তার থেকে এই সামান্য টাকাটা—

বলতে বলতে নজরে পড়ল, মীনার চোখ ছুটো ছলছল করে উঠেছে। দেখতে দেখতে ছু-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। সেটা সে মুছবার চেষ্টা করল না। ধরা গলায় বলল, আমি জানি, কেন আপনি আমাকে টাকা দিতে চাইছেন। কিন্তু ও আমি নিতে পারবো না। দরজাটা খুলে দিন।

ড্রাইভার আর কোনো কথা বলল না। নোটখানা পকেটে রেখে দরজা খুলে ধরল।

মীনা নেমে পড়ে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, টাকা নিলাম না বলে আপনি কিছু মনে করবেন না, সর্দারজী। যে উপকার করলেন—

তার পরে বোধ হয় আর কোনো কথা যোগাল না। ড্রাইভারও এসব ক্ষেত্রে যা বলা দরকার তেমন কিছু খুঁজে পেল না। শুধু বলল, তোমার কাছে কাগজ আছে?

কাগজ? না তো!

আচ্ছা দাঁড়াও। বলে, ড্যাশ-বোর্ডের ভিতরটা হাতড়ে একটুকরো কাগজ বের করল। বোধ হয় একপিঠ-লেখা কোনো ছেঁড়া হ্যাণ্ডবিল বা ঐরকম কিছু। পাগড়ির ভাঁজ থেকে তুলে নিল একটা পেন্সিল। ছুটো একসঙ্গে দরজার ফাঁক দিয়ে বাড়িয়ে ধরে বলল, আমার ঠিকানাটা লিখে নাও। এর ওপর রেখে লেখো।

বলে, একটা পাতলা বই এগিয়ে দিল। রাস্তার নাম নম্বরের পর 'ভবানীপুর' কথাটা যোগ করতেই পেন্সিল থামিয়ে সবিস্ময়ে কপাল কুঞ্চিত করল মীনা, ভবানপুর! তখন যে বললেন বেলেঘাটায় থাকেন আপনি?

সর্দারজী সে প্রশ্নের কোনো জবাব দিল না। তার ঠোঁটের কোণে 'কেমন ঠকিয়েছি' গোছের একটা ছুষ্টুমির হাসি ফুটে উঠে থাকবে।

অত অল্প আলোয় দাড়ি-গোঁফের ঘন ঝোপের আড়াল থেকে সেটা মীনার নজরে পড়বার কথা নয়। সে তখন বড় বড় চোখ করে অবাক হয়ে চেয়ে আছে। সেদিকে চোখ তুলে আবার নামিয়ে নিল ড্রাইভার। একবার একটু ইতস্ততঃ করল। তারপর কোনোরকমে বলে ফেলল, যদি কোনোদিন দরকার মনে কর, একটা পোস্টকার্ড লিখে দিও।

আমি তো বাংলাতে লিখবো, আপনি পড়বেন কেমন করে? ছেলেমানুষের মত মাথায় একটা দোলা দিয়ে খুশির সুরে জিজ্ঞাসা করল মীনা।

কেন, আমার যেসব বাঙালী দোস্ত আছে, তাদের দিয়ে পড়িয়ে নেবো। হ্যাঁ, গাড়ির নম্বরটাও লিখে নিয়ে যাও।

মীনার মুখে এবার একটা ম্লান ছায়া পড়ল। ধীরে ধীরে বলল, গাড়ির নম্বর নিয়ে আমি কী করবো?

রাস্তা ঘাটে হঠাৎ কোথাও দেখতে পেলে ডাকবে।

মীনা আর কিছু বলল না। সেই অল্প আলোতেও মুখখানাতে একটা ঔজ্জ্বল্য দেখা দিল। সর্দারজী সেদিকে এবার তাকিয়ে বলল, আচ্ছা, এবার তুমি বাড়ি যাও।

গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে পশ্চিম দিকে যেতে যেতে একবার পিছন ফিরে তাকাল। দেখল মীনা ঠিক সেই জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে আছে। একটু হেসে অ্যাক্সিলারেটরে জোরে চাপ দিল বান্তা সিং।

প্রতিদিন শেষ ট্রিপ সেরে যখন বাসায় ফেরে বান্তা সিং, তার মনের কোণে একটি ক্ষীণ প্রত্যাশা জাগতে থাকে। যত কাছে আসে তত তার রশ্মিটুকু ছড়িয়ে পড়ে। এসেই ক্লীনার ছোকড়াকে জিজ্ঞাসা করে, তার কোনো চিঠি আছে কিনা। একই উত্তর শুনতে হয় রোজই—'না'। মনটা হঠাৎ দমে যায়। তারপর নিজের কাণ্ড দেখে নিজে হেসে মরে। চিঠি লিখবার মত কেউ কোথাও নেই তার।

তার জন্য কোনো অভাবও কখনো বোধ করে নি। বেশ ছিল এতদিন। আজ এ কী হল!

এর মধ্যে কয়েকদিন সেই জায়গাটিতে শিয়ালদয় যেখানে বেলেঘাটার রাস্তা এসে মিশেছে তার কাছে গাড়ি নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে এসেছে। পর পর অনেক প্যাসেঞ্জার ফিরিয়ে দিয়েছে। দু-চারজনের সঙ্গে চটাচটিও হয়ে গেছে ঐ নিয়ে, যার জন্যে বসে থাকা তার দেখা পায় নি। তারপর হঠাৎ একসময়ে খেয়াল হয়েছে, এ নিছক পাগলামি। একদিন এসেছিল বলে আবারও আসবে এবং এইখানেই তাকে পাওয়া যাবে এমন তো কোনো কথা নেই। আর যদি সত্যিই পাওয়া যায়, তারপর? 'তারপর'-এর উত্তর আর খুঁজে পায় নি। তখন যে এসেছে, তাকেই ঢুকিয়ে নিয়েছে। জানতে চায় নি কতদূরে যাবে সে। এতক্ষণ ধরে যাদবপুর বেহালা টালার লোক হাঁকিয়ে দিয়ে পেয়েছে হয়তো বড়বাজারের যাত্রী। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে, নাঃ, এ বোকামি আর করবে না। এভাবে খালি খালি গুনগার দেবার কোনো মানে হয় না। সে অবস্থাও তার নয়। তেলের দাম চড়ে গেছে, যন্ত্রপাতি দুর্ঘট। যা বা পাওয়া যাচ্ছে, ব্ল্যাকে দ্বিগুণ, তিনগুণ দাম। রীতিমত হিসাব করে চলতে হবে। গাড়ির দাম এখনও শোধ হয় নি। মাসে মাসে মোটা টাকা গুনতে হচ্ছে তার জন্যে। এদিকে খোরাকি-খরচও বেড়ে বেড়ে যেখানে গিয়ে ঠেকেছে, টিকে থাকাই দায়।

কয়েকদিন যেতেই কিন্তু এত সব হিসাব-নিকাশ ভণ্ডুল করে দিয়ে সেই পাগলামির ভূতটা আবার এসে ঘাড়ে চেপে বসেছে। 'যাবো না যাবো না' করেও সন্ধ্যার মুখে সিনেমার যাত্রী, রেলের যাত্রী, চৌরঙ্গী অঞ্চলের শাঁসালো যুগল যাত্রী সব ছেড়ে দিয়ে শিয়ালদর সেই মোড়টিতে গিয়ে হাজির হয়েছে বান্তা সিং।

তারপর একদিন হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। মীনা দেখতে পায় নি। তার নজর তো রাস্তা বা ট্যাক্সির দিকে ছিল না। ছিল স্টেশনের

দিকে। ড্রাইভার ঝুঁকল ওদিক থেকেই আসছে কোনো মক্কেল। সেই লোকটা নয় তো? বোধ হয় না। তার সঙ্গে যা হয়ে গেল সেদিন! তবু বলা যায় না। এরকম সে আরো কিছু কিছু দেখেছে। যতই ঝগড়া হোক, কি করে যেন মিটে যায়। হয়তো মীনা আর সেই বাবুর মধ্যেও একটা আপস হয়ে গেছে। সে যদি হয়, ওর গাড়ি কিছুতেই নেবে না। ওর ওপরে ভীষণ রেগে গিয়েছিল সেদিন। আর অন্য কেউ যদি হয় তাহলেও তাকে এমন ভাব দেখাতে হবে যে মেয়েটাকে সে কোনোদিন দেখে নি। ড্রাইভার, যতক্ষণ শুধু ড্রাইভার মাত্র, ততক্ষণ তার উপস্থিতি কোনো বাধা স্থষ্টি করে না। তাকে মানুষ বলে স্বীকৃতি দিলে তার সামনে সভ্যতার ভব্যতার শালীনতার আবরণগুলো খুলে ফেলা মুশকিল। তার চেনা মানুষ হলে তো কথাই নেই।

এই সব ব্যাপারে বান্তা সিংদের অর্থাৎ শিখ ড্রাইভারদের কিছু বিশেষ সুবিধা আছে। নৈশবিহারী যুগলেরা সাধারণতঃ তাদের ট্যাক্সির দিকে ঝোঁকে। কারণ আর কিছু নয়, এই লম্বাচুল দাড়িওয়ালা জবড়জঙ্গ পোশাকধারী, কিম্ভূতকিমাকার লোকগুলোকে তারা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। কোথাকার কোন্ অজানা মুল্লুকের লোক। যেমন চেহারা, তেমনি আচার-আচরণ। সামনে বসে আছে, থাক না। ওদের সামনে আবার লজ্জা কিসের? তাছাড়া, লোকগুলো ভালো, এসব দিকে নজর নেই। পিছনে বসে কী করছ তোমরা, তা নিয়ে মাথা ঘামায় না।

মোট কথা, অচেনা অজানা বিদেশী ভিন্নভাষী লোকের সামনে যতটা ফ্রী হওয়া চলে, যতখানি রাশ খুলে দেওয়া যায়, নিজের দেশের, নিজেদের মত কাপড়-জামা পরা এবং একই ভাষাভাষী লোকের কাছে ততটা স্বচ্ছন্দ হওয়া যায় না। হাত-পাগুলো আপনা হতেই একটু আড়ষ্ট হয়ে থাকে।

এই নিয়ে বাঙালী ড্রাইভার বন্ধুরা ওদের ঠাট্টা-তামাশা করে।

খানিকটা ঈর্ষাও আছে তার মধ্যে। সামনাসামনি দুটো ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। একটির চালক বাঙালী, আরেকটির শিখ। একজোড়া ফুর্তি-সন্ধানী এল হাসতে হাসতে। দুটো গাড়িই দেখল। হয়তো প্রথম গাড়িখানা দেখতে ভালো, ড্রাইভারটিও সুবেশ। তা সত্ত্বেও যখন দ্বিতীয়টা বেছে নিল তারা, তখন বাঙালী বন্ধুটি বলে ওঠে, যাও, যাও, তোমাদেরই তো পোয়া বারো। পয়সাকে পয়সা, মজাকে মজা!

আজও এই বিশেষ সুবিধাটা নষ্ট করতে চাইল না বান্তা সিং। মীনাকে সে চেনে, এমন কোনো লক্ষণ তার হাবভাব থেকে প্রকাশ পাবে না।

কিন্তু অনেকক্ষণ হয়ে গেল। কারো দেখা নেই। তবে কি ও একাই কোথাও যাবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। একবার জানতে দোষ কী? তা যদি হয়, সেদিনকার মত গাড়িতে তুলে নেওয়া যাবে।

খানিকটা দূরে ছিল মীনা। বান্তা সিং কয়েকবার হর্ন্ বাজাল। সে একবার তাকিয়ে দেখল গাড়িটার দিকে, তাকে বোধ হয় ভালো করে দেখতে পেল না। দেখলেও চিনতে পারল না। নেমে গিয়ে দেখা করা উচিত কিনা যখন ভাবছে, বান্তা সিং লক্ষ্য করল, গাড়ির নম্বরটা ওর নজরে পড়ে গেছে। তারপরেই ছুটতে ছুটতে এগিয়ে এল। নীচু হয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, ওমা, আপনি! আমি বুঝতে পারি নি। আমাকে দেখতে পেয়েছিলেন?

অনেকক্ষণ।

ডাকেন নি কেন?

ঐ তো ডাকলাম।

বাঃ! ওভাবে কেন? এমনিও তো ডাকতে পারতেন।

আমরা ঐভাবেই প্যাসেঞ্জারদের ডাকি।

সে যারা ভাড়া নিতে আসে তাদের ডাকেন। আমি তো আর তা আসি নি।

ড্রাইভার ততক্ষণে দরজাটা খুলে দিয়েছিল, কিন্তু বসে ছিল সীটেই। মীনা দাঁড়িয়ে ছিল তার সামনে। ওধার থেকে কে একজন হাঁক দিল, এই ট্যাক্সি-! বান্তা সিং হাত নেড়ে জানিয়ে দিল, সে যাবে না। মীনা বলল, কোনো ভাড়া আছে বুঝি আপনার ?

না।

তাহলে প্যাসেঞ্জার ছেড়ে দিলেন কেন ?

ছাড়ি নি তো। প্যাসেঞ্জার তো আমার সামনে দাঁড়িয়ে।

আমি। তাহলেই হয়েছে। রোজ রোজ এমনি বিনি ভাড়ার প্যাসেঞ্জার বইলে আপনার চলবে কেমন করে ?

চলে তো যাচ্ছে। কোথাও যাবার দরকার থাকে তো বল, পৌঁছে দিই।

মীনার মুখখানা নিমেষের মধ্যে ম্লান হয়ে উঠল। মিনিটখানেক চুপ করে থেকে বলল, আপনি তো সবই জেনেছেন। আপনার কাছে লুকিয়ে কী লাভ ? দরকার তো আমার নয়, যার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি, তার।···কিন্তু এ কি আর ট্যাক্সি করতে পারবে ? চটকলে সামান্য চাকরি করে, ভাটপাড়া না কোথায় যেন। রেলে করে আসছে। অনেক আগেই তো আসবার কথা। সাড়ে ছ'টার সময় এখানটায় থাকতে বলেছিল। এখন ক'টা বাজে ?

ড্রাইভার হাতঘড়ি দেখে বলল, সাতটা।

তাহলে বোধ হয় ছুটি হতে দেরি হয়েছে। মাঝে মাঝে আবার ওভারটাইম খাটতে হয় তো।

বান্তা সিংয়ের জানতে ইচ্ছা করছিল, এরকম লোকের জন্যে কেন সে দাঁড়িয়ে আছে। এর কাছে আর কতটুকু প্রত্যাশা ? কিন্তু সরাসরি জিজ্ঞাসা করতে বাধল। তার বদলে বলল, আগে থেকেই জানাশুনো আছে বুঝি তোমার সঙ্গে ?

ঠিক জানাশুনো নয়, একদিন মাত্তর দেখা হয়েছে একটা বিয়ে-বাড়িতে। আমাদের দেশের লোক। কি রকম একটা সম্পর্কও নাকি

আছে। আমি ঠিক জানি না। বলছিল, 'আপনার সঙ্গে কথা আছে।' দেখি, কী বলে।

সেদিনকার সেই মোটরবাবুর সম্বন্ধে আবার নতুন করে কৌতূহল হল সর্দারজীর মনে। আজ যে আসছে তার মত সে নতুন নয়। ওদের মধ্যে আগে থেকেই যোগাযোগ ঘটেছিল এবং সান্ধ্য-বিহারেও ঐদিন প্রথম বেরোয় নি, দুজনের কথাবার্তা থেকেই তা স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল। হঠাৎ রেগে গিয়ে পথের মাঝখানে সব সংযোগ শেষ করে দিয়ে গেল। এ তো নয় যে, মীনা কী ধরনের মেয়ে তা সে জানত না। আগেই সে সুযোগ পেয়েছে। এ মেয়ের কাছে কতদূর পর্যন্ত এগুনো যাবে, কোথায় থামতে হবে, সবই তার জানবার কথা।

এর মধ্যে কোথায় যেন একটা রহস্যের ছায়া আছে। হয়তো মীনার তরফেও কোনো আশাভঙ্গের কারণ ঘটেছিল, যার জন্যে সে নিজেকে একটু বেশী গুটিয়ে রেখেছিল সেদিন। এ ব্যাপারটাও সোজাসুজি জিজ্ঞাসা না করে একটু ঘুরিয়ে বলল বান্তা সিং, আজও তোমাকে ঠিক এক জায়গায় দেখে প্রথমটা আমার মনে হয়েছিল বোধ হয় সেদিনকার সেই বাবু আবার কিছু বলতে চায়। ওদিন তো রেগেমেগে—

ও, তার কথা জানেন না বুঝি? তার ক'দিন পরেই সে আমাদের বাসায় এসেছিল—

তোমাদের বাসায়! অত্যন্ত বিস্মিত হল সর্দারজী।

হ্যাঁ, কাকাকে দেখবার নাম করে, যেমন আসত আগে আগে। ওদের কি সব বড় বড় কারবার আছে। কাকা সেখানে চাকরি করতেন। অসুখটা যখন খুব বাড়ল, তখন প্রায়ই কাজে যেতে পারতেন না। ও দু-একবার দেখতে এসেছিল। তারপর আর কাকাকে ওরা রাখল না। কিন্তু বাবুটি তখনো আসত। কাকা মনে করতেন খুব দয়া বুঝি তাঁর ওপর। কিন্তু ওর আসল মতলব আমি তার আগেই টের পেয়ে গেছি। তবু বেরোতে হত ওর সামনে, চা-টা দিতে হত।

তা না হলে কাকা-কাকীমা দুজনেই ভীষণ বকাবকি করতেন। কী করি বলুন? ওঁদের কাছে যখন আছি, খাচ্ছি পরছি, সবই শুনতে হয়।

কাকার তিনটি ছেলে-মেয়ে। বড়টি ছেলে, বয়স পনের-ষোল বছর। তাকে একটা চাকরি দেবার জন্যে ধরলেন ঐ বাবুকে। ইচ্ছে করলেই পারত। মস্ত বড় মাড়োয়ারী ফার্ম—

মাড়োয়ারী! বিস্ময় প্রকাশ করল সর্দারজী। কথা শুনে তো মনে হচ্ছিল বাঙালী।

কোলকাতায় অনেক কাল আছে তো। বাঙালী হয়ে গ্যাছে। ওর আবার খাবার-দাবারের বাছ-বিচারও নেই। মুরগী-টুরগী সব খায়। বাড়িতে অবিশ্যি নয়, রেস্টুরেণ্টে। সে যাক্। চাকরির কথায় ও কি বলল জানেন?

কী?

বলল, ঐটুকুন ছেলে আর কী চাকরি করবে? তার চেয়ে মীনাকে বরং কোথাও ঢুকিয়ে দেওয়া সহজ। আমাদের গদিতে হবে না. ওখানে মেয়েছেলের কারবার নেই। তবে আমার অনেক বন্ধু আছে, তাদের অফিসে চেষ্টা করতে পারি।

কাকা বললেন, ও তো পাস-টাস কিছু করে নি।

পাস-টাস নাই বা করল। একটু-আধটু ইংরেজি-টিংরেজি জানে তো?

তা জানে। ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছে।

তাতেই খুব হবে।

কাকা-কাকীমা দুজনেই চেপে ধরলেন আমাকে। আর আপনাকে বলতে দোষ কী, আমার নিজেরও খানিকটা লোভ হল। সত্যিই যদি একটা চাকরি পেয়ে যাই, সারাজীবনের তরে একটা হিল্লে হয়ে যায়। আর, সংসারের অবস্থা তো বুঝতেই পারছেন। একবেলা জোটে তো আরেক বেলা উপোস।

বড়বাজারের একটা ঠিকানা দিয়ে বলেছিল, ওখানে যেন আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কে নিয়ে যাবে? আমি তো ওদিকের কিছুই চিনি না। ও যে এসে আমাকে বাসা থেকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে, তাতেও পাড়ায় নানা কথা উঠবে। মাঝে মাঝে আসত, তাতেই একদল লোক ঘোঁট পাকাতে শুরু করেছিল। তখন ঠিক হল, এইখানটায় এসে দাঁড়াবো। একথা আর কেউ জানল না। জানলেন কাকা, আর জানলাম আমরা।

আসতে শুরু করলাম। প্রথমে দুপুর বেলা, দুটো তিনটের সময়। ও আসতো আরো পরে। ট্যাক্সি করে নানা জায়গায় ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াত। রেস্টুরেণ্টে নিয়ে গেল দু-তিনদিন। আমি প্রথম প্রথম আপত্তি করি নি। তারপর আর যেতাম না। ওসব খাবার আমার ভালো লাগে না। তাছাড়া আমি বাইরে বেরিয়ে ভালো-মন্দ খাবো, আর ওদিকে ঘরে বসে ওঁরা—কী রকম লাগে বলুন তো?

প্রায়ই মনে করিয়ে দিই, আমার চাকরির কদ্দূর? বাবু বলে, হবে হবে, অত ব্যস্ত হলে কি চলে?

মাঝে মাঝে টাকা দিতে চাইত। আমি নিতাম না। তারপর একদিন কাকার কাছে এল। কী কথা হল দুজনের আমি শুনতে পাই নি, সেইদিনই কাকা আমাকে ডেকে নিয়ে খুব বকলেন, হংসরাজবাবু টাকা দিতে চাইলে নিস না কেন? উনি আমাদের আপনজনের চেয়েও বেশী।

আমি বললাম, কাজ-কম্ম তো কিছু দেন নি। শুধু শুধু টাকা নেবো?

দোষ কী? আমাদের অবস্থা দেখে ওটা উনি অ্যাডভান্স করছেন। পরে চাকরি হলে মাইনে থেকে কিছু কিছু করে কেটে নেওয়া হবে।

মনে করলাম, তাই হয়তো হবে। টাকা নিতে শুরু করলাম। কখনো কখনো বেশ ভালো টাকাই দিত।

টাকা যে কিসের জন্য দিচ্ছে বুঝতে আমার দেরি হল না। গাড়ির

মধ্যে, রেস্টুরেণ্টের ছোট ছোট খোপগুলোর ভিতরে, নানা উৎপাত শুরু করল। আমি যত বাধা দেবার চেষ্টা করি, কে শোনে? বেশী চটাতেও সাহস করি না। চাকরির লোভ তখনো রয়েছে। আর সংসারেও টাকার দরকার। আমি যা এনে দিই তাই একমাত্র সম্বল।

তবু একদিন কাকীমাকে বললাম। কাকাকে তো এসব কথা বলা যায় না। বললেও বুঝবেন না, বুঝতে চাইবেন না। হংসরাজবাবুর ওপরে তাঁর ভীষণ বিশ্বাস। উনি যা করছেন আমাদের জন্যে, আজকালকার দিনে ক'জন করে?

কাকীমা অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, কী করবি বল্? ও মিন্সের মতলব যে কী আমি আগেই টের পেয়েছি। কিন্তু আমাদেরও তো আর কোনো উপায় নেই। ওসব একটু-আধটু সইতেই হবে। আমাদের কি অত খুঁতখুঁতে হলে চলে?

আপনার কাছে বলতে আর লজ্জা কী, একটু-আধটুতে আমি আপত্তি করি নি। ও যে শুধু একটা গরিব পরিবারের উপকার করবার জন্যে আমাকে নিয়ে ঘুরছে না, সেটুকু গোড়াতেই বুঝেছিলাম। টাকা যখন দিচ্ছে, তার কিছুটা অন্ততঃ উসুল করে নেবেই। তার জন্যে তৈরি ছিলাম। কিন্তু একটু-আধটু থেকে ক্রমে যখন বেশী-বেশীর দিকে এগিয়ে চলল তখন তো আর পারি না।

এ পর্যন্ত আমাদের ঘুরবার জায়গা ছিল ট্যাক্সি, রেস্টুরেণ্ট, আর গড়ের মাঠ, ইডেন গার্ডেন। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার পর কোথায় যেন একটা সুন্দর বাড়ির সামনে গিয়ে গাড়ি দাঁড়াল। ট্যাক্সি নয়, প্রাইভেট গাড়ি, ওর কোনো বন্ধুর কাছ থেকে নাকি নিয়ে এসেছিল। আমাকে বসিয়ে রেখে নেমে গেল। মিনিট পনের-কুড়ি বসে রইলাম। তার মধ্যেই দেখলাম, তিন-চার জোড়া মেয়ে-পুরুষ ভিতরে ঢুকল। তাদের চেহারা চাল-চলন সাজ-গোজ যেন কেমন কেমন! আমার সন্দেহ হল। হংসরাজ ফিরে এসে বলল, নামো। আমি নামলাম না। ও উঁ করতে লাগল, এসো না, আমার এক বন্ধুর সঙ্গে তোমাকে

আলাপ করিয়ে দিই। ওর হাতে চাকরি আছে।

আমি বললাম, আমার বড্ড মাথা ধরেছে। আজ থাক, আরেক দিন হবে।

আজ তোমাকে নিয়ে আসব বলে কথা দেওয়া রয়েছে যে।

বলবেন, আমার শরীর খারাপ, আসতে পারি নি।

ও আর বেশী জোর করল না। মুখ বেজার করে উঠে এল গাড়িতে। এক পাশে গুম হয়ে বসে রইল। আসলে লোকটা ভিতরে ভিতরে ভীরু। জোরের সামনে পালটা জোর দেখায় না, থেমে যায়। যাকে বলে বেপরোয়া, তা নয়।

বেপরোয়া হয়েছিল সেইদিন, আপনাঃ গাড়ি যেদিন নিল। ঐ ঘটনার, মানে ঐ বাড়িটার সামনে থেকে যে ফিরে এলাম, তার ঠিক তিন দিন পর। এখানটায় যখন দেখা হল, প্রথমেই বলল, চল, আজ তোমাকে একটা নতুন জায়গা দেখিয়ে আনি। বেশ খোলা-মেলা, পাড়াগাঁ-পাড়াগাঁ ভাব। ধূলো নেই, ধোঁয়া নেই। মাথা-ধরা সেরে যাবে।

পাড়াগাঁ শুনে আমারও মনটা খুশি হয়ে উঠল। থাকি ঘিঞ্জি বস্তিতে। বেড়াই বন্ধ গাড়িতে। মাঠে গিয়ে যেটুকু বসি, স্বস্তি পাই না। ফাঁকা হলেও চারদিকে যে ক'টা চোখ চোখে পড়ে সবগুলোর মধ্যেই সন্দেহ। সবাই যেন বলছে, তোমরা কী, কী করতে এসেছ আমরা জানি। মাঝে মাঝে আবার পুলিসের লোক ঘুরে যায়। তাদের চোখে শুধু সন্দেহ নয়, শাসানি, বেচাল কিছু করে বসো না। হংসরাজের হাত দুটোকেও বিশ্বাস নেই। ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়। সত্যিই যদি পুলিসের হাতে পড়তে হয়, কেলেঙ্কারির আর শেষ থাকবে না।

তাছাড়া পাড়াগাঁয়ের মেয়ে আমি। ছেলেবেলাটা যেখানে কাটিয়ে এলাম, তার কোনো তল্লাটে একখানাও পাকা বাড়ি নেই। শুধু খড়োঘর, ধান-পাট-সর্ষে ক্ষেত, পান-পুকুর আর আম-কাঁঠালের বাগান,

খেজুরগাছ, বেতঝোপ, জবাফুল, স্থলপদ্ম। সে যে কী দেশ আপনাকে কেমন করে বোঝাবো। এখানে তা পাবো না, জানি। তবু পাড়াগাঁ তো। দু-চারখানা ক্ষেত, কিছু ঝোপ-ঝাড়, দু-চারটা গোরু-বাছুর নিশ্চয়ই দেখা যাবে।

বললাম, চলুন। তখন কি জানি কোন্ পাড়াগাঁয়ে আমাকে নিয়ে চলেছে হংসরাজ? অনেকটা ফাঁকা জায়গা। রাস্তাগুলো সবে তৈরি হচ্ছে। দূরে দূরে দু-চারখানা পাকা বাড়ি। কিছু উঠে গেছে, খোলা জানলা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে, আর কিছু উঠছে। চারদিকে ভারা বাঁধা, গাঁথনি চলছে। একটাও লোক নেই কোনোখানে। কী করতে আসবে লোক? দিনের বেলায় হয়তো আসে, ঐ বাড়িগুলোয় যখন কাজ হয়, সন্ধ্যার আগেই চলে যায়। এমন জায়গায় কেউ বেড়াতে আসে।

খানিকক্ষণ সেই এবড়ো-খেবড়ো মাঠে ঘুরিয়ে একটা আধা-তৈরি অন্ধকার বাড়ি দেখিয়ে বলল, চল, ওখানটায় গিয়ে বসি।

ওর আসল মতলবটা তখন আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। কেবল ভাবছি, এখানে চেঁচিয়ে গলা ফাটালেও কারো সাড়া পাওয়া যাবে না। আপনার গাড়িটাও দেখা যাচ্ছে না। সেটা যে কোন্‌দিকে, তাও খেয়াল নেই। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আরো ভয় হল। ক'দিন আগে সেই বাড়িটার সামনেও ঠিক এই চোখ দেখেছিলাম। সেখানে লোকজন ছিল, নিজেকে বাঁচাবার উপায় ছিল। এখানে নেই। তাই আজ ও সত্যিই বেপরোয়া। কিন্তু ভয় পেয়েছি, এটা ওকে বুঝতে দেওয়া হবে না। তাই যেন কোনো কিছু সন্দেহ করি নি এমনি ভাবে বললাম, ওখানে কোথায় বসবেন? সাপ-খোপের আড্ডা।

না, না। ওখানে সাপ আসবে কোথেকে? আচ্ছা, তাহলে এসো, এখানটাতেই বসা যাক। আর ঘুরতে ভালো লাগছে না।

আমারও। চলুন না, গাড়িতে ফিরে যাই।

এত তাড়াতাড়ি কিসের? এসো।

আমার হাতটা ধরে টেনে নিয়ে চলল, অমনি একটা বাড়ির সামনে খানিকটা চাতালের মত ছিল, সেই দিকে। বুঝলাম, বাধা দিলে জোর করবে, ওর সঙ্গে আমি পেরে উঠবো না।

বসলাম গিয়ে চাতালের উপর। ও বসল আমার গা ঘেঁষে। হঠাৎ চোখে পড়ল, একজন লোক লণ্ঠন নিয়ে এদিকে আসছে। কাছাকাছি আসতে একটু সরে গেলাম ওর কাছে থেকে। লোকটা আমাদের দিকে তাকাতে তাকাতে চলে গেল। আমিও উঠে পড়লাম। হংসরাজ হাত বাড়িয়ে খপ করে আমার আঁচলটা ধরে ফেলে বলল, কোথায় যাচ্ছ ?

তৎক্ষণাৎ মনে হয়েছিল, যা মুখে আসে শুনিয়ে দিই। লোকটা তখনো বেশী দূরে যায় নি। একটু ভেবে নিয়ে সামলে গেলাম। শুধু বললাম, ছাড়ুন, আবার কে এসে পড়বে !

আঁচলটা একরকম জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে লোকটা যেদিকে গেল সেইদিকেই চলতে শুরু করলাম। হংসরাজ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সেই চাতালটার ধারে। আমি খানিকটা এসে, যেন কিছুই হয় নি, এমনি ভাবে ফিরে বললাম, কী হল ! আসুন। তখনো আসছে না দেখে একটু অপেক্ষা করলাম। তারপর ও এল।

পথে আসতে আসতে দু-একটা সাধারণ কথা পাড়লাম। গুমোট ভাবটা যাতে কেটে যায়। তার মানে, আপনাকে বলতে আর বাধা কী, এত কাণ্ডের পরেও সব ব্যাপারটা ঐখানে শেষ করে দেবার মত সাহস আমার ছিল না। তাই, লজ্জার মাথা খেয়ে বলছি, তখনো টেনে রাখতে চেয়েছিলাম। ও-ই রাখল না। সে-সব তো আপনি জানেন। তার জন্যে ওকে আমি দোষ দিই না। আমিও আর পারছিলাম না।

বান্তা সিং অনেক আগেই তার সীট থেকে উঠে এসে গাড়ির ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল এবং একটানা শুনে যাচ্ছিল। এবার তার কথা

শোনা গেল, তুমি যে বলছিলে তার পরেও লোকটা তোমাদের বাসায় গিয়েছিল ?

ও, হ্যাঁ ! কাকাকে বলতে গিয়েছিল, অনেক চেষ্টা করেও আমার চাকরির কোনো সুবিধে করে উঠতে পারে নি। কাজেই আমার আর তার সঙ্গে দেখা করার দরকার নেই।

এখন তোমাদের চলছে কেমন করে ?

চলছে না-ই বলতে পারেন। কাকার বড় ছেলেটাকে পাড়ার এক ভদ্দরলোক তার দোকানে ঢুকিয়ে নিয়েছে। ফার্নিচারের দোকান। দুবেলা দুটো খেতে পায় আর মাইনে দশ টাকা। যা দেয়, খাটিয়ে নেয় তার পাঁচগুণ।

তোমার কাকা-কাকীমা কিছু বলছেন না ?

বলছেন আবার না ? উঠতে বসতে কথা শুনতে হচ্ছে। শুনে যাই। কথায় তো আর গায়ে ফোস্কা পড়ে না। হ্যাঁ, হংসরাজবাবু একটা উপকার করে গেছেন আমার। বস্তির একটা ছোট মেয়েকে পড়াতাম, মাস গেলে পাঁচটা টাকা আসত। তারা 'না' বলে দিয়েছে। ওর সঙ্গে অ্যাদ্দিন ধরে ঘুরছি, কেউ বোধ হয় দেখে ফেলেছে কোনোখানে।···ঐ যে এতক্ষণে এসে গ্যাছেন ভদ্দরলোক।

মীনা গাড়ির কাছ থেকে খানিকটা সরে গেল। সর্দারজীও তার সীটে গিয়ে বসল। একটি বাঙালী মেয়ের সঙ্গে এতক্ষণ ধরে কী কথা বলছে একটা পাঞ্জাবী ট্যাক্সি-ড্রাইভার ! ব্যাপারটা দেখে কিছু পথচারী এবং আশেপাশে লোকজন আকৃষ্ট না হয়ে পারে নি। প্রথমটা হয়তো ঝগড়াঝাঁটি বা ঐরকম কিছু একটা সন্দেহ করেছিল। কারো কারো মনে এ আশাও জেগে থাকতে পারে, যে-কোনো মুহূর্তে এগিয়ে এসে নাগরিক কর্তব্য পালন অর্থাৎ লোকটাকে মাংসপিণ্ডে এবং তার গাড়িটাকে লৌহপিণ্ডে পরিণত করবার সুযোগ দেখা দেবে। কিন্তু কোনো তরফেই বিন্দুমাত্র উত্তাপের লক্ষণ না দেখে বোধ হয় নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছিল। খুব কাছে না ঘেঁষে একটু দূরে দূরে থেকে পরিস্থিতিটা

কি রকম দাঁড়ায় তার উপর নজর রেখেছিল। কিছুই হল না দেখে নিরাশ হয়ে সরে পড়ল।

বান্তা সিংও বাবুটিকে দেখে নিরাশ হল। রোগা লিকলিকে চেহারা। পরনে প্রায় তারই মত ময়লা খাকি প্যান্ট, শার্টটা সস্তা ছিটের, ত ও বিশেষ ফর্সা নয়। দুচোখে ক্লান্তির ছাপ। অনেক দিন ধরে অনেক খাটুনির পর যে ক্লান্তি আসে। চেহারা দেখেই চাকরির আন্দাজ করা যায়। চটকলে অনেক স্তরের বাবু আছে। এটি বেশ কিছুটা নীচের স্তরের। এর কাছে কী আশা করে মীনা ?

দেখে কিন্তু আশ্চর্য হল, যে হাসিটি দিয়ে মীনা ঐ বাবুকে অভ্যর্থনা জানাল, সেটা সেদিনকার মত জোর করে টেনে আনা নয়। অথচ হংসরাজ এর তুলনায় কত উপরে, কত বেশী শাঁসালো। সত্যিই মেয়েমানুষের মন বোঝা ভার মনে মনে আওড়াল ড্রাইভার।

বাবুটি একখানা ময়লা রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, বড্ড দেরি হয়ে গেল। একটা মেশিন ব্রেকডাউন হওয়াতে আটকে গেলাম। এমন কিছু নয়, আমার অ্যাসিস্ট্যান্টই পারত। কিন্তু সাহেবের আবার আমাকে ছাড়া আর কারো ওপরে ভরসা নেই। বলে বসল, 'বোস, তুমি যাও।' গেরো আর কী! আপনি অনেকক্ষণ এসে দাঁড়িয়ে আছেন ?

না, অনেকক্ষণ কোথায়।

কোথায় যাওয়া যায় বলুন তো। একটু ফাঁকা জায়গায়···যা ভিড় কলকাতায়। তার আগে কিছু একটু খেয়ে নেওয়া দরকার। চলুন না, সামনের ঐ চায়ের—

আমি কিছু খাবো না। সলজ্জ ভাবে মাথা নীচু করে বলল মীনা।

কেন ?

না, আমার একদম খিদে নেই। এই তো চা-টা খেয়ে এলাম।

বান্তা সিং জানে, কথাটা স্রেফ মিথ্যা। 'টা' দূরে থাক, শুধু এক ভাঁড় চাও জুটবার কথা নয়। দুপুরেও তেমন কিছু জুটেছে কিনা

সন্দেহ। বাবু আর পীড়াপীড়ি করল না। বলল, চলুন তাহলে গড়ের মাঠের দিকে যাওয়া যাক। কিন্তু ট্রাম-বাসএর যা অবস্থা। কি রকম ঝুলতে ঝুলতে চলেছে লোকগুলো। একটা ট্যাক্সি নিলে হয়। এই তো একটা রয়েছে এখানে।

বলতে বলতে সর্দারজীর গাড়ির কাছে এগিয়ে গেল ঃ এই ট্যাক্সি, ভাড়া যায়গা।

কাঁহা ?

ময়দানমে যানে মাংতা হ্যায়।

উঠ যাইয়ে।

কেত্‌না পড়েগা ?

বাস্তা সিং-এর মনে হল, মিটারে যা উঠবে শুনলে নিশ্চয়ই ভেগে যাবে লোকটা। তার ফল ভুগতে হবে মীনাকে। বেচারাকে বাস্‌-এ করে টানতে টানতে নিয়ে যাবে। তাছাড়া, কথাবার্তা কী হয় এদের মধ্যে তাও শুনবার ইচ্ছা ওর। তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, দেড়-দো রূপেয়া হোগা। অউর কেথ্‌না ?

ঠিক হ্যায়, চলো। আসুন।

মীনাকে ডেকে নিয়ে উঠে পড়ল।

খানিকটা ফাঁক রেখেই বসল এবং তেমন কোনো ঘনিষ্ঠতার চেষ্টাও করল না।

মীনার বাড়ি-ঘরের খবর, দেশের খবর জিজ্ঞাসা করে জেনে নিল। নিজের সম্বন্ধেও কিছু কিছু জানিয়ে দিল। বেশীর ভাগ অফিসের কাজকর্ম সংক্রান্ত।

এসপ্ল্যানেড পেরিয়ে কিছুদূর গিয়েই বাস্তা সিং বলল, ময়দান আ গিয়া। কাঁহা যায়েঙ্গে ?

ও, এসে পড়েছি নাকি ? আচ্ছা, সামনে রোখ দেও।

পার্ক স্ট্রীট মোড়ের কাছাকাছি গাড়ি রাখল ড্রাইভার। বাবুটি নেমে পড়ে জানতে চাইল কত উঠেছে মিটারে। বাস্তা সিং সেদিকে

না· তাকিয়েই বলল, এক রুপেয়া আট আনা। বাবুর বোধ হয় বিশ্বাস হল না। এগিয়ে গিয়ে মিটারের অঙ্কটা দেখেই চট করে টাকাটা বের করে দিয়ে মীনাকে নিয়ে রাস্তা পার হবার জন্যে ফুটপাথ থেকে নেমে পড়ল। যেতে যেতে চাপা গলায় যা বলল, ড্রাইভারের কান এড়াল না -- লোকটা ভুল করেছে। অনেক বেশী উঠেছে ভাড়া। যাক, তাড়াতাড়ি চলুন।

শুনেই পিছন ফিরে গাড়ির দিকে তাকাল মীনা। সর্দারজীর হাসিটি বোধহয় তার নজরে পড়ল না। গাড়ি ততক্ষণে এগিয়ে গেছে।

বান্তা সিং-এর সঙ্গে বেশ কিছুদিন দেখা হয়নি সত্যদার। তার কথা বোধহয় ভুলেই গিয়েছিলেন। মাঠে-ঘাটে ঘোরাও একরকম ছেড়ে দিয়েছিলেন। চমকপ্রদ বিশেষ কিছু পান নি। সব সেই খাড়া-বড়ি-থোড়। নিতান্তই পান্‌সে জিনিস। এ-যুগের উঠতি বয়সের পাঠক-পাঠিকার পাতে দেবার মত নয়। তারা আরো গরম কিছু চায়। দু-একজন অপেক্ষাকৃত তরুণ সাহিত্যিক নিয়মিত তাদের খোরাক যুগিয়ে চলেছিল। সত্যভূষণ কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলেন না, সে-সব বস্তুর মালমশলা কোত্থেকে পাচ্ছে তারা। কোনো এক সাপ্তাহিক পত্রিকার অভিজ্ঞ সম্পাদক তাঁকে সেই গোপন উৎসের সন্ধান দিলেন। বললেন· চৌরঙ্গী পাড়াতেই পাবেন। রাস্তার ওপারে নয়, এপারে। মানে, মাঠে মাঠে না ঘুরে আপনাকে ঘুরতে হবে ফুটপাথে, অলিতে-গলিতে।

সত্যদা তখনো ধরতে পারেন নি। সম্পাদক আরো স্পষ্ট হলেন —'বই-এর আড্ডায়। বিদেশ থেকে আমদানি অনেক বই পাবেন, ঐ নিয়ে যারা কারবার করে তাদের কাছে। যেগুলো ওরা সামনে

ছড়িয়ে বসে আছে, তার মধ্যে পাবেন না। ওসব বাজে মাল। আসল জিনিস থাকে আড়ালে। কৌশলে যোগাড় করতে হবে। চড়া দাম নেবে। তবে তার বদলে রসও পাবেন কড়া। আপনাকে আর কিচ্ছু করতে হবে না, শুধু নাম-ধাম বদলে যেমনটি আছে ঠিক তেমনটি সাজিয়ে দেওয়া। সাহিত্যের ভাষায় যার নাম পরিবেশন। দেখবেন, কী রকম কাটে আপনার মাল।'

এ লাইনে দুর্দান্ত নাম করেছে, এমনি একজন লেখকের নাম করে বললেন সম্পাদক, ও তো এই করেই চালাচ্ছে। যা কিছু লিখছে সব ঐ বইগুলো থেকে নেওয়া। কাহিনী হুবহু এক, শুধু হেনরীর জায়গায় হিরণ, আর মেরীর জায়গায় মীরা। রাস্তা, পার্ক, হোটেলের নামটাম-গুলোও পাল্টাতে হচ্ছে, যাতে করে পাঠককে বোঝানো যায় সব এই কলকাতা শহরের বাস্তব ঘটনা।

সত্যদা নেমে পড়লেন বই খুঁজতে। কিন্তু সুবিধা করতে পারলেন না। তাঁর নধর, ছিমছাম চেহারা দেখেই লোকগুলোর শুঁড় গুটিয়ে নেয়, কেউ কেউ আবার পুলিসের লোক বলে সন্দেহ করে। অগত্যা সেই পুরনো রোমান্স সম্বল করে তার মধ্যে যতটা আধুনিক আদিরসের ভিয়ান দেওয়া যায়, সেইদিকে পুরো নজর রেখে একখানি উপন্যাস ধরেছিলেন।

একদিন ট্রামের হাতল ধরে চলেছিলেন প্রকাশক পাড়ায়। মাঝে মাঝে যেতে হয়। ওখানে গেলে জানা যায় হাওয়া কোন্ দিকে বইছে। পালটা টেনে সেইভাবে বসাতে হবে তো। তা না হলেই পিছিয়ে পড়লেন আপনি। লেখকের পক্ষে সে যে কতখানি মারাত্মক, ভালো করেই জানেন সত্যভূষণ।

পার্ক স্ট্রীট আর চৌরঙ্গীর চৌমাথায় লাল আলোর সামনে দাঁড়িয়ে গেছে ট্রাম। পাশে একরাশ গাড়ি, কোনোটা হাঁপাচ্ছে, কোনোটা ফুঁসছে। তার ভিতর থেকে চেনা গলার হাঁক, উতার যাইয়ে বাবুজী। চমকে উঠলেন সত্যদা। আবার সেই কণ্ঠ, জলদি উতার

যাইয়ে। দেখলেন, খালি গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সর্দারজী। নেমে পড়লেন। সেই মুহূর্তে সিগন্যালের চক্ষুচক্ষুর রোষ কেটে গিয়ে দেখা দিল হলুদের প্রসন্নতা এবং পরক্ষণেই সবুজের দাক্ষিণ্য। বান্তা সিং-এর গাড়ি এগিয়ে গেল। সত্যদা তার নাগাল পেলেন না। কিন্তু লক্ষ্য করলেন ওপারে গিয়েই থেমে গেছে ফুটপাথের ধারে। সঙ্গে সঙ্গে সে-ও নেমে পড়ে হাত নেড়ে ডাকছে তাঁকে।

কোথায় যাবেন? কাছে গিয়ে পৌঁছতেই জানতে চাইল বান্তা সিং।

সত্যদা বললেন, যাবো তো ভাবছিলাম কলেজ ষ্ট্রীট।

বেশ তো, উঠে পড়ুন। পৌঁছে দিচ্ছি।

সত্যবাবু ভেবে দেখলেন, এতটা পথ যাবেন ওর গাড়িতে, ভাড়া দিতে চাইলে নেবে না। তার চেয়ে খানিকক্ষণ না হয় গল্প করা যাক ওর সঙ্গে। সেই মেয়েটার সম্বন্ধেও একটা কৌতূহল ছিল মনের মধ্যে। এতদিন চাপা পড়ে ছিল, এবার ওকে দেখে মাথা তুলে উঠল। বললেন, থাক্, এমন কিছু কাজ নেই ওখানে। না গেলেও চলবে। আপনার খবর কী বলুন?

আমার আর কী খবর বাবুজী! চলে যাচ্ছে।

সেই মেয়েটির সঙ্গে আর দেখা হয়েছিল?

বান্তা সিং কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে বলল, হয়েছিল।

তাই নাকি? তারপর?

এখানে তো বেশীক্ষণ গাড়ি দাঁড়াতে দেবে না। চলুন না ঐ দিকটায়, সব বলছি। আপনার যখন হাতে কোনো কাজ নেই···

আমার নেই, কিন্তু আপনার তো আছে। দু-চারটে ভালো ভাড়া মারা যাবে। আমার জন্যে অনেক লোকসান হবে আপনার।

বাবুজী, টাকাটাই সব নয়। সেদিন আপনার কাছে যা পেলাম, তার দাম লাখটাকার চেয়ে বেশী।

কোথায়! কী এমন দিলাম আপনাকে? বসে খানিকক্ষণ গল্প

করা, এই তো ?

হ্যাঁ বাবুসাব্। কিন্তু—যাক, ওটা আমার কথা, আপনি বুঝবেন না।

রেড রোডের বাঁক ঘুরে গাড়িটা ইডেন গার্ডেনের দিকে নিয়ে গেল বান্তা সিং।

সত্যদা বললেন, চলুন, ভিতরে গিয়ে ঘাসের ওপর জমিয়ে বসা যাক।

সরাসরি মীনার কথা তুলল ড্রাইভার।

সেদিন গাড়িতে বসে সামান্য যে কথা হয়েছিল সেই পাতলা বাবুর সঙ্গে, তার থেকে বান্তা সিং এটুকু বুঝতে পেরেছি, ওরা আবার দেখা করবে এবং এমনি নিরালা কোনো জায়গায়। ওকে আবার সেই পুরনো নেশায় পেয়ে বসল। শিয়ালদর ঐ মোড়ের ধারে গিয়ে বসে থাকা। একদিন গেল, দুদিন গেল, তিনদিনের দিন দেখল তার অনুমান ঠিক। মীনা এসে দাঁড়িয়ে আছে, চোখ দুটো স্টেশনের দিকে। হরন্ দিতেই একগাল হেসে এগিয়ে এল। বলল, আপনি অনেক দিন বাচবেন সর্দারজী!

তাই নাকি ? কী করে জানলে ?

আমি যে এখ্খনি আপনার কথা ভাবছিলাম।

কী ছিল কথাটার সুরে। বান্তা সিং-এর মনের মধ্যে কে যেন এক ঝলক রঙিন আনন্দ ছড়িয়ে দিল। তার আভা তার চোখেমুখেও ফুটে উঠে থাকবে। সেই দিকে চোখ রেখে মীনা বলল, আপনি এমনিই এসেছিলেন, না, প্যাসেঞ্জার ছিল ?

বান্তা সিং সত্যি কথাটা বলতে পারত—'এমনি নয়, প্যাসেঞ্জারও ছিল না। এসেছিলাম তোমার জন্যে।' বলল না। তার বদলে হাল্কা সুরে বলল, এমনি কি আর আসি আমরা ? সওয়ারি ছিল। নামিয়ে দিয়ে নতুন সওয়ারির জন্যে বসে আছি।

বলেই, মীনার মুখে দিকে তাকাল। সন্দেহ ছিল, সে বোধ হয়

কথাটা বিশ্বাস করল না। কিন্তু তার কথায় তেমন কিছু প্রকাশ পেল না। বলল, বাড়িতে আপনার কে কে আছে সর্দারজী?

বাড়ি আবার কোথায়? সেদিন শুনলে না, তোমারই মত সব ওপারে ফেলে এসেছি।

মীনা একটা গভীর নিশ্বাস ফেলে বলল, এখানকার বাসায়?

বাসায় আর কে থাকবে? একটা ছোকরা ক্লীনার আছে।

আপনার বৌ, ছেলে-মেয়ে?

এবার হেসে উঠল ড্রাইভার, বৌ-ছেলেমেয়ে আসবে কোত্থেকে?

কেন, বিয়ে করেন নি বুঝি?

ঐ যে এসে গ্যাছেন বাবু।

মীনা সেদিকে একবার চকিত দৃষ্টি ফেলে চাপা গলায় শাসনের সুরে বলল, আজ কিন্তু কিছুতেই কম ভাড়া নিতে পারবেন না, বলে দিচ্ছি।

বাবুটি এগিয়ে আসতে আসতে বলল, এসে পড়েছ?

উত্তরে মীনা একটু হাসল। বাবু এদিক-ওদিক চেয়ে বলল, আজ চল, ট্রামে করে যাই। ডিপো থেকে হাইকোর্টের ট্রাম ধরে একেবারে টার্মিনাসে গিয়ে নেমে পড়বো। সামনেই ইডেন গার্ডেন, গঙ্গার ধার। যেখানে হোক বসা যাবে।

বেশ তো, তাই চলুন।

দুটো-একটা ট্রাম ছেড়ে দিয়ে উঠলে বসেই যাওয়া যাবে।···আচ্ছা, একটু দাঁড়াও, আমি এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে আসি।

এদিক-ওদিক চেয়ে সিগারেটের দোকান দেখতে না পেয়ে রাস্তা পার হয়ে ওপারে চলে গেল। সেই ফাঁকে হর্‌ন্ বাজিয়ে মীনাকে ডাকল বান্তা সিং এবং কাছে আসতেই বলল, তোমরা ফিরছ কখন?

আটটা হবে বোধ হয়। তার মধ্যে তো ফিরতেই হবে।

আমি থাকবো।

অতক্ষণ বসে থাকবেন আপনি?

বান্তা সিং সে কথার জবাব না দিয়ে বলল, এখানে নয়। আমরা একটু গল্প করি, এখানকার লোকগুলোর তা পছন্দ নয়। আরেকটু এগিয়ে ঐ হাসপাতালের সামনে থাকবো।

বাবুটি সিগারেট নিয়ে রাস্তা পার হচ্ছিল। আর কোনো কথা হল না।

আটটা নয়, প্রায় সাড়ে আটটা নাগাদ নীলরতন সরকার হাসপাতালের সামনে মীনাকে দেখা গেল। বেশ ব্যস্তভাবে প্রায় ছুটতে ছুটতে এল। এসেই বলল, বড্ড দেরি হয়ে গেল। বাসায় গিয়ে বকুনি খেতে হবে।

বান্তা সিং হাত বাড়িয়ে পিছনের দরজাটা খুলে দিয়ে বলল, উঠে এসো।

আজ আবার এতটা পথ—

কথা না শুনলে আমার কাছেও বকুনি খাবে। কৃত্রিম কড়া সুরে বলল ড্রাইভার।

আচ্ছা গো আচ্ছা। বলে, যেন সত্যিই বকুনির ভয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল মীনা। মুখখানা চাপা হাসিতে উজ্জ্বল।

গাড়ি যখন চলতে শুরু করেছে, ঝুঁকে পড়ে সামনের সীটের পিছনটায় চিবুক রেখে বলল, আমাকে আপনি বকতে পারেন?

কেন পারবো না?

কই, বকুন তো!

এরকম ভালো মেয়ের মত যে কথা শোনে তাকে কেউ বকে নাকি?

কিন্তু আমি তো সত্যিই ভালো মেয়ে নই।

এ সুর একেবারে আলাদা। বান্তা সিং চমকে উঠে পিছন ফিরে তাকাল। গাড়িটাও যেন একটা ঝাঁকুনি খেয়ে আবার চলতে শুরু করল। ড্রাইভার কোনো কথা বলল না। মীনা কিছুক্ষণ চুপ করে

থেকে বলল, আপনাকে বলা হয় নি। আমি একটা চাকরি পেয়েছি।

চাকরি! আবার পিছন দিকে তাকাল সর্দারজী। কী চাকরি? এবার রীতিমত খুশির সুর।

দর্জির দোকানে। একরকম মেয়েদের দোকানই বলতে পারেন। মানে, বুড়ো মালিক ছাড়া আর সবাই মেয়ে। মোট চারজন আছি আমরা। কাজও করি মেয়েদের—ব্লাউজ, সায়া, ফ্রক, পেনি এইসব।

কত মাইনে দেয়?

পনের টাকা। সবে কাজ শিখছি তো। খানিকটা শেখা হলে বাড়িয়ে দেবে বলেছে। তবে বেশীদিন টিকতে পারবো বলে মনে হয় না।

কেন?

মালিকটি বিশেষ সুবিধের নয়।

কাজ-টাজ নিয়ে খিটখিট করে বুঝি?

না, না। সে-সব কিছু না, অন্য ব্যাপার।

অন্য ব্যাপার মানে?

ফাঁক পেলেই কাঁদুনি গাইতে থাকবে—'আমি একা মানুষ, অনেকদিন হল বৌ মারা গেছে। বয়স হয়েছে, কে দেখাশুনো করে? ছেলেরা কেউ কাছে রইল না। তুমি মাঝে মাঝে এসে একটু খোঁজ-খবর নিও।'·· বার বার বলাতে গেলাম একদিন। ও মা, এও দেখছি প্রায় সেই হংসরাজ। সে তবু দু-চারবার আসা-যাওয়ার পর মুখোশ খুলেছিল, এর সে-সব বালাই নেই। যেতে না যেতেই আসল মতলব ফাঁস! বলে, মুখ টিপে হাসল মীনা।

ড্রাইভার কথা বলল না, গম্ভীর মুখে ধীরে ধীরে গাড়ি চালাতে লাগল। মীনা কিছুক্ষণ নীরবে তাকে লক্ষ্য করে বলল, আপনি কি ভাবছেন, আমি জানি। ভাবছেন, তোমার মুখে ওকথা মানায় না। এই মাত্তর কী করে এলে?

এবার বান্তা সিং মুচকে হাসল—তুমি তো দেখছি মানুষের মনের

কথা খুব বুঝতে পার। একেবারে ঠিক ঠিক ধরে ফেলেছ।

তাহলে কী ভাবছেন বলুন?

ভাবছিলাম অন্য কথা।

আমাকে বলবেন না?

বাস্তা সিং আড়চোখে তাকিয়ে দেখল, পিছনের সীট থেকে দুটি গভীর আগ্রহ-দীপ্ত চক্ষু একাগ্র দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে। তবু নীরব হয়ে রইল।

গাড়িটা পুলের উপর দিয়ে চলেছিল। পার হয়ে সেদিন যেখানটায় ওকে নামিয়ে দিয়েছিল তার কাছাকাছি ফুটপাতের ধার ঘেঁষে দাঁড় করাতে করাতে বলল, এখন নয়। যদি কোনোদিন বলবার সুযোগ আসে তখন বলবো। তার আগে একটা কথা জিজ্ঞাস করবো?

কী কথা?

কিছু মনে করবে না?

মনে করবো? আপনার কথায়?

জানি, করবে না। তবু একবার জেনে নিলাম। এই বাবুটির সঙ্গে তুমি ঘুরছ কেন? এও কি তোমার কাকা-কাকীমার হুকুম?

না; তাঁরা এর কিছু জানেন না। তাঁরা জানেন, আমি দোকানে কাজ করতে যাই, সাড়ে আটটায় দোকান বন্ধ হয়, তারপর বাড়ি ফিরি।

এই পর্যন্ত এসে থেমে গেল মীনা। বাস্তা সিং-এর দিকে একবার চাইল। বুঝল, বাকীটুকুর জন্যে সে অপেক্ষা করে আছে। মাথা নীচু করে মৃদু সলজ্জ কণ্ঠে বলল, ও না অন্য কথা বলছে। আপনাকে এমনিই বলতাম। জিজ্ঞেস করা লাগত না।···আজ থাক। আসছে রোববার। আপনি আসবেন তো?

আসবো।

আপনার গাড়িতে কিন্তু যাবো না।

বেশ তো, ফিরে এসে বলো।

হাতপাতালের সামনে?

না, এবার উল্টো দিকে। স্টেশন ছাড়িয়ে উত্তর দিকে যেতে কতগুলো ফার্নিচারের দোকান আছে দেখেছ

দেখেছি।

ওর একটুখানি আগে থাকবো।

রবিবারে সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ বালিগঞ্জ থেকে দুজন শেয়ালদর রেলযাত্রী পেয়ে গেল বান্তা সিং। তাদের মেইন স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে গাড়ি লাগাল। একবার ভাবল, এত তাড়াতাড়ি তো আসবে না মীনা, কাছাকাছি কোথাও আরেকটা ট্রিপ দিয়ে এলে কেমন হয়। শেষ পর্যন্ত না যাওয়াই স্থির করল। বলা যায় কি! অন্য দিনের চেয়ে বেশ কিছুটা আগেও এসে পড়তে পারে। একা একা দাঁড়িয়ে থাকবে? চলেও যেতে পারে যদি বেশীক্ষণ দাঁড়াতে হয়।

না গিয়ে ভালোই করেছিল

মীনা সুন্দরী নয়, কিন্তু মুখখানা মিষ্টি। সেদিন আরো মিষ্টি লাগল সর্দারজীর চোখে। রাস্তার আলোর নীচে এসে যখন দাঁড়াল, সারা চোখ-মুখ থেকে যেন একটা নতুন দীপ্তি উপচে পড়ছে, এতদিন যা কখনো দেখা যায় নি। বান্তা বুঝতে পারল না, হঠাৎ এই পরিবর্তনটা ঘটল কেমন করে। মীনাও চুপ করে আছে দেখে জিজ্ঞাসা করল, কী ব্যাপার? খুব যে খুশি দেখছি আজ।

মীনার মুখে একটি লালচে আভা দেখা দিল। মাটির দিকে চেয়ে মৃদুস্বরে বলল, আজ কথাবার্তা সব ঠিক হয়ে গেল।

এবার বুঝতে পারল বান্তা সিং, কিন্তু তাকিয়ে রইল। তখনো তার বিস্ময় কাটে নি।

'বিস্ময়ের অবশ্য কোনো কারণ ছিল না,' সত্যদা বলেছিলেন আমাকে গল্পটা যখন শোনান, 'সব দেশের সব স্তরের মেয়েরা যা চায়, এতটুকু বয়স থেকে যার স্বপ্ন দেখে, এইমাত্র তারই আশ্বাস পেয়েছে

মীনা। ঘর বাঁধবার ডাক এসেছে কোনো মনোমত জনের কাছ থেকে। সুখে সমুজ্জ্বল সেই আসন্ন দিনের দীপ্তি ঠিকরে এসে পড়ছে ওর চোখে, কপালে, গণ্ডে, ওর সারা দেহে। তার ছোঁয়া যখন লাগে অতি সাধারণ মেয়েকেও মনে হয় কত সুন্দর। কোনোকালে যার রূপ ছিল না, ঐ বিশেষ ক্ষণটিতে সে-ও অপরূপ হয়ে ওঠে।'

পলকের তরে ড্রাইভারের মুখে একটি ম্লান ছায়া পড়ল। এবার চলে যাবে মীনা, আর তাকে দেখা যাবে না বেলেঘাটার রাস্তার মোড়ে, নীলরতন সরকার হাসপাতালের সামনে, কিংবা পার্ক ষ্ট্রীটের ধারে। গাড়ির মধ্যে বসে, কখনো তার পাশে দাঁড়িয়ে এত যে কথা হত ঘণ্টার পর ঘণ্টা, তারও এইখানে শেষ। কলকাতার বাইরে কোথায় কোন্ চটকলের বাবুর ছোট্ট কোয়ার্টাসে ছোট্ট সংসার পেতে নতুন জীবন শুরু হবে ঐ মেয়েটির। বান্তা সিং নামক এক ট্যাক্সি-ড্রাইভারের জীবনে শুধু দুদিনের তরে এসেছিল, এবার চিরদিনের তরে হারিয়ে যাবে।

পরক্ষণেই নিজেকে টেনে তুলল সর্দারজী। ছি ছি, এসব কী ভাবছে সে! ওর মত তারও তো আজ সুখী হবার কথা, ওর আনন্দে আনন্দ জানাবার কথা।

একগাল হেসে বলল, আমাকে মিঠাই খাওয়াচ্ছ কবে?

সেইদিন খাওয়াবো। আপনাকে তো থাকতেই হবে।

নিশ্চয়ই থাকবো।

তারপর গোটা ইতিহাস খুলে বলল মীনা। সেই বিয়ে-বাড়িতে দেখে অবধি ওকে মনে মনে পছন্দ হয়েছে লক্ষ্মণবাবুর। এ ক'দিন ধরে একটি একটি করে নিজের সব কথা বলেছে, কিছুই চেপে রাখে নি। আগে একবার বিয়ে হয়েছিল। সে বৌ নেই। একটি ছেলে হয়েছিল, সে-ও মারা গেছে। শূন্য ঘর ভালো লাগে না। তাই আবার সংসার করবার ইচ্ছা হয়েছে। সে ইচ্ছা পূরণ করতে রাজী হয়েছে মীনা। বয়স একটু বেশী ভদ্রলোকের। সবে চল্লিশ ছাড়িয়েছে। তাতে আর কী হয়েছে? রোগ-ব্যামো নেই, গড়নটাই

অমনি। সে নিজেই বা কী? এর চেয়ে ভালো আর কোথায় পাবে?

মীনার কাকা-কাকীমাকে জানাতে চেয়েছিল লক্ষ্মণ। সে-ই রাজী হয় নি। তাঁরা যে মনে মনে খুশি হবেন না, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। পনেরটা টাকা আসছিল মাস-মাস। সেটা বন্ধ হবে। বাগড়া দিয়ে বসবে কিনা কে বলতে পারে? পাড়ার লোকগুলোও ভালো নয়। আজকালকার দিনে কেউ কারো ভালো দেখতে পারে না। হংসরাজের ব্যাপার নিয়ে দু-একটা পরিবার কম ঘোঁট পাকায় নি। এর কানে যদি সে-সব কিছু তুলে দেয়, তাহলে সব পণ্ড।

শেষ পর্যন্ত স্থির হয়েছে বিয়েটা হবে কালীঘাটে। ওর জানাশুনো পুরুত আছে। সে-ই মন্ত্র পড়াবে। তারপর মায়ের পায়ে ঠেকানো সিঁদুর পরিয়ে দেবে সিঁথিতে। তাহলেই হল। এরকম তো আকছার হচ্ছে আজকাল। মীনাদের পাশের বস্তির, ওর জানাশুনো একটি মেয়ের এমনি করে বিয়ে হল কিছুদিন আগে। দিব্যি ঘর করছে তারা।

আসল কথা হল মনের মিল। আর সব ফালতু। তাই কিনা বলুন?

সর্দারজীকেই সাক্ষী মানল মীনা। সে তৎক্ষণাৎ সায় দিল, আলবৎ। দিল সাফ থাকলেই সব সাফ। আর, ওখানটায় যদি গড়বড় হয়—

বাকীটা আর শেষ করল না। এমন একটা শুভ সূচনায় সে কথা বলতে নেই।

বিয়ের তারিখটা ওদিন ঠিক হয় নি। অফিসে ছুটির ব্যবস্থা করতে হবে। আরো কিছু কিছু কাজ-কর্ম আছে লক্ষ্মণবাবুর। সে সব সারতে ক'দিন সময় যাবে। সব ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে আসছে রবিবার এসে জানিয়ে যাবে, কবে পড়বে সেই শুভদিন। একটু দেরি করে আসবে। ওদিন তো আর ঘোরাঘুরি নেই। একবার শুধু দেখা করে—

ঘোরাঘুরি নেই কেন? বাধা দিল ড্রাইভার, ওদিন আমি তোমাদের ঘোরাবো, যেখানে খুশি, যতক্ষণ খুশি।

মীনার মনটা আনন্দে নেচে উঠল। তার মুখ দেখেই তা

স্পষ্ট বোঝা গেল।

তারপর কী ভেবে দ্বিধার সুরে বলল, কিন্তু এ যদি রাজী না হয়?

তুমি রাজী করাবে।

মীনার দ্বিধা তখনো কাটছে না দেখে (তার কারণটা যে অর্থঘটিত বুঝতে পারল সর্দারজী) আরেকটু জোর দিয়ে বলল, 'আচ্ছা, আমি রাজী করাবো। তখন তুমি যদি কিছু বলতে আস, তাহলে'—বলে, হাত মুঠো করে কিল দেখাল।

এবার আর বকুনিতে কুলোবে না, সোজা ধরে মার। বলতে বলতে হেসে গড়িয়ে গেল মীনা। তার সঙ্গে যুক্ত হল ড্রাইভারের মোটা গলার অট্টহাসি।

শুধু বিয়ের দিনটা জানিয়ে আর সেই প্রসঙ্গে দরকারী কথাবার্তা যা আছে, বলবার এবং শুনবার, সেটা শেষ করেই লক্ষ্মণ চলে যাবে, গোড়াতে এই রকম বন্দোবস্ত থাকলেও, কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, বাবুটির অত তাড়াতাড়ি যাবার ইচ্ছা নেই। এসেছে যখন, একটু বেড়িয়ে গেলে মন্দ কী? এ ক'দিনের তুলনায় আজকের বেড়ানোটা অন্য রকম। আরো কাছে এসেছে দুজন দুজনের! মাঝখানে যে ফাঁক ছিল এতদিন আজ আর তা নেই বললেই চলে। এই রকম একটা ভাবই যেন দেখা যাচ্ছিল বাবুটির চলন-বলন-আচরণে। অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশ খানিকটা স্ফূর্তিবাজ। কিছুটা হয়তো দ্রব্যগুণের প্রভাব। ছুটির দিন। চটকলের পাশেই সব ব্যবস্থা মোতায়েন। পেটে খুব বেশী না হলেও কিছু পড়েছে। মীনা ধরতে পারে নি। এ জাতীয় অভিজ্ঞতা তার ছিল না। হংসরাজবাবু অন্য দু-চারটা দোষে যতই দোষী থাক, পানদোষ থেকে মুক্ত ছিল। কাজেই এ চীজ দেখবার সুযোগ মীনার হয় নি। বান্তা সিং এদের চোখ দেখলেই বুঝতে পারে, আর একে ততটা দোষ বলেও মনে করে না, যতক্ষণ অবশ্য সীমা ছাড়িয়ে না যায়।

বাবুটির মেজাজ বেশ অনুকূল দেখে তার খোপ থেকে বেরিয়ে এসে লম্বা সেলাম করে চোস্ত হিন্দীতে বলল, চিনতে পাচ্ছেন বাবুজী ?

লক্ষ্মণ চোখ কুঁচকে তাকাল, চিনতে পারল না। মাথা নেড়ে তার নিজস্ব হিন্দীতে জানাল, কোথায় দেখেছি তোমাকে ?

সে কী ! এই তো সেদিন এখান থেকে নিয়ে গেলাম আপনাদের। পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে নেমে ময়দানে হাওয়া খেতে গেলেন।

ও, তোমার গাড়িতে গিয়েছিলাম বুঝি !…কেমন করে বুঝবো বাবা ! মুখ দেখে কি চিনবার উপায় আছে ? সবই তো সুন্দরবন।

শেষের অংশটা নীচু গলার স্বগতোক্তি, ভাষাও বাংলা।

বান্তা সিং যে কিছু বুঝতে পেরেছে তেমন কোনো আভাস দিল না। কিন্তু লজ্জায় পড়ল মীনা। এই ধরনের আবার কী সব উক্তি করে বসবে আশঙ্কা করে বলে ফেলল, সর্দারজী খুব ভালো বাংলা জানেন।

কথাটার মধ্যে এমন একটা অন্তরঙ্গ সুর ছিল, (মীনার পক্ষে যা অত্যন্ত স্বাভাবিক) যে লক্ষ্মণ শুধু বিস্মিত নয়, কেমন একটু ঘোরালো দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকাল। সেখানে যেন কিছু একটা পড়বার চেষ্টা করল। তারপর বলল, তুমি ওকে চেন নাকি ?

বাঃ, চিনি না ! সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল মীনার মুখ থেকে।

কী করে চিনলে ? এটা শুধু প্রশ্ন নয় তার সঙ্গে আরো কিছু ছিল, যা কানে যেতেই চকিত দৃষ্টিতে লক্ষ্মণের দিকে তাকাল মীনা। কী উত্তর দেবে ভেবে পেল না। পরিচয়ের প্রথম সূত্রটা তো খুব সরল নয়। যেভাবেই প্রকাশ করুক, তার পর আরো প্রশ্ন থেকে যাবে।

বান্তা সিং বুঝতে পারছিল, এই জটিল অবস্থা থেকে মীনাকে বাঁচানো দরকার। কিন্তু সে-ই বা কী বলবে ? অথচ দেরি করাও চলে না। তাড়াতাড়ি যা মনে এল বলে ফেলল, আমার গাড়িতে উঠেছেন কিনা দু-একদিন।

'ও-ও !' বলে, লক্ষ্মণ পকেট থেকে সিগারেট বের করল। একটা ড্রাইভারের দিকে এগিয়ে ধরে বলল, চলে নাকি ?

তা চলে বৈকি। হাত বাড়িয়ে সিগারেট নিল বান্তা সিং। মনে মনে খুশি হল, ব্যাপারটা তাহলে সহজেই মিটে গেল। ও নিয়ে আর মাথা ঘামাচ্চে না বাবু।

উৎসাহ বেড়ে গেল সর্দারজীর। বলল, চলুন না, খানিকটা ঘুরিয়ে নিয়ে আসি আপনাদের।

যাবে নাকি? মীনাকে জিজ্ঞাসা করল লক্ষ্মণ। স্বর শুনে মনে হল ভিতরে ভিতরে সে প্রলুব্ধ হয়ে উঠেছে।

তুমি বোঝ, আমার আর আপত্তি কী? সলজ্জ চোখ তলে খুশিমুখে বলল মীনা।

দাঁড়াও, পকেটের অবস্থাটা একবার দেখে নিই।

পকেট আপনাকে দেখতে হবে না বাবুজী। তৎক্ষণাৎ বলল ড্রাইভার।

তা বললে কী হয়? শেষকালে একটা মোটা টাকা উঠে বসবে মিটারে। আচ্ছা, তার চেয়ে এক কাজ কর না কেন? ফুরণ করে নাও।

ফুরণ-টুরণ কিচ্ছু লাগবে না। ব্যাপারটা তাহলে খুলে বলি আপনাকে। ঠাকুরপুকুর জানেন তো? আলিপুর, বেহালা ছাড়িয়ে ওখানে আমার এক ভাই থাকে। বেমারে পড়ে চিঠি দিয়েছে। তাকে দেখতে যাবো। গাড়ি নিয়েই যাবো। এটাকে আর কোথা রেখে যাই বলুন। ব্যস, ঐসঙ্গে আপনাদেরও নিয়ে যাবো।

আবার এখানেই ফিরে আসবে তো?

নিশ্চয়ই। এদিকেই তো থাকি আমি।

বেলেঘাটার দিকটা দেখিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে চোখাচোখি হল মীনার সঙ্গে। সে হাসছিল। হয়তো মনে পড়েছিল সেই প্রথম দিনকার কথা। সেদিনও এই একই কথা বলেছিল সর্দারজী—বেলেঘাটায় থাকি আমি। হাসির ভিতরে অন্য কথাও ছিল—ঠাকুর-পুকুরের কাহিনীটি যে তখনই মুখে মুখে তৈরি হল, সেটা সে বুঝে

ফেলেছে। ঐ হাসিটি যেন মাথা নেড়ে বলছে, আমাকে আপনি ঠকাতে পারেন নি, আমি আপনাকে চিনি।

দেখতে দেখতে বান্তা সিংয়ের চোখের উপরেই সে হাসিটা মিলিয়ে গেল। তার জায়গায় ফুটে উঠল একটি সস্নেহ অনুযোগ ভরা সকৃতজ্ঞ দৃষ্টি—কেন আপনি এতখানি করছেন আমার জন্যে? আমি তো আপনাকে কিছুই দিই নি, দিতে পারি নি, কখনো দিতে পারবো না।

সর্দারজী তার জবাব দিল মনে মনে, দিয়েছ বৈকি! তুমি তা জানতে পার নি।

বান্তা সিংয়ের হঠাৎ খেয়াল হল, বাবুটি তাদের লক্ষ্য করছে। তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে তাকেই তাড়া দিয়ে উঠল, তাহলে চলুন।

বেহালার ভিড় ঠেলে, শখের বাজারের দোকান-পাট পার হয়ে ফাঁকা রাস্তায় গিয়ে পড়ল ট্যাক্সি। স্পীডও তিরিশ-চল্লিশের কাঁটা ছাড়িয়ে পঞ্চাশের দিকে ঝুঁকল। একবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখল সর্দারজী, আজ ওরা অনেকটা ঘন হয়ে বসেছে। দুরন্ত হাওয়ার মুখে আঁচল আর চুল সামলাতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে মীনা। মুখখানা ফেটে পড়ছে আনন্দ আর উত্তেজনায়। এর চেয়েও আরো নিবিড় এবং বলা যেতে পারে নির্লজ্জ হয়ে তাকে বসে থাকতে দেখেছে আরেক-জনের সঙ্গে। সেদিন সে-মুখে ছিল বিরক্তি আর অনুৎসাহের অন্ধকার, আজ সেখানে তৃপ্তি আর উদ্দীপনার আলো। সেদিন তার সারা অঙ্গে ছিল অনিচ্ছার কাঠিন্য, আজ সেখানে স্ব-ইচ্ছার শিথিলতা। সেদিন সে নিজেকে অবাঞ্ছিতের কাছে বাধ্য হয়ে সঁপে দিয়েছিল, আজ এটা তার বাঞ্ছিতের কাছে আত্মসমর্পণ।

মনের ভাবগুলো ঠিক এভাবে নিশ্চয়ই ব্যক্ত করে নি বান্তা সিং। এটুকু সত্যভূষণ চট্টরাজের ভাষ্য। সে যা বলেছিল, এবং যেটুকু বলতে গিয়েছিল, পারে নি, সব একসঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন।

ওরা বিশেষ কিছুই বলছিল না। বলা তো সব আগেই হয়ে

গেছে। এখন শুধু নীরব প্রতীক্ষা, একটি বিশেষ দিনের জন্য। সেই কথাই, বোধহয় চলছিল ওদের মনে মনে। আনন্দ যখন কানায় কানায় পূর্ণ, কণ্ঠ তখন নীরব। ভরা কলসীর জলে কি আর শব্দ হয়?

ঠাকুরপুকুর রইল পড়ে পিছনে। সে খবর কেউ জানল না।

আমতলা পেরিয়ে আরো খানিকটা গিয়ে একটা খোয়ার রাস্তায় মোড় নিল ড্রাইভার। পথে আলো নেই, দুধারে গাছপালা। এতক্ষণ দুধার দিয়ে গাড়ি এবং লোকজনের যাতায়াত চলেছিল, এখানে কোনোটাই নেই। না মানুষ, না গাড়িঘোড়া। শুধু দূরে একটা দুটো মৃদু আলো, দেখা দিয়েই সরে যাচ্ছে গাছ-গাছালির আড়ালে।

লক্ষ্মণ সোজা হয়ে বসল। এদিক ওদিক চেয়ে খানিকটা ভয়ে ভয়ে বলল, এ কোথায় নিয়ে চললে?

এই তো এসে গিছি। ভরসা দিল ড্রাইভার।

কোনো মতলব-টতলব নেই তো? এ প্রশ্নটা মীনার উদ্দেশ্যে। খুব নীচু গলায় বললেও বান্তা সিংয়ের কানে গেল। উত্তরটাও শুনতে পেল কান পেতে। একটি চাপা ঝঙ্কার, 'কী যে বল তার ঠিক নেই। শুনতে পেলে কী মনে করবেন উনি!'

কী জানি বাবা, ড্রাইভার ক্লাসের লোক, ওদের বিশ্বাস কী? তার ওপরে আবার পাঞ্জাবী!

ওঁকে চেনো না, তাই ও-কথা বলছ—কথার সুরে অস্পষ্ট রইল না, যে মনে মনে আহত হয়েছে মীনা।

বান্তা সিং গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ল। লক্ষ্মণের কাছে সরে এসে নীচু হয়ে বলল, আপনাদের একটু বসতে হবে বাবুজী। বেশীক্ষণ নয়, বড়জোর আধ ঘণ্টা। এই কাছেই থাকে আমার ভাই। আপনাদের কোনো ভয় নেই। দুধারে বাড়ি-ঘর আছে। তবে গ্রাম তো, সন্ধ্যার পর রাস্তায় লোক থাকে না। তবু যদি দরকার মনে করেন, হর্‌ন্ বাজিয়ে দেবেন। আমি শুনতে পাবো। ওই তো ওর ঘর দেখা যাচ্ছে।

খানিকটা পথ হেঁটে গিয়ে একটা গাছের নীচে পা ছড়িয়ে বসে সিগারেট ধরাল বাস্তা সিং। মীনার মুখখানাই জুড়ে বসল মনের মধ্যে। সেই সঙ্গে তাদের কতদিনের কত কথা।

এই তো ক'দিন হল, বেলেঘাটার ব্রীজ পেরিয়ে যখন গাড়ি গিয়ে লাগল ওর বস্তির সেই রাস্তার মোড়ে, কথায় কথায় সেদিন একটু বেশী এগিয়ে গিয়েছি মীনা নেমে পড়ে জামাকাপড় ঠিকঠাক করতে করতে বলেছিল, আজ আপনার বড্ড দেরি হয়ে গেল।

কোথায় দেরি ?

এখন গিয়ে আবার রান্না করতে হবে তো ?

রান্না ! রান্না কে করবে ?

তাহলে খাবেন কী ?

দোকান থেকে কিছু খেয়ে নেবো।

মীনার মুখখানা করুণ হয়ে উঠল। একটু থেমে কি যেন ভেবে নিয়ে বলল, কেন এত কষ্ট করেন ? বিয়ে করলেই তো পারেন। কত ভালো ভালো সুন্দরী মেয়ে আছে আপনাদের মধ্যে।

কোথায় দেখলে তুমি ভালো ভালো সুন্দরী মেয়ে ?

বাঃ, রাস্তাঘাটে দেখা যায় না বুঝি ? তাছাড়া ঐ যে গুরুদ্বার না কি বলে, আপনাদের যেখানে পূজো হয়, সেখানে একবার গিয়েছিলাম কী একটা পরবে। কত মেয়ের ভিড় ! কিন্তু যাই বলুন, আপনাদের ঐ সালোয়ার-পাঞ্জাবি আমার মোটেই ভালো লাগে না।

আমারও না। ওর চেয়ে অনেক ভালো লাগে তোমাদের এই শাড়ি।

বেশ তো, শাড়ি-পরা বাঙালী মেয়েই নিয়ে আসুন না। আজকাল তো শুনছি জাত-টাত কেউ মানে না। সব রকমই হচ্ছে।

তারা আমার মত একটা ড্রাইভারকে পছন্দ করবে কেন ?

ইস্, পছন্দ আবার করবে না।

আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিল মীনা। একটা প্যাসেঞ্জার এসে পড়তেই চলে গেল।

সিগারেট খেতে খেতে এমনি আরো অনেক দিনের ছোট ছোট টুকরো স্মৃতি ভিড় করে আসছিল। বান্তা সিং সেগুলোকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেলে মনে মনে বলল, যাক, মেয়েটার একটা হিল্লে হল। বড্ড ভেসে বেড়াচ্ছিল। অনেক কষ্ট, অনেক লাঞ্ছনা সইতে হয়েছে। এবার সুখী হোক।

হাতে ঘড়ি ছিল। রেডিয়াম ডায়াল। হঠাৎ নজর পড়তেই লাফ দিয়ে উঠল। আধ ঘণ্টা কখন পেরিয়ে গেছে। কিন্তু ওরা তো হর্‌ন্ বাজায় নি। ওরাও নিশ্চয়ই ভুলে গেছে ঘড়ির কথা। মনে মনে হাসল বান্তা সিং। ভুলবারই কথা!

কাছাকাছি গিয়ে গলা-খাঁকারি দিয়ে জানান দিতে যাচ্ছিল সে আসছে, হঠাৎ থেমে গেল। মীনার গলা কানে গেল—ওঁকে সব বলেছি। আমাকে বড্ড ভালবাসেন কিনা। তাই ছাখ না, এত খরচ-পত্তর করে এত দূরে বেড়াতে নিয়ে এসেছেন। ভাইয়ের অসুখ-টসুখ সব বাজে। এ শুধু আমাদের···বুঝলে না?

একটি মিষ্টি মৃদু হাসির শব্দ। তারপরেই কেমন একটা গম্ভীর আওয়াজ—'বুঝেছি।'

ড্রাইভার সাড়া দিয়ে এগিয়ে এল।

যথারীতি শিয়ালদ স্টেশনের বাইরে সেই মোড়টিতে এসে গাড়ি থামল। দুজনেই নেমে পড়ল। ভাবী স্বামীকে খানিকটা এগিয়ে দিতে যাচ্ছিল মীনা। লক্ষ্মণ বাধা দিল—না, তোমাকে আর আসতে হবে না। রাত হয়েছে, বাড়ি চলে যাও।

তবু কিছুক্ষণ সে দাঁড়িয়ে রইল এবং লক্ষ্মণ দৃষ্টির বাইরে চলে যেতেই যেন উড়ে এসে দাঁড়াল গাড়ির পাশে। খুশি আর ধরে রাখতে পারছিল না। এসেই বলল, তেরো তারিখে, মানে আসছে মঙ্গলবার

সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা। মনে থাকবে তো? কালীঘাটে মন্দিরের পাশে একটা মাংসের দোকান আছে না? অনেক ছোট ছোট পাঁঠা বাঁধা আছে দেখবেন। সেটা ছাড়িয়েই মনোহর পাণ্ডার দোকান। ওখানে আমাদের পুরুত থাকবে। আপনি একটু আগেই যাবেন কিন্তু।

ওখানে যাবো কী! তোমাকে বাসা থেকে নিয়ে যেতে হবে না?

না, বাসা থেকে তো সকালেই বেরিয়ে পড়ছি। মাসিমার ওখানে গিয়ে থাকবো।

মাসিমা!

মাসিমা মানে, বুড়োর দোকানে আমরা একসঙ্গে কাজ করি। মানুষটি বড় ভালো। আমাকে খুব ভালোবাসেন। বলেছেন, আমাকে সাজিয়ে-টাজিয়ে দেবেন।

কোথায় থাকেন তিনি?

এই তো বউবাজারের একটা গলির মধ্যে।

তাহলে সেখান থেকে নিয়ে নেবো তোমাকে। ঐ সব পাঁঠার দোকান-টোকান তুমি চিনবে কেমন করে?

বাঃ, সেদিন গিয়ে যে দেখে এলাম ওর সঙ্গে। জানেন, পাঁঠাগুলোকে দেখে এমন কষ্ট হচ্ছিল! সব বলির জন্যে রেখেছে। আমাদের সামনেই একজন দুটো কিনে নিয়ে গেল।

আচ্ছা, এবার উঠে এসো। বাসায় যেতে হবে না?

সে কথা যেন হুঁশই ছিল না। এতক্ষণে খেয়াল হল। গাড়িতে উঠতে উঠতে বলল, চলুন।...হ্যাঁ, শুনুন, ও না—আমাকে চিঠি দেবে বলেছে। কাকার ঠিকানা চাইছিল। আমি বুঝিয়ে দিলাম, ওখানে চিঠি দেওয়া ঠিক হবে না। কার হাতে পড়বে, কেউ হয়তো খুলে পড়বে। তার চেয়ে ভবানীপুরে আমার এক ভগ্নীপতি থাকে, সেখানে দিও। বলে, আপনার ঠিকানা দিয়ে দিলাম।

যেন ভারী একটা মজা করে ফেলেছে এমনিভাবে ছেলেমানুষের মত হেসে উঠল মীনা। বাস্তা সিং হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। ভাবতে

লাগল, এই বোধ হয় আরেকটা ভুল করে ফেলল মেয়েটা। মীনা তার ভাবনার সূত্রটা আন্দাজ করে থাকবে। বলল, খালি নম্বরটা দিয়েছি। ও জিজ্ঞেস করল, তোমার ভগ্নীপতির নাম কী? আমি বললাম, তাঁর নাম লাগবে না, আমার নাম আর ঐ ঠিকানা দিলেই পেয়ে যাবো।··· হ্যাঁ, চিঠি এলে কিন্তু পৌঁছে দিতে হবে আপনাকে।

বান্তা সিংয়ের ভাবনা দূর হল না। কিন্তু এখন এসব কথা তুললে ওকে শুধু ঘাবড়ে দেওয়া হবে। আর সত্যি সত্যি লাভও কিছু নেই, যা হবার তা তো হয়ে গেছে। তাই ও প্রসঙ্গে না গিয়ে বলল, পৌঁছে তো দিতে হবে বুঝলাম। কিন্তু কোথায়?

কেন এইখানে। সাড়ে আটটায় দোকান বন্ধ হলে, রোজ একবার করে ঘুরে যাবো। চিঠি না থাকলে আপনার আসবার দরকার নেই।

কিন্তু 'দরকারটাই' কি সব? চিঠির কোনো পাত্তা নেই। তবু রোজ সাড়ে আটটায় সেই মোড়টিতে গিয়ে দাঁড়ায় বান্তা সিং। মীনা আসে ছুটতে ছুটতে। চিঠি নেই শুনে এক পলক একটু মুষড়ে পড়ে। তার পরেই চন্‌বন্‌ করে ওঠে, যাকগে, চিঠি দিয়ে কী হবে?

চিঠি এল সোমবার, ওদের বিয়ের তারিখের আগের দিন, সন্ধ্যার ডাকে।

শিয়ালদ থেকে ঘুরে আসতেই ক্লীনার নিয়ে এল 'ইন্‌ল্যাণ্ড'খানা। বান্তা সিং তার দেহাতী গুরুমুখীতে একটা কড়া খিস্তি উচ্চারণ করে (সম্ভবতঃ ঐ খামখানার উদ্দেশে কিম্বা নিজের উদ্দেশেও হতে পারে) হতাশ হয়ে বসে পড়ল। মীনার কাকার বাসা সে চেনে না। চিনলেও এত রাত্রে এক শিখ ট্যাক্সি-ড্রাইভার তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, এটা তার পক্ষে বিশেষ সুখকর হবে না। মীনার মুখে বস্তিটির যে বর্ণনা শুনেছে, তার থেকে এই অভিযান তার নিজের পক্ষেও কতটা নিরাপদ, সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল।

পরদিন ভোরে উঠে গাড়ি নিয়ে ঐ ব্রীজের ওপারে গিয়ে দাঁড়াল।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখল রাস্তায়, চলমান বাস-এর মধ্যে, চলন্ত রিক্‌শায়। খানিকটা এগিয়ে রাস্তার মোড়গুলো দেখে এল। কোথায় ? এত ভিড়ে কোন্ ফাঁকে বেরিয়ে গেছে একটা পাতলা রোগা মেয়ে, কিংবা মিশে গেছে স্টেটবাস-এর কোন লেডিস সীটের খোপের আড়ালে, কার সাধ্য নজর রাখে।

ছটা বাজবার বেশ কিছুটা আগেই একটু বিশেষ সাজগোজ করে অর্থাৎ নিত্যকার সেই খাকীর খোলশ ছেড়ে পাটভাঙা কালো প্যান্টের উপর সাদা শার্ট চাপিয়ে একটি সুদৃশ্য পাগড়ি বেঁধে কালীঘাটে যাবার জন্যে তৈরি হল সর্দারজী।

ক্লীনার ছোকরা তারই দেশের ছেলে। তারই মত উদ্বাস্তু। কেমন করে যেন ছিটকে এসে পড়েছিল কোলকাতায়। রাস্তায় রাস্তায় ভেসে বেড়াচ্ছিল। বান্তা সিং এক চায়ের দোকানের সামনে দেখতে পেয়ে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছিল। তখনো সে গাড়ি কিনতে পারে নি। একটা মাঝারি গোছের মোটর গ্যারেজের মেকানিক। সারাদিন খাটে, নির্দিষ্ট ঘণ্টার পরেও ওভারটাইম। যা পায়, সামান্য কয়েকখানা রুটি, মাঝে মাঝে দু-চার টুকরো মাংস আর কয়েক গেলাস চা, এর পিছনে যতটুকু লাগে দিয়ে বাকী সবটা জমায়। ঐ ছোকরা এসে ভাগ বসাল তার মধ্যে। একটা ফালতু খরচ। তবু যে কেন তাকে নিয়ে এসেছিল, বান্তা সিং নিজেই জানে না। হয়তো ছোট ভাইটার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল।

পশ্চিম পাঞ্জাবের লায়ালপুর থেকে হেঁটে রওনা দিয়েছিল ভারতবর্ষের দিকে। একটা ছোট দল। রাত্রির অন্ধকারে বিশ্রাম করছিল কোনো এক পাহাড়ের নীচে। মুসলমান গুণ্ডারা দেখতে পেয়ে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দলে অনেক ভারী, তার উপরে মারাত্মক হাতিয়ার তাদের হাতে। মেয়েগুলোকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। ছোট ছেলেগুলোকে ছুঁড়ে ফেলল আগুনের ভিতর। ওর ভাইটাও ছিল তার মধ্যে। তার পোড়া চেহারাটা এখনো চোখের সামনে ভাসছে।

এ ছোকরার সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। দেখতে কত সুন্দর ছিল সে। তবু মানুষের মন কোথায় কার মধ্যে কী দেখতে পায় কেউ বলতে পারে না। বান্তা সিং ডেকে নিয়ে এল ছেলেটাকে। খাইয়ে পরিয়ে তাজা করে তুলল, জামা-কাপড় কিনে দিল। সেই থেকে রয়ে গেছে। একটা জানাশুনো মোটর কারখানায় ঢুকিয়ে দিয়েছে। সেখানে কাজ করে আর নিজেদের গাড়িটা ধুয়ে-মুছে ঠিকঠাক করে রাখে।

আরশির সামনে দাঁড়িয়ে পাগড়িটা ঠিক করতে করতে হঠাৎ সেই পুরনো দিনগুলোর মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে পড়েছিল। তৎক্ষণাৎ নিজেকে টেনে সরিয়ে নিয়ে এল সেখান থেকে। মনে পড়ল, যেখানে সে প্রথম কাজ শিখতে ঢোকে, সেই গ্যারেজের মালিক, তারই মত পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে উৎখাত, একটা কথা জোর দিয়ে বলেছিলেন তাকে, শোক-টোক সব শিকেয় তুলে রাখো। চোখের জলটা আওরতদের জন্যে। তুমি মরদ, তোমার জন্যে আছে শুধু মাথার ঘাম।

আরশিতে ক্লীনার ছোকরার ছায়া পড়ল। মুখ টিপে টিপে হাসছে।

হাসছিস যে? ছদ্ম-ধমকের সুরে বলল বান্তা সিং।

দেখছি। সাজগোজ করলে তোমাকে খুব সুন্দর দেখায়। কোথায় যাওয়া হবে শুনি?

বিয়েতে।

বিয়েতে! কার বিয়ে?

আছে একজন। তুই কি সবাইকে চিনিস?

তবু শুনি একবার।

একটি মেয়ে।

'মেয়ে!' একেবারে থ হয়ে গেল ছোকরা।

কোন্ জাত জানিস? বাঙালী।

এবার আর তার মুখ থেকে বাক্যস্ফূর্তি হল না, শুধু ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে গেল। তার মনিব যখন গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল তখনো সেটা বন্ধ হয় নি।

পাঁঠার দোকান পেরিয়ে পাণ্ডার আস্তানায় যখন পৌঁছল, তখনো মীনা বা তার বরের দেখা নেই। একটু পরেই তার রিক্শা এসে লাগল। সঙ্গে এক প্রৌঢ়া মহিলা। সলজ্জ হাসিমুখে ধীরে ধীরে নেমে এল মীনা। পরনে গাঢ় লাল রংয়ের শাড়ি-ব্লাউজ, দাম বেশী নয়, কিন্তু দেখতে চমৎকার, পরিপাটি চুল বাঁধা, খোঁপায় জড়ানো বেলফুলের মালা, মুখে সামান্য প্রসাধন। অপরূপ দেখাচ্ছিল তাকে। বান্তা সিং মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল।

মহিলাটি ওর বাহু ধরে এগিয়ে নিয়ে এলেন। মীনা বলল, আমার মাসিমা।

বান্তা সিং বাঙালী ধরনে হাতজোড় করে নমস্কার করল। তিনও কপালের উপর আঁচলটা একটু টেনে প্রতি নমস্কার জানালেন। তারপর মীনার সঙ্গে দু-একটা কি কথা বলে চলে গেলেন। মীনা আরেকটু এগিয়ে এল সর্দারজীর কাছে। সে বলল, ওকি! উনি থাকবেন না?

না। উনি বিধবা কিনা, ওঁকে এ সময়ে থাকতে নেই।

ও, তাই বুঝি?

কিন্তু আমার তরফে যা কিছু করবার সব করেছেন। কত কী দিয়েছেন দেখুন। এই কাপড়, জামা, বালা, দুল—সব ওঁর দেওয়া। এগুলো অবিশ্যি নকল সোনা। তাহলেও কিনতে তো হয়েছে, আর দামও নেহাৎ কম নয়। অথচ ওঁর রোজগার তো জানি। কত মানা করলাম, কিন্তু শুনলেন না। আবার বলে দিয়েছেন, জামাইকে নিয়ে এসো একদিন। সেদিন আমার ওখানে দুটো ডালভাত খাবে।

বলতে বলতে মীনার মুখে একটু উদ্বেগের ছায়া পড়ল। একবার পিছন দিকে চেয়ে দেখে বলল, ক'টা বাজে দেখুন তো?

এই সাড়ে ছ'টা হল। ও-হো, তোমার একটা চিঠি আছে।

তাই নাকি! কখন এল?

কাল রাত্তিরে বাসায় ফিরে পেলাম। তারপর আজ ভোরে উঠে ছুটোছুটি।

ছুটোছুটি!

সেই পুলের কাছে একবার এদিকে একবার ওদিকে। কিসে করে গেলে তুমি?

ওমা! আমি তো কাল রাত্তিরেই মাসিমার ওখানে গিয়েছিলাম। রাত থাকতে উঠে দধিমঙ্গল করতে হয় কিনা।

সে আবার কী?

পরে বলবো। কই, চিঠিটা দিন।

ও, এই নাও।

মীনা সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিয়ে ধার ছিঁড়ে পড়তে শুরু করল।

লাইন কয়েক লেখা। পড়তে পড়তে লক্ষ্য করল বান্তা সিং, সেই হাসি-হাসি মুখখানা হঠাৎ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। মনে হল, কে যেন এক টানে সবটুকু রক্ত শুষে নিয়ে গেছে। তারপরই একটা অস্ফুট চিৎকার করে সেই রাস্তার উপরেই বসে পড়তে যাচ্ছিল। বান্তা সিং খপ্ করে হাতটা ধরে ফেলল। ধীরে ধীরে নিয়ে গেল দোকানের মধ্যে, একটা বেঞ্চির উপর বসিয়ে দিতে দিতে বলল, কী হল? কী লিখেছে?

সে আসবে না।

আসবে না! কেন?

সে কথা আমি আপনাকে বলতে পারবো না।

বলতে বলতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

দোকানের লোকগুলো হঠাৎ হতভম্ব হয়ে গেছে। বান্তা সিংও যে কি করবে বুঝতে পারছিল না। থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অকস্মাৎ মনে হল, তবে কি তারই জন্যে··! কিন্তু এখানে কোনো কথাই বলা চলে না। এই মুহূর্তে এখান থেকে বেরিয়ে পড়া দরকার। হাত বাড়িয়ে ওর বাহুটা ধরে বলল, আস্তে আস্তে উঠে এসো।

কোথায় যাবো? দুটি অশ্রুভরা অসহায় করুণ চোখ তুলে ধরল

বান্তা সিংয়ের মুখের পানে। আমার তো আর যাবার জায়গা নেই। শুনেছি এখানে গঙ্গা আছে। আপনি আমাকে—

ছিঃ, এ সময়ে কি অমন করে ভেঙে পড়লে চলে?

ধরে ধরে একরকম জোর করেই যখন বাইরে নিয়ে যাচ্ছে, পিছন থেকে শুনল, কে একজন বলছে, যাচ্চলে! আশা করেছিলাম, সবমিলিয়ে গোটা পাঁচেক টাকা বুঝি অন্ততঃ থাকবে। ও হরি! সব ফক্কা।

যেতে যেতে থেমে গিয়ে পিছন ফিরে লোকটার দিকে তাকাল বান্তা সিং। সে আর কিছু বলল না। ওপাশ থেকে আরেকজন, সম্ভবতঃ দোকানের মালিক, বলে উঠল, আপনারা যান, ও আপনাদের কিছু বলে নি। ওকে পুরুত ঠিক করা হয়েছিল কিনা, তাই—

বান্তা সিং বাঁ হাতে মীনাকে ধরে রেখেছিল। ডান হাতটা পকেটে ঢুকিয়ে একখানা দশ টাকার নোট বের করে লোকটার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

রাস্তায় পড়ে মীনা ক্লান্ত সুরে ধীরে ধীরে বলল, কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে?

চল না।

আপনার কাছে যে আমার মুখ দেখাবার জো রইল না, সর্দারজী।

ও কথা বলছ কেন?

আমাকে যদি আর কাউকে দিয়ে সন্দেহ করত, আমি কিছু বলতাম না। কিন্তু—

থাক্, তোমাকে আর কিছু বলতে হবে না মীনা। আমি সব বুঝতে পারছি। সেদিনই অনেকটা পেরেছিলাম।

পেরেছিলেন! বিস্ময়াবিষ্ট চোখ দুটি তুলে ধরল সর্দারজীর মুখের পানে—পেরেও আপনি আমাকে ঐ লোকটার হাতে ফেলে চলে গেলেন?

সে শুধু তোমার মুখের দিকে চেয়ে, মীনা।

কিন্তু আমি যদি একটুও টের পেতাম, তাহলে কি নিজেকে অমন করে—

বাকীটা আর বলতে পারল না। কিন্তু বান্তা সিং বুঝল, লোকটা তার সম্বন্ধে যা-ই ধারণা করে থাক্, তার দেওয়া সুযোগের পুরো সুবিধা নিতে ছাড়ে নি।

ওরা গাড়ির পাশে এসে গিয়েছিল। দরজাটা খুলে ধরল বান্তা সিং, আজ আর পিছনের নয়, সামনের দরজা। এ অবস্থায় ওকে পিছনের সীটে একা ছেড়ে দেওয়া নিরাপদ মনে হল না। কী জানি, কি করে বসে। মীনা আবার সেই পুরনো প্রশ্নটাই তুলে ধরল, আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ?

ওঠো, তারপরে বলছি।

মীনা আর কোনো কথা বলল না, ভিতরে গিয়ে বসল। বসে থাকবার মত অবস্থা তখন ছিল না। সীটের পিঠে মাথা রেখে চোখ বুজে পরে রইল।

মিনিট কয়েক গিয়েই গাড়িটা থামল একটা গলির মধ্যে। বান্তা সিং আবার ওর বাহুতে হাত দিয়ে বলল, চল মীনা, আমরা এসে গেছি।

কোথায় ?

চমকে উঠে চোখ মেলে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল মীনা। কিছুই চিনতে না পেরে আবার বান্তা সিংয়ের মুখের পানে দৃষ্টি ফেরাল। সে আর কিছু বলল না। তেমনি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে ওকে গাড়ি থেকে নামাল এবং কয়েক পা এগিয়ে একটা ঘরের মধ্যে নিয়ে তুলল। মীনা যখন বিহ্বল দৃষ্টিতে চারদিকটা দেখছে, মৃদু হেসে বলল, এটা আমার বাসা, আর—, একটুখানিক থেমে আবার বলল, সে অধিকার যদি দাও, আজ থেকে তোমারও।

অ্যাঁ! যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে আঁতকে উঠল মীনা। দু-হাতে মুখ ঢেকে ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলে উঠল, না, না, সে হয় না সর্দারজী। আপনি তো আমার সব কিছু জানেন।

. জানি বলেই তো এই দাবি জানাচ্ছি।

মীনার সারা দেহ থরথর করে কাঁপছিল। বান্তা সিং তাকে ধরে বসিয়ে দিতে গেল। সে বসল না। ধীরে ধীরে খানিকটা সামলে উঠল। মুখের উপর থেকে হাত দুখানা সরিয়ে নিয়ে সিক্ত চোখ দুটি তুলে ধরল সর্দারজীর মুখের দিকে। অনেকক্ষণ ধরে দেখল। কী দেখল, সে-ই জানে। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে মাথাটা নামিয়ে দিল তার বুকের উপর।

দীর্ঘ কাহিনী একটানা শুনে যাচ্ছিলেন সত্যভূষণ। বান্তা সিং যখন থামল, তারপরেও তেমনি নিঃশব্দে বসে রইলেন।

পাশের রাস্তায় লোকজন নেই বললেই হয়। গাড়ি-চলাচলও বিরল হয়ে এসেছে। সেই দিকে চেয়ে বান্তা সিং বলল, ইস্‌, অনেক রাত হয়ে গেছে। চলুন বাবুজী, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিই।

সত্যভূষণ ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। ড্রাইভারের কাঁধে ডান হাতখানা রেখে বললেন, চল ভাই।

অভিযোগ না অভিনয় ?

ইদানীংকালে 'বন্ধ', 'গণ-অভিযান', ট্রেন-আটকানো, পরীক্ষার হল্-এ চড়াও ইত্যাদি বহুবিধ উপসর্গের সঙ্গে আর একটা জিনিসের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। তার নাম ফাংশান, সাধুভাষার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

আগেকার দিনেও কিছু কিছু ছিল। সম্প্রতি ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছে। স্কুল-কলেজ, পাড়ায় পাড়ায় ছোটখাটো ক্লাব, সর্বজনীন পূজামণ্ডপ, কল-কারখানা, অফিস, পাঠাগার থেকে আরম্ভ করে মুদীর দোকান, খাটাল, কুস্তীর আঁখড়া এবং শ্মশান পর্যন্ত বিস্তৃত তার পরিধি।

ফাংশানের জন্যে যা-যা অবশ্য প্রয়োজন তার মধ্যে পড়ছে প্যাণ্ডেল, মাইক, শতরঞ্জি, গাইয়ে-বাজিয়ে-নাচিয়ের দল, একজন হেঁড়ে-গলা 'অনুষ্ঠান পরিচালক', (যার কাজ যখন তখন প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচানো) আর সেই সঙ্গে একজন সাহিত্যিক।

এই শেষোক্ত ব্যক্তিটি আসলে অপ্রয়োজনীয়। তার কাজটাই সব চেয়ে অপ্রিয়—বক্তৃতা, অনুষ্ঠানওয়ালাদের ভাষায় 'ভাষণ', যা কেউ শোনে না এবং শুনতে চায় না। একটু দীর্ঘ হলেই শ্রোতৃমণ্ডলী দীর্ঘ হাততালি দিয়ে বন্ধ করে দেয়। তবু কী এক রহস্যময় কারণে উদ্যোক্তারা তাকে ফাংশানের একটি অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করেন এবং যেমন করে হোক একজন কাউকে ধরে এনে প্যাণ্ডেলের উপর বসিয়ে দেন, অনেকটা নৈবেদ্যের মাথায় মণ্ডার মত।

আমার মত ক্ষুদ্র লেখকেরও রেহাই নেই। বৃহৎ মহলেই অবশ্য তাঁরা আগে হানা দেন। কিন্তু তাঁরা সহজপ্রাপ্য নন। 'যাবো না' কেউ বলেন না। তাতে জনপ্রিয়তার হানি হতে পারে। বর্তমান যুগে সাহিত্যের প্রধানতম ধর্ম লোকরঞ্জন। তাই প্রায়শ স্বাস্থ্যের ওজর দিয়ে থাকেন। সেটা ঠিক মিথ্যা অজুহাত নয়। সুস্থ সাহিত্যিক ক'জন?

কেউ কেউ আগেই তারিখটা জেনে নিয়ে বলেন, ও-ও, ওদিন তো

অন্যত্র আটকা পড়ে গেছি ভাই! তা না হলে নিশ্চয় যেতাম।

প্রধানদের দুয়ারে ব্যর্থ হয়ে আয়োজকরা তখন অপ্রধানদের দ্বারস্থ হন।

প্রথম প্রথম এই দুর্ভোগটা আমাকে একটু বেশী ভুগতে হয়েছে। কারণ, আমি ছিলাম মফঃস্বলে, যেখানে চাহিদার তুলনায় যোগান অনেক কম। উদ্যোক্তাদের সামনে চয়েস (choice) বা বেছে নেওয়ার সুযোগ তেমন ছিল না। বিকল্প জোটানো মুশকিল হত।

'শরীর খারাপ' বলে যে এড়িয়ে যাবো, তারও উপায় ছিল না। সরকারী চাকরি করি। অফিসে যেতে হয়। ছোট শহরে সে খবরটি গোপন থাকে না। যে অফিস করে সে মিটিংএ যেতে পারে না, এটা কে বিশ্বাস করবে?

কত জায়গা থেকেই না ডাক আসত! এই প্রসঙ্গে দু-একটির উল্লেখ বোধহয় অবান্তর হবে না, যদিও সম্ভবত এ কথা অন্যত্র কোথাও বলে থাকবো।

একদিন দুটি ছিমছাম চেহারার যুবক এসে সবিনয়ে ঢুকলেন আমার বৈঠকখানায়। দেখেই বুঝলাম ফাংশান।

আপনাকে একটু কষ্ট দিতে এলাম স্যর।

কোত্থেকে আসছেন?

আজ্ঞে, গাঁজা ফার্ম থেকে।

গাঁজা ফার্ম! আমার চোখ কপালে উঠল। একজন বুঝিয়ে দিলেন, মাইল কয়েক দূরে গাঁজা চাষের যে সরকারী প্রতিষ্ঠান আছে, সেইখানকার কর্মী তাঁরা।

বললাম, আপনারা বোধহয় ভুল করেছেন। আমি আবগারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ নই, জেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্। তাঁর বাসাটা হল—

আজ্ঞে না স্যর, আমরা আপনার কাছেই এসেছি। আমাদের একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে আসছে রবিবার। আপনাকে তার প্রধান অতিথি হতে হবে।

ভেবে দেখলাম, ভুল আমারই, ওঁদের নয়। গাজা চাষের সঙ্গে সাহিত্যকর্মের ঘনিষ্ঠ মিল রয়ে গেছে, এ সত্যটি কে অস্বীকার করবে ?

বড় বড় সরকারী এবং সওদাগরী অফিসে নিয়মিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। তার প্রধান অঙ্গ নাটক। প্রায় সব প্রতিষ্ঠানেই নিজস্ব নাট্যগোষ্ঠী থাকে। তারা বৎসরান্তে কোনো একটা থিয়েটার হল ভাড়া নিয়ে অভিনয়ের আয়োজন করেন। তার পূর্বক্ষণে কর্মকর্তারা অন্য একটা অনুষ্ঠান করেন মঞ্চের উপর, যাকে বলা যেতে পারে একটি ছোটখাটো সভা।

সভা মাত্রেরই একজন সভাপতি এবং একজন প্রধান অতিথির প্রয়োজন। সভাপতি থাকেন ঐ ফার্ম বা অফিসের কোনো শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। প্রধান অতিথির বেলায় ডাক পড়ে কোনো সাহিত্যিকের।

এমনি এক বণিক-সংস্থার নাটুকে পাণ্ডাদের পাল্লায় পড়ে তাদের প্রাক-অভিনয় সভায় প্রধান অতিথি হয়ে যেতে হয়েছিল। ঐ সঙ্গে নাটক দেখারও নিমন্ত্রণ ছিল।

যথারীতি বক্তৃতাদির পর অডিটোরিয়ামে নেমে এসেছি। প্রধান অতিথিকে বিশিষ্ট আসনই দিয়েছেন কর্মকর্তারা। প্রথম সারিতে, হলের মাঝখানে যে প্যাসেজ যা যাতায়াতের পথ, তার একধারের সীটটি আমার। আশেপাশে জাঁকিয়ে বসেছেন অন্যান্য অতিথিরা। চেহারা, পোশাক এবং আদর আপ্যায়নের বহর দেখলেই বোঝা যায়, তাঁরা সব কোম্পানীরও প্রথম সারির লোক।

আমার ঠিক ডানদিকের আসনটি খালি। সেটা কি আমার বিশেষ সম্মানার্থে, না সাহিত্য সম্বন্ধে এইসব কাজের মানুষ কথায় ও ব্যবহারে যে কৃত্রিম আতঙ্কের নামে অবজ্ঞা দেখিয়ে থাকেন তার জন্যে, ঠিক বোঝা গেল না। যা-ই হোক, আমার সুবিধাই হল। হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করে বসলাম।

নাটক শুরু হয়ে গেছে। হল্-এর সব আলো নেভানো। কিছুক্ষণ পরে দু-তিনজন পাণ্ডাজাতীয় যুবক এক ভদ্রলোককে সঙ্গে

করে এসে সেই খালি সীট্‌টিতে বসিয়ে দিলেন। তাদের সবিনয় এবং সসম্ভ্রম ভঙ্গি দেখে সন্দেহ রইল না, ইনি বেশ উপর স্তরের ব্যক্তি। এধারে ওধারে যাঁরা বসেছিলেন, তাঁরাও একটু নড়েচড়ে বসলেন। হয়তো এঁরই জন্য আসনটি 'রিজার্ভ' ছিল।

স্টেজ থেকে ঠিকরে আসা ক্ষীণ আলোয় ভদ্রলোককে স্পষ্ট দেখা গেল না। উনি আমার দিকে একনজর তাকিয়ে নাটকে মনোনিবেশ করলেন।

প্রথম অঙ্কের শেষে আলো জ্বলে উঠতেই আমিও উঠে পড়লাম। বেরোবার মুখে জেনারেল সেক্রেটারী এগিয়ে এলেন, এখনি যাবেন স্যর? আরেকটা অ্যাকৃট্ দেখে যান না।

রাত হয়ে যাবে। শরীরটা তেমন ভালো নেই।

ও, আচ্ছা, তাহলে আর আটকাবো না। কেমন লাগল স্যর? সবই তো আনাড়ির দল।—কথাটা বিনয়চ্ছলে বললেও সত্য। অতি অখাদ্য অভিনয়। কিন্তু সেকথা তো আর বলা যায় না।

বললাম, মোটের ওপর বেশ করছে। ভালোই লাগছিল।

আপনার ট্যাক্সি আনতে পাঠাচ্ছি। ততক্ষণে দয়া করে একটু এদিকটায়—

ওদিকে আবার কেন?

কিছু না, শুধু এক কাপ চা। সেরকম আদর-আপ্যায়ন তো—

কথাটা অসমাপ্ত রেখেই ছুটে গেলেন ওদিকে। আমার পাশের সেই ভদ্রলোকটিও উঠে পড়েছিলেন।

চলে যাচ্ছেন স্যর? অনেকটা যেন হতাশার সুর জেনারেল সেক্রেটারীর।

না, না, আমি যাচ্ছি না। কী রকম করলেন-টরলেন আপনারা, আরেকটু দেখে যাই।

সেক্রেটারী বিগলিত সুরে হেঁ-হেঁ করতে লাগলেন। তারপর যেন হঠাৎ মনে পড়েছে, এমনি ভাবে বললেন, ও, আপনার সঙ্গে

আমাদের চীফ্ গেস্টের আলাপ হয়নি!

না, কখন আর হল? অফিস থেকে বেরোতেই যে অনেক দেরি করে ফেললাম।

আমার দিকে যখন এগিয়ে আসছেন, সে[illegible] আমাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

আমার চেয়ে অনেকখানি লম্বা। আমি মাথা তুলে একনজরে দেখে নিলাম। স্মিতমুখে নমস্কার বিনিময় হল। তিনি তীক্ষ্মদৃষ্টিতে আমার দিকে মিনিটখানেক তাকিয়ে থেকে বলে উঠলেন, কী আশ্চর্য, আপনি! আপনার দু-একখানা বই পড়ে অবিশ্যি সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু সাহিত্য-টাহিত্য করেন, একথা তো তখন শুনিনি। তা, এরকম একটা বিদ্‌ঘুটে নাম নিলেন কেন বলুন তো?

আমি কোনো জবাব দিতে পারছি না। মনের মধ্যে হাতড়ে বেড়াচ্ছি কোথায় দেখেছি এঁকে, কিছুতেই চিনতে পারছি না।

একজন কর্মী এসে সেক্রেটারীকে বলল, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। কথাটা কানে যেতেই ম্যানেজিং ডিরেকটর বলে উঠলেন, ও, আচ্ছা, আপনারা ওঁকে নিয়ে যান। আমি আবার হল্-এ ঢুকি।

আপনাকেও একটু আসতে হবে স্যর—হাতে হাত ঘষতে ঘষতে বললেন জেনারেল সেক্রেটারী।

আমাকে? বেশ, চলুন। ওঁর সঙ্গে একটু আলাপ করা যাক। উনি অবিশ্যি আমাকে চিনতে পারছেন না। চেনবার কথাও নয়।

আমি হেসে বললাম, বুড়ো হয়েছি, মেমারি ফেল করছে। একটু ধরিয়ে দিতে হবে।

কোথায় বুড়ো হয়েছেন? পনেরো বছর আগে যেমন ছিলেন, ঠিক তেমনি আছেন আপনি। শুধু মাথার সামনের দিকটা কিছু সাদা দেখাচ্ছে।

স্টেজে ঢুকবার পথ। তখন বাঁদিকে গিয়েছিলাম মঞ্চের দিকে। এবার ডাইনে একটা ছোট ঘরে নিয়ে বসাল। টেবিলের দুধারে মুখোমুখি বসলাম আমরা। চা এল, তার সঙ্গে খাবারের ডিশ।

মাথা নেড়ে প্রত্যাখ্যান করে শুধু চাএর পেয়ালাটা টেনে নিলাম ভদ্রলোক তাঁর প্লেট থেকে একটি সিঙ্গাড়া তুলে নিয়ে বললেন, এটা তো তখন ছিল না। খাওয়া সম্বন্ধে আপনাকে কোনো বাছ-বিচার করতে দেখিনি। অবিশ্যি সে সব খাবার—

হঠাৎ থেমে গেলেন। মুখের উপর একটি ম্লান ছায়া এসে পড়ল। হয়তো কোনো দূরাগত স্মৃতির ছায়া, এবং সে স্মৃতি প্রীতিকর নয়। তখনি আবার মিলিয়ে গেল ছায়াটা। আর কেউ বোধহয় লক্ষ্য করল না। শুধু আমার চোখে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আমার স্মৃতির পরদাটাও যেন একটু দুলে উঠল।

চোখে-মুখে আগেকার সেই সহজ ভাবটা ফিরিয়ে এনে ম্যানেজিং ডিরেকটর বললেন, বিপিন দাসকে মনে পড়ে?

আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম, সঞ্জয়বাবু!

ভদ্রলোক হেসে ফেললেন। তারপর বললেন, না চিনলেও কিছুমাত্র আশ্চর্য হতাম না। আপনি তো বিপিন দাসকেই দেখেছেন। সেইজন্যেই তার নাম করছিলাম।

কিন্তু আপনি কোত্থেকে, কেমন করে…

সে এক ইতিহাস। বলতে সময় লাগবে। আজ আর হয় না। এদিকে বোধহয়…, সেকেণ্ড অ্যাকট্ শুরু হয়েছে নাকি?

জেনারেল সেক্রেটারীর দিকে তাকালেন। তিনি বললেন, আজ্ঞে স্যর।

ওঁর গাড়ি এসে গ্যাছে?

এবার জবাব দিল অন্য একটি কর্মী, এসেছে স্যর।

আচ্ছা, তাহলে উঠি। আপনি আছেন কোথায়?

ঠিকানা বললাম। সঞ্জয়বাবু একজনকে বললেন, লিখে নাও তো।

লেখা আছে, স্যর।

ও, তা তো বটেই। আপনার কাছে ওদের যেতে হয়েছিল।

উঠে পড়ে নমস্কার করে বললেন, যাবো একদিন। কোন্ সময়

গেলে আপনাকে ডিস্টার্ব করা হবে না বলুন তো ?

বললাম, আমাকে ডিস্টার্ব করা আপনার সাধ্য নয়, যখনই যান না কেন। তার চেয়ে বলুন, আপনার কখন সুবিধে ?

সন্ধ্যার পর।

খুব ভালো সময়। শুধু আগে একটা টেলিফোন।

সেটা নিজের স্বার্থেই করবো। তা না হলে আপনি কোথায় প্রধান অতিথি হয়ে বসে থাকবেন, আর আমাকে দরজা থেকে ফিরে আসতে হবে।

॥ দুই ॥

আমিও বিপিন দাসকে নিয়েই শুরু করি।

কবিরাজ মশায়ের বৈঠকখানায় সেই সন্ধ্যাটি চোখের উপর ভাসছে। এতগুলো বছরের ব্যবধানেও এতটুকু ম্লান হয়নি। আমার প্রথম দিকে লেখা কোনো একটা বইএ তার উল্লেখ করেছি। কিছুটা পুনরুক্তি করতে হচ্ছে। সঞ্জয় চ্যাটার্জির কথা বলতে গেলে না করে উপায় নেই। ওখান থেকেই তো আমার সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা।

চিটাগঙ্‌এ পাহাড় যেমন আছে, তেমনি সমুদ্রও আছে। খুব একটা দুর্দন্ত শীত কখনো পড়ে না। সেবার কিন্তু বেশ জমাট ঠাণ্ডা পড়েছিল। সান্ধ্য আড্ডাটিও বেশ জমে উঠেছিল। কিছুক্ষণ আগেই দ্বিতীয় পর্ব চা শেষ করেছি আমরা। কবিরাজ মশায়ের শুধু তরলেই চলে যায়, আমি আবার একটা কঠিন অর্থাৎ যাকে বলে সলিড (solid) অনুপান না হলে চাএর রস পুরোপুরি উপভোগ করতে পারি না। মিনু তার ব্যবস্থা করেছিল। পুরো একপ্লেট গরম গরম বেগুনি। তার সঙ্গে রোজকার মত কবিরাজ মশায়ের আলমারি থেকে দুটি বড় বড় কালো বড়িও যথারীতি হাজির ছিল।

এই পদার্থটি যেদিন প্রথম তিনি নিজে হাতে বের করে দিয়েছিলেন, আমি চিনতে পারিনি। ভ্রূ কুঁচকে বলেছিলাম, কালোজাম নাকি?

ঐ মিষ্টিটা আমার কোনোদিন পছন্দ নয়।

কবিরাজমশাই হেসে ফেললেন, ঠকলেন তো? অনেকেই ঠকে।

মিনু মুচকি মুচকি হাসছিল। কবিরাজ বললেন, আরেকটু ভালো করে দেখুন।

বাবার যেমন কাণ্ড! ছদ্ম-ধমকের সুরে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল মিনু, উনি কেমন করে জানবেন? চাএর সঙ্গে এসব আবার কেউ খায় নাকি?

চাএর সঙ্গে কেন, সব সময়েই খাওয়া চলে। এর মত জিনিস আছে? বলবীর্যকান্তিবর্ধক, তেমনি সুস্বাদু।— আচ্ছা, একটু খেয়ে দেখুন।

খেয়ে বুঝলাম চ্যবনপ্রাশ। আমার বড়দা খেতেন। ছেলেবেলায় আমারও ভীষণ লোভ ছিল এই বস্তুটির উপর। মাঝে মাঝে তাঁর শিশি থেকে চুরি করে খেয়েছি। কিন্তু এর তুলনায় সে কিছু নয়। এর স্বাদ সত্যিই অপূর্ব।

কবিরাজ নিজের তত্ত্বাবধানে যত্ন করে তৈরী করেন।

যখন খাচ্ছি, তিনি বেশ খানিকটা গর্বের সঙ্গে মাথা দোলাতে দোলাতে বলেছিলেন, কী রকম লাগছে?

চমৎকার। তাছাড়া চাএর সঙ্গে চ্যবনপ্রাশ, বেশ একটা অনুপ্রাশ আছে এর মধ্যে।

কবিরাজ হেসে উঠেছিলেন, তাঁর সেই ছাদ-ফাটানো হাসি।

এদিনও অমনি একটা কী কথায় হাসিটা ফেটে পড়বার আগে হঠাৎ থেমে গেল। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে দরজার দিকে তাকালাম। একজন ইউনিফর্ম পরা কোমরে রিভলভার আঁটা পুলিস অফিসার। সঙ্গে কয়েকজন কনস্টেবল।

'আর্মারী রেড্'এর বছর দশেক পরের কথা। দীর্ঘদিন ধরে যে পুরোপুরি পুলিসীরাজ চলেছিল চাটগাঁয়, সেটা গেছে, কিন্তু তার স্মৃতি

যায়নি, যাবার কথাও নয়। বিশেষ করে 'আসানুল্লা খুন'-এর পরবর্তী দিনগুলো, যার আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে দেশীয় পুলিসের চরমতম কলঙ্কের কালি। তাদের কীর্তিগাথা তখনো লোকের মনে তাজা ঘা-এর মত দগদগ করছে।

কবিরাজ মশায়ের কপালময় বলিরেখা ঘন হয়ে উঠল। জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন। অফিসারটি কাষ্ঠহাসি হেসে বললেন, আপনাদের কথাবার্তায় বাধা দিলাম। সরি। আপনার চাকরটিকে একবার ডেকে পাঠান তো?

চাকর! মানে বিপিন?? সে আবার কী করল?

দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করবো।

কবিরাজ ভিতরের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে ডাকলেন, মিনু আছিস?

যাই বাবা।

আসতে হবে না। বিপিনকে একবার পাঠিয়ে দে।

বিপিন তো বাড়ি নেই।

কোথায় গেল?

তার মার অসুখ। বিকেলের গাড়িতে দেশে চলে গেছে।

ও, তাই সন্ধ্যে থেকে দেখছি না।

দারোগা মিনুর কথা শুনতে পেয়েছিলেন। মৃদু হেসে বললেন, আমাদের খবর কিন্তু অন্য রকম। আপনার বাড়িটা সার্চ করতে চাই। এই নিন ওয়ারেণ্ট।

আমার দিকে ফিরে বললেন. আপনি কি এখানেই থাকেন?

কবিরাজ আমার পরিচয় দিলেন, এখানকার জেলার এসেছেন।

নতুন দারোগা সম্ভ্রমের সুরে বললেন, ও, আমি জানতাম না। আপনাকে একটু কষ্ট দেবো স্যর। আপনার মত একজন উইট্‌নেস থাকলে আমাদের এবং ওঁর দুদিক থেকেই খুব সুবিধে। দয়া করে যদি কিছুক্ষণ বসে যান—

থেকে যেতে হল।

নীচে খানতিনেক ঘর। একটা তো বৈঠকখানা। বাকী দুটোতে কিছু জিনিসপত্র ছিল, বেশীর ভাগ কবিরাজী মাল-মশলা। এছাড়া রান্নাঘর, বাথরুম। সবটা ঘুরে ঘুরে দেখে আমরা উপরে উঠে গেলাম। এবার চোখে পড়ল বাড়ির চারদিকে ঘন পুলিসের বেড়া।

উপরেও তিনটি ঘর। প্রথমটিতে থাকেন কবিরাজ, মাঝখানের ঘরটি ওঁর ছেলের। একমাত্র ছেলে: বছর কয়েক হল, পশ্চিম বাংলার কোনো এক গ্রামে অন্তরীণ (interned)। তখনকার দিনে চাটগাঁর মধ্যবিত্ত হিন্দুর ঘরে যা অতি সাধারণ ঘটনা। কোণের ঘরে থাকে মিনু, মিনতি সেন কবিরাজ মশায়ের যুবতী কন্যা।

সে দরজার ভিতরের দিকে কি একটা করছিল। এপাশের দুটো ঘর দেখবার পর পুলিস অফিসার সেই দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ওকে একটু সরে যেতে বলুন।

মিনু নিজের কানেই শুনতে পেল। তবু কবিরাজমশাই পুলিস-নির্দেশের পুনরুক্তি করে বললেন, মিনু, একটু বাইরে এসো, মা।

কেন বাবা! প্রশ্ন নয়, বিস্ময়ের সুর।

ওরা বিপিনকে খুঁজতে এসেছেন।

আমার ঘরে। মিনুর চোখ দুটো থেকে যেন বিদ্যুৎ-শিখা বেরিয়ে এল।

উত্তর দিলেন দারোগাবাবু, আজ্ঞে, আমরা গোটা বাড়িটাই দেখতে চাই। ওয়ারেণ্টে তাই আছে।

আমাদেরও মানসম্ভ্রম বলে একটা কিছু আছে। রুক্ষ কঠিন সুরে দারোগার দিকে না চেয়ে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল মিনু, যাকে বলে তীক্ষ্ণ রিটর্ট্ (retort)।

দারোগা বিনীতভাবেই বললেন, আপনাদের মানসম্ভ্রমে আঘাত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা শুধু ঘরের ভিতরটা একবার দেখতে চাই। সেইজন্যেই আপনাকে একটু বাইরে আসতে বলছি।

না। সহজ গম্ভীর সুরে ঐ একটিমাত্র কথা উচ্চারণ করল মিনু, এবং দরজার ঠিক সামনে এসে দাঁড়াল।

পুলিসী মেজাজ আর কতক্ষণ ঠিক থাকে, বিশেষ করে তখনকার দিনে? দারোগার তীক্ষ্ণ কণ্ঠ শোনা গেল, আপনার মেয়েকে দরজা থেকে সরে যেতে বলুন, কবরেজ মশাই। তা না হলে আমাদেরই সরাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

বেশ, তাই করুন।

বলে, এবার পূর্ণদৃষ্টিতে দারোগার দিকে তাকাল মিনু। সহজ সুর, কোথাও কোনো উত্তেজনা নেই।

আমার মনে হল, এতদিন যে মিনুকে আমি দেখে এসেছি, এ সে নয়। তার মুখে যে স্নিগ্ধ, কোমল বিনম্র ভাবটি সর্বক্ষণ লেগে থাকত, তার লেশমাত্র খুঁজে পেলাম না। এ মুখ ইস্পাতের মত কঠিন, কঠোর।

দারোগার চোখ দুটো জ্বলছিল। লক্ষ্য করলাম, তার ডানহাতের মুঠোটা হঠাৎ শক্ত হয়ে উঠল। কবিরাজমশাই হাত তুলে মেয়েকে কি একটা বলতে গেলেন। কথাগুলো স্পষ্ট হল না। সেই মুহূর্তে দারোগাও এক পা এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে। আমি তাড়াতাড়ি তার সামনে এসে ধীরভাবে বললাম, 'দাঁড়ান'। তিনি থেমে গেলেন। মিনুর আরেকটু কাছে সরে গিয়ে বললাম, তুমি বোধ হয় ভুল করছ মিনু। পুলিস যখন বাড়ি সার্চ করতে এসেছে, সঙ্গে ওয়ারেণ্ট আছে, তখন তোমার বাধা না দেওয়াই উচিত।

নিশ্চয়ই, সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন করলেন কবিরাজমশাই, তুই এদিকে চলে আয়, করুক ওরা যা খুশি।

মিনু একবার আমার, একবার তার বাবার মুখের দিকে তাকাল। নিরুপায়, অসহায় দৃষ্টি। নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে অসহিষ্ণুভাবে মাথা নাড়ল দু-একবার। তারপর যেন ছুটে চলে গেল সেখান থেকে।

দারোগাবাবু সদলবলে ঘরে ঢুকলেন। এদিক ওদিক তাকালেন।

তারপর নীচু হয়ে খাটের নীচে দৃষ্টি ফেলে কনস্টেবলদের হুকুম করলেন, উঁহা পর কোন্ চীজ হ্যায়, নিকালো। দো আদমি আও।

দুজন লোক একসঙ্গে নীচে ঢুকে একটা কম্বলের বাণ্ডিল টেনে নিয়ে এল। তার ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল বিপিন।

মুহূর্ত-মধ্যে দারোগার খাপখোলা রিভলবারের মুখটা তার দিকে একবার উদ্যত হয়েই সঙ্গে সঙ্গে নেমে এল। না, পুলিস যা আশঙ্কা করছিল, তা নয়। লোকটার হাত খালি।

সবিস্ময়ে লক্ষ্য, করলাম রিভলবারের সামনেও বিপিনের মুখে বিন্দুমাত্র ভয়ের চিহ্ন দেখা গেল না। শুধু একবার মুচকে হাসল দারোগার দিকে চেয়ে।

পরদিন দুজন বন্দুকধারী পুলিসের পাহারায় বিপিন আমার জেলে এসে গেল। ওয়ারেণ্টে নাম দেখলাম সঞ্জয় চ্যাটার্জি -- ওরফে বিপিন, ওরফে ছলমন্দী গাজী, ওরফে মহাদেব শাস্ত্রী ইত্যাদি। চার্জ অনেকগুলো—আগ্নেয়াস্ত্রসহ ডাকাতি, খুন, খুনের চেষ্টা, পুলিসের হেফাজত থেকে পালানো, বে-আইনী ভাবে আগ্নেয়াস্ত্র রাখা। পিনাল কোড্এর এতগুলো বড় বড় মারাত্মক ধারা যার উপর শুঁড় তুলে দাঁড়িয়ে, তার চেহারা দেখলে হাসি পায়। পরনে হাঁটু পর্যন্ত ঝুলওয়ালা লালপেড়ে ময়লা ধুতি, তার উপর ফতুয়া। সামনে পিছনে সমান করে চুলছাঁটা, গলায় তুলসীর মালা। চোখ দুটোতে কেমন একটা অসহায় সদা-শঙ্কিত দৃষ্টি। মুখে বোকা-বোকা ভাব। একেবারে গবেট-মার্কা বাড়ির চাকর।

পুলিসের মতে রাজনৈতিক আসামী, পলিটিক্যাল অ্যাকিউজড্, তার উপরে ড্যাঞ্জারাস্। সুতরাং সেলে রাখতে হয়েছে। সেখানে সে 'জমাদার সাহেব' থেকে 'মেট সাহেব' পর্যন্ত সবাইকে সেলাম ঠুকছে, সবার সামনে জোড়-হাত। আমার চীফ হেডওয়ার্ডার তো হেসেই খুন, —এ কী রকম স্বদেশী আসামী ? পুলিসের তো কাজকম্ম কিছু নেই।

দিল চালান দিয়ে। এই লোক বোমা বানায়, পিস্তল চালায়! হুঁঃ!

পুলিসের এক বড়কর্তা একদিন বললেন আমাকে, আপনার এই প্রিজনারটি একজন ছোটখাটো শ্রীকৃষ্ণবিশেষ। শ্রীকৃষ্ণের শতনাম ছিল, এঁর অন্তত গোটাকুড়ি তো আছেই। চেহারাতেও বহুরূপী। এই তো কিছুদিন আগে কোলকাতায় মির্জাপুরের এক দর্জির দোকানে শার্ট-ট্রাউজার কাটত। ভালো কাটার (cutter)। পুলিস খোঁজ পেয়েছে আঁচ পেয়েই চলে গেল নারায়ণগঞ্জ। দেওয়ানী কোর্টের সামনে বটগাছতলায় জ্যোতিষী সেজে বসল। হাত দেখে যাকে যা বলে তাই নাকি ফলে যায়! গোয়েন্দা পুলিস টের পেতেই রাতারাতি উধাও। তারপর খবর পাওয়া গেল, কবিরাজ সদানন্দ সেনের বাড়িতে চাকর হয়ে ঢুকেছে। উনি কিচ্ছু জানেন না! জানে ওঁর ইণ্টারনী ছেলে আর ঐ মেয়ে। দাদার চিঠি নিয়ে এসে চাকরি পেল বোনের কাছে। এতদিন থাকবার কথা নয়। আগেই সরে পড়ত। একটু জড়িয়ে পড়েছে মন হয়। মানে, বুঝতেই তো পারছেন, মেয়েটা তো দেখতে খাসা। অল্প বয়স। আমরাও ঐজন্যে তাড়াহুড়ো করিনি। আরেকটু দানা বাঁধুক। অনেক দেখেছি তো। প্রেম-টেমের ব্যাপার শুরু হলেই দেশ-প্রেম ফিকে হয়ে আসে। এই মিনতি সেনরাই হচ্ছে এ রোগের আসল অ্যান্‌টিডোট। আপনার ঐ মিনু আমাদের অনেক উপকার করেছে। সেই জন্যেই তো ওকে আমরা অ্যারেস্ট পর্যন্ত করলাম না। আপনারা যা-ই বলুন, কৃতজ্ঞতা-বোধটা পুলিসের মধ্যেও আছে।

বলে, হো-হো করে হেসে উঠলেন।

মিনুকে অ্যারেস্ট না করবার আসল হেতুটা কদিন পরেই জানা গেল। ঐ কর্তাব্যক্তিটিই হন্তদন্ত হয়ে এলেন আমার অফিসে। ভারী খুশি। এদিক ওদিক একবার দেখে নিয়ে অন্তরঙ্গ সুরে বললেন, যা আন্দাজ করেছিলাম ঠিক তাই। চিঠিপত্তর শুরু হয়ে গেছে। মানে, এখনো ওয়ান-ওয়ে ট্রাফিক। আপনার পাঁচিলের মধ্যে ঢুকছে, এখান

থেকে বেরুচ্ছে না। অন্তত আমাদের যা খবর। দূতীর কাজটা আপনার সিপাই বাবাজীরাই করছেন।

আমি চমকে উঠলাম, বলেন কি! তাহলে তো—

না, না, এখন কিছু করবেন না। আসুক না। ওর মধ্যে কিছু নেই। কতগুলো অসার প্রেমপত্তর। আমাদের কোনো কাজে লাগবে না। শ্রীমতীকে নিয়ে আমাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। শ্রীমান কি লেখেন তারই জন্যে অপেক্ষা করছি। খোঁজ পেলেই আমাদের কাজ শুরু হবে। ততদিন আপনিও চুপ করে থাকুন।

আমি চুপ করে থাকতে পারলাম না! মিনুর কথা ভাবলাম। এ কী করছে মেয়েটা! একথা অবশ্য জানি, মেয়েরা যখন ঝাঁপ দেয়, সামনে পিছনে চায় না, ঢেউয়ের দিকে তাকায় না, কোথায় গিয়ে উঠবে, কিংবা একেবারেই উঠবে কিনা, তাও একবার ভেবে দেখে না। কিন্তু আমি তো সবই জলের মত দেখতে পাচ্ছি। কার দিকে ছুটে চলেছে সে! এদের জীবন কি সে জানো না? তাছাড়া পুলিস ওৎ পেতে বসে আছে।

মিনুকে কিছু বলতে কেমন সঙ্কোচ হল। কী ভাববে মেয়েটা! মায়াও হল। তার চেয়ে সঞ্জয়কে বলা সহজ। কিন্তু সে কি বিপিন দাসের খোলস ছেড়ে ধরা দেবে আমার সামনে?

একদিন দুপুরবেলা অফিসে যখন কেউ নেই ডেকে পাঠালাম সঞ্জয়কে। যে সিপাই সঙ্গে করে এনেছিল, তাকে বিদায় করে দিয়ে সোজাসুজি প্রশ্ন করলাম, এসব কী হচ্ছে সঞ্জয়বাবু?

বিপিন দাস হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রইল। চোখে সেই ফ্যালফ্যাল দৃষ্টি। বলল, আজ্ঞে হুজুর,...

ওসব ঢঙ ছেড়ে আসল কথায় আসুন। এ ছেলেখেলা নয়, একটি অল্পবয়সী কুমারী মেয়ের জীবন নিয়ে খেলা। আপনি তো নিজের ভবিষ্যৎ ভালো করেই জানেন। তবে কেন জড়িয়ে রাখছেন ঐ সরল মেয়েটাকে?

·বিপিন দাস মাথা নীচু করল। মিনিট খানেক পরে যখন মুখ তুলে তাকাল স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কপাল থেকে চিবুকের বাঁক পর্যন্ত প্রতিটি রেখা বদলে গেছে। লোকটা কি ম্যাজিক জানে! গলার স্বরেও যে কোনো মানুষ এমন আশ্চর্য পরিবর্তন আনতে পারে, ধারণা করতে পারিনি। কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি আজ দেবো না মিস্টার চৌধুরী, কদিন পরে দেবো। এখন শুধু এইটুকু জেনে রাখুন, ওর যাতে আর কোনো লাঞ্ছনা বা বিপদ না ঘটে সে খেয়াল আমার আছে। আমার দিক থেকে পুলিস তার কোনো সুযোগ পাবে না।

সঞ্জয়ের মামলা হবে কানপুরে। বড় কেস্‌গুলো উত্তর প্রদেশের। এখানকার পুলিস তাকে আটকে রেখেছিল, ওদের ভাষায় ফারদার ইনভেস্টিগেশন (for further investigation), অর্থাৎ সোজা কথায়, সেই কর্তাটি যা বলেছিলেন, মিনুকে জড়াবার জন্যে। সে আশা সফল হবার আগেই কানপুর থেকে জোর তাগিদ এসে গেল।

যেদিন তাকে চালান দেওয়া হবে তার আগের দিন বিকাল বেলা সঞ্জয় এল আমার সঙ্গে দেখা করতে। খবর আগেই পাঠিয়েছিল এবং আমি তার জন্যে তৈরী ছিলাম। এসে বলল, আপনার কাছে সাদা খাম আছে?

আছে।

খামটা নিয়ে তার মধ্যে একখানা ভাঁজকরা কাগজ ভরে উপরে লিখল শ্রীমতী মিনতি সেন। আমার হাতে দিয়ে মৃদু হেসে বলল, আপনার প্রশ্নের উত্তর।

আমিও হেসে বললাম, কী রকম? প্রশ্ন করলাম আমি, আর তার উত্তর পাবে শ্রীমতী মিনতি সেন?

আপনি পড়ে তাকে দেবেন।

আমি পরের চিঠি পড়ি না।

তা বলতে পারেন না। পরের চিঠি পড়াই তো আপনাদের

পবিত্র কর্তব্য, Sacred duty. শুধু পড়া নয় বেপরোয়া কাঁচি চালানো কিংবা একেবারে গাপ করে দেওয়া।

সঞ্জয় মিথ্যা বলেনি। সেন্সর না করে একটি লাইনও জেলের বাইরে যেতে দেওয়া হয় না।

কিন্তু ঐ চিঠিখানা আমি পড়িনি। খামটা এঁটে সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা মিনুর হাতে নিয়ে দিলাম। সে কিছুই জানতে চাইল না, একবার চোখ বুলিয়েই ব্লাউজের নীচে রাখল। পলকের জন্যে, বোধ হয় তার অজান্তে মুখের উপর একটি লালাচ আভা ফুটে উঠল। তারপরেই লক্ষ্য করলাম চোখ দুটো কেমন করুণ হয়ে উঠেছে। তাড়াতাড়ি ভিতরে চলে গেল।

কবিরাজমশাই ছিলেন না। উঠবার উদ্যোগ করে বললাম, আমি তাহলে চলি মিনু। পরে আসবো।

না, না, আপনি বসুন, কাকাবাবু, ভিতর থেকেই সাড়া দিল মিনু, আমি আপনার চা নিয়ে আসছি। বাবাও এখ্‌নি এসে পড়বেন।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ফিরল। হাতে সেই চিঠি। টেবিলের উপর রেখে দিতে দিতে বলল অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি আপনাকে। আচ্ছা, এটা ততক্ষণ পড়ুন। আমি চায়ের জল বসিয়েছি। এখ্‌নি হয়ে যাবে।

আমি পড়বো কী? আমার কাজ তো শুধু বয়ে এনে দেওয়া।

তা কেন? আপনাকেও পড়ে দেখতে বলেছেন।

গোটা চিঠিখানা আজ আর মনে নেই। শেষের কয়েকটা লাইন ভুলতে পারিনি, বোধ হয় কোনো দিনই পারবো না—

"…তোমায় তো বলেছি, মিনু। নেবো বললেই কি সব জিনিস নেওয়া যায়? তার জন্যে সাধনা চাই। সে সাধনা আমি কোনোদিন করিনি। তাই, যে কথা বার বার বলেছি' যাবার আগে আর একবার বলে যাই—তুমি যা অকাতরে দিয়েছ তাকে গ্রহণ করবার অধিকার আমার নেই, তার মর্যাদা দেবার যোগ্যতাও আমি অর্জন করিনি।

যা আমার প্রাপ্য নয়, অনায়াসে পেলাম বলেই তার উপর লোভ করা চলে না। এইখানেই তার শেষ হোক, এই কামনা জানিয়ে গেলাম।

কাল আমি যাচ্ছি। হয়তো আর কোন দিন আমাদের দেখা হবে না।"

চিঠি পড়া শেষ হল। মিনুর দেখা নেই। কবিরাজমশায়ও বোধ হয় দূরে কোথাও গিয়ে পড়েছিলেন। উঠতে যাবো, কিন্তু মিনুকে না বলে এবং চিঠিখানা না দিয়ে যাই কেমন করে ? পাশের ঘরের ভেজানো দরজাটা একটু ঠেলে দেখছিলাম ঝি-চাকর কাউকে পাওয়া যায় কিনা।

যে দৃশ্যটি চোখে পড়ল আজও চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। কোণের দিকে স্টোভের উপরে কেটলি চড়ানো। অনেকক্ষণ থেকেই তার শব্দ পাচ্ছিলাম। জলফুটে যাচ্ছে। ওদিকের দেয়ালে একটি ছোট টেবিল। পাশের চেয়ারটিতে বসে মাথাটা টেবিলের উপর লুটিয়ে দিয়ে পড়ে আছে একটি মেয়ে। একরাশ এলোচুল ছড়িয়ে গেছে চারদিকে। উচ্ছ্বাসিত কান্নার বেগে দেহখানা দুলে দুলে উঠছে।

নিঃশব্দে বেরিয়ে চলে এলাম।

॥ তিন ॥

সঞ্জয় এল দিন দশেক পরে। বসবার ঘর থেকে তাকে নিয়ে গেলাম আমার লিখবার ঘরে। একান্তে নিরালা, পাশেই প্রসস্ত খোলা ছাদ। সঞ্জয় চারদিকে তাকিয়ে বলল, বাঃ, আপনার ঘরখানি তো চমৎকার। তেমনি পরিবেশ। এখানে কিছুদিন থাকলে আমার মত লোকও বোধ হয় সাহিত্য করতে শুরু করবে।

বললাম, সেটা তেমন তাজ্জব কিছু হবে না। আপনি যা

করছেন যেখান থেকে যেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন নিজের চোখে না দেখলে কখনো বিশ্বাস করতাম না। কোথায় ফাঁসিতে ঝুলবেন, তা না একলাফে একেবারে ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ফাঁসিতে ঝোলাতে চেষ্টা ওরা কম করেনি। শেষ পর্যন্ত কোন্ ফাঁকে কেমন করে যেন বেরিয়ে এলাম। তবে জেলের ঘানি টানতে হয়েছে অনেক দিন। স্বাধীনতার পর নতুন কত্তারা দয়া করে ছেড়ে দিলেন, তাই। তা না হলে আজও সেই নৈনী জেলে পচতে হত।

ছাড়া পেয়েই বুঝি চাকরিতে ঢুকলেন?

কোথায়। চাকরি কি এতো সোজা নাকি? আর সে বিদ্যেই বা কই? যেখানে ঢুকতে কোনো বিদ্যে বা অভিজ্ঞতা কিছুই লাগে না, শুধু জেল খাটলেই চলে, সেইখানে ঢুকলাম। ঢুকলাম বলা ঠিক হবে না। ইচ্ছে করে যাইনি। হঠাৎ গিয়ে পড়লাম, যাকে বলে ঘটনা-চক্রে। কোথায় বলুন তো?

পলিটিকস্?

ঠিক ধরেছেন।

ঘটনাচক্র কেন বলছেন? ঐটাই তো আপনাদের স্বাভাবিক পথ, যাকে বলে নরম্যাল কোর্স। আন্দামানে যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও তো প্রায় সকলেই ঐ পথ ধরেছেন, রস পাচ্ছেন নিশ্চই। না হলে টিকে থাকতেন না।

কি জানি, আমি কিন্তু রস পেলাম না। একসঙ্গে যারা ছিলাম, দেখলাম সবাই ভোল বদলে ফেলেছে—'অ্যাদ্দিন তো মাঠে, জঙ্গলে, পাহাড়ে তাড়া খেয়ে ফিরলাম। এবার একটু কাজ করা যাক।' কাজ কী বুঝলেন তো? পাওয়ার। ক্ষমতা চাই। তারপর যা-হয়ে থাকে। শুরু হল ঠোকাঠুকি। প্রকাশ্যে নয়। তাহলে লোকে বলবে কি? এতবড় স্যাক্রিফাইস রয়েছে পেছনে। তলায় তলায় কে কাকে ল্যাঙ মেরে এগিয়ে যেতে পারে। আমাদের দলের কেউ কেউ মন্ত্রী-উপমন্ত্রীর গদিতে গিয়ে উঠল। কয়েকজন রইল

অপোজিশনে। সেখান থেকে যতটা সুবিধে আদায় করে নেওয়া যায়। ইচ্ছা করলে আমিও হয় এদিকে, নয় ওদিকে একটা কেষ্টবিষ্টু হয়ে বসতে পারতাম। কিন্তু ভালো লাগল না। বেরিয়ে এলাম।

ইলেকশান-টিলেকশানে দাঁড়াননি ?

না, তদ্দুর আর যাইনি। পার্টি নমিনেশন পেতে হলে যে কাণ্ড করতে হয়, তই দেখেই ঘেন্না ধরে গেল।

তারপর ?

তারপর যা ঘটল, অঘটন ছাড়া তাকে আর কিছু বলা চলে না। কিছু মনে করবেন না, এ হেন ব্যাপার শুধু আপনাদের সাহিত্যেই সম্ভব। তাও বোধহয় নয়। ঘটতে পারে এক সিনেমায়।

আমি খুশী হয়ে বললাম, তাহলেই দেখুন, কথায় কথায় একদল লোক যে আমাদের কল্পনা-বিলাসী বলে দুর্নাম দেয়—

তাদের অভিজ্ঞতার বহর অতি ছোট বলেই দেয়। আসলে, জীবনে এমন অনেক কিছু ঘটে, আপনাদের কল্পনা যার নাগাল পায় না।

চা এসে গিয়েছিল। সঙ্গে কিছু হালকা ধরনের খাবার ছিল। যাকে বলে স্ন্যাকস্। তার মধ্যে একটি গোলাকৃতি পদার্থ ছিল। সেদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে দেখল সঞ্জয়।

হাসি মুখে বলল, ওটা কি বলুন তো ?

বোধ হয় সরের নাড়ু।

দেখতে অনেকটা কবরেজমশায়ের চ্যবনপ্রাশের মত। তাই নয় ? তবে সেগুলো ছিল কালো।

কবরেজমশায়ের খবর কিছু জানেন ?

তিনি মারা গেছেন শুনেছি। ওখানে থাকতেই।

তারপর স্বভাবতই যে প্রশ্নটি আমার মনের মধ্যে মাথা তুলে উঠল তাকে সঙ্গে সঙ্গে বাইরে আসতে দিলাম না। তার আগে জানতে চাইলাম, তাঁর ছেলের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ আছে কিনা। সঞ্জয় কয়েক মুহূর্ত জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থেকে বলল, সে আগেই

গেছে। ইণ্টার্নমেণ্ট্ থেকে আর ফেরেনি।

মৃদু গম্ভীর কণ্ঠ। কিন্তু ঘরের ভিতরটা যেন থমথম করতে লাগল। কয়েক মিনিট আমরা নিঃশব্দে বসে রইলাম। তারপর বললাম, মিনু কোথায় জানেন ?

না, কার কাছে যেন শুনেছিলাম পার্টিশানের পর এপারে চলে এসেছে। কোথায় আছে জানি না।

চা-এর পর সঞ্জয় তার নিজের কাহিনীতে ফিরে গেল।

জেল থেকে বেরিয়ে পলিটিক্‌স্ এর মাঠে যতদিন বিচরণ করছিল, জীবিকার কথা ভাবতে হয়নি। 'দাদারা' অর্থাৎ পার্টি লিডাররা ভাবতে দেননি। পেট চালাবার মত কিছু একটা করবার চেষ্টা করছে, শুনলেই বলতেন, আহা, তোমার তো বাপু একটা পেট। তার জন্যে এত ভাবনা কিসের ?

মা তখনো ছিলেন। বড় ছেলে অ্যাড্‌ভোকেট। তাঁর কাছে থাকতেন পাটনায়। আর সব ভাইরাও মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং ভাবনা সত্যিই তেমন একটা ছিল না। তাছাড়া তখন নিজের ভাবনা ভাববার সময়ই বা কই ? সবটাই কেড়ে নিয়েছিল রাজনীতি।

তার আওতা থেকে বেরিয়ে আসবার পর প্রথম প্রয়োজন হল একটি চাকরি। বড়দা অবশ্য বার বার লিখছিলেন, এখানে চলে এসো। বি-এ পাস করা আছে। ল'টা দিয়ে দাও। ঐ রকম পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউণ্ড রয়েছে পেছনে, তারপর আমি আছি। বছর দশেকের মধ্যে যে টপ্-এ গিয়ে উঠতে পারবে, সে কথা আমি এখনি লিখে দিচ্ছি।

সঞ্জয়ের টপ্ দূরে থাক্ বটম্-এ গিয়ে দাঁড়াবার ইচ্ছাও ছিল না। এতগুলো বছর বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে, মাঠেঘাটে কাটিয়ে সেই দিকেই মন টানছিল। একটা কোনো বাঁধাবাঁধির মধ্যে যাওয়া তার ধাতে সয় না।

এক বন্ধুর চেষ্টায় চাকরি জুটে গেল। কোন একটা ওষুধের

কারখানার মেডিক্যাল রিপ্রেজেণ্টেটিভ। এ বিষয়ে তাকে সাহায্য করেছিল নৈনী জেল। সেখানে তার কাজ ছিল হাসপাতালের কমপাউণ্ডারি। ওষুধপত্রের নামধাম গুণাগুণ সম্বন্ধে বেশ খানিকটা জ্ঞান আপনা থেকেই আয়ত্ত হয়ে গিয়েছিল। সেটাই এবার কাজে লেগে গেল। তার সঙ্গে দেশভ্রমণের অভিজ্ঞতা।

সঞ্জয়ের নিজেরও চাকরিটা পছন্দ হয়ে গেল। বেশ খানিকটা ঘুরে বেড়ানো যাবে, যা সে চেয়েছিল। তার উপরে মাইনেটাও মন্দ নয়।

সারা উত্তর ভারত তার পরিধি। কত বিচিত্র লোকের সঙ্গে পরিচয়। বেশির ভাগই ডাক্তার, কতক অন্য লোক। পথ চলতে চলতে যারা জুটে যায়। ঘনিষ্ঠতাও হল কারো কারো সঙ্গে। কিছু বন্ধু-সঞ্চয় হল। একজনের সঙ্গে বিশেষভাবে জমে গেল। হাজারীবাগের এক ডাক্তার। তার ছিল শিকারের বাতিক। মাঝে মাঝে স্টেথোস্কোপ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রাইফেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। সঞ্জয় হল তার সঙ্গী শিকারের দিকে তার ঝোঁক ছিল না। তার আকর্ষণ বন।

এক মাসের ছুটি নিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে এমনি কোন এক পাহাড় জঙ্গলঘেরা খনি অঞ্চলে এক ডাক-বাংলোয় গিয়ে উঠল সঞ্জয়। নাম-ধামগুলো বলেছিল, আমি ভুলে গেছি। স্কুলে থাকতে সব চেয়ে কম নম্বর পেতাম ভূগোলে। জায়গার নাম কিছুতেই মনে থাকত না। আর তার লোকেশন বা ভৌগোলিক অবস্থান জিজ্ঞেস করলেই সর্বনাশ! আজও ঠিক সেই অবস্থায় আছি। যাক; যা বলছিলাম।

ডাক্তার বন্ধু সন্ধ্যার পর শিকারে বেরিয়ে যায়। প্রথম দু-একদিন সঞ্জয়ও গেল তার সঙ্গে। তারপর আর তার পোষাল না। গাছের ডালে লতাপাতা দিয়ে তৈরী খাঁচার মধ্যে বসে বেপরোয়া মশা আর কাঠপিঁপড়ের কামড় খাওয়া, এবং কথা দূরে থাক নিশ্বাস পর্যন্ত বন্ধ করে তীর্থকাকের মত বসে থাকা—কখন বাঘমশাই দয়া করে এসে দাঁড়াবেন বন্দুকের পাল্লার মধ্যে! এটা তার ধাতে সইল না। সে আপন

মনে ঘুরে বেড়ায়। বন্যজন্তুর চেয়ে বন তার কাছে অনেক জীবন্ত।

ঐখানে একদিন এক বৃদ্ধ মারোয়াড়ী। সঞ্জয়ের সঙ্গে যেচে আলাপ করলেন এবং শুনে অবাক হয়ে গেলেন, একটা লোক শুধু ঘুরে বেড়াবার জন্যে এখানে এসে আস্তানা নিয়েছে, তার হাতে কোন কাজ নেই। একটু বোধহয় দয়া হল লোকটার উপর। বললেন, চলুন বাবুজী, নতুন জায়গা থেকে ঘুরিয়ে আনি আপনাকে।

মারোয়াড়ী ভদ্রলোকের জীপ ছিল। তাতে চড়ে অনেক দুর্গম পথ পেরিয়ে একটা ফাঁকা জায়গায় গিয়ে পড়ল দুজনে। সারি সারি ছোট ছোট কালো পাহাড়। একেবারে ন্যাড়া। গাছপালা দূরে থাক, একটুকরো ঘাস পর্যন্ত নেই তার গায়ে। তাদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে মানুষ। বিচিত্র এবং ব্যাপক সে আক্রমণ।

প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের ভূমিকা দর্শকের নয়, দস্যুর, এটুকু সঞ্জয়ের অজানা নয়। এজন্যে তার মনে কোনো নালিশ নেই। সভ্যতার প্রথম ধাপ হল প্রকৃতিকে জয় করা, তাকে বশে আনা। বিশাল অরণ্য উড়িয়ে দিয়ে, মাটির গভীর তল থেকে লোহা আর কয়লার স্তূপ উপড়ে এনে তবে তো বড় বড় নগর পত্তন হবে, তৈরি হবে জাহাজ, রেল আর সভ্য মানুষের অসংখ্য প্রয়োজন মেটাবার মত কলকারখানা। পাহাড়ও যে তার হাত থেকে রেহাই পায়নি, সঞ্জয় জানত। কিন্তু স্বচক্ষে দেখল এই প্রথম।

মারোয়াড়ী ভদ্রলোক তাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখালেন।

টিলাগুলোর গায়ে ড্রিলিং মেশিন দিয়ে কোথাও বা ছেনি-হাতুড়ি দিয়ে ছেঁদা তৈরি করছে একদল লোক। আরেক জায়গায় সেই গর্তের মধ্যে একরকমের কাঠি ভরা হচ্ছে, যাকেবলে ডাইন্যামাইট স্টিক্। তার সঙ্গে বৈদ্যুতিক তার লাগানো। শ'খানেক গজ দূর থেকে ব্যাটারির সাহায্যে বিস্ফোরণ ঘটানো হবে। বেরিয়ে আসবে বড় বড় পাথরের চাঁই। একদল লোক সার বেঁধে বসে গেছে সেগুলোকে

ভেঙে ভেঙে টুকরো করতে। মানুষের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে মেশিন। একটা যন্ত্রের মধ্যে ফেলে বড় টুকরো ভেঙে ছোট করা হচ্ছে, যার নাম ক্রাশিং। নানা আকারের সে টুকরো। সেগুলোকে সাইজ মত আলাদা করে ফেলা দরকার। সে কাজ করছে একটি বৃহৎ পিপার মত যন্ত্র। সঞ্জয় উঁকি মেরে দেখল, তার মধ্যে থাকে থাকে সাজানো আছে বিভিন্ন আকারের ছিদ্রওয়ালা চালুনি। পাথরের টুকরোগুলো তার ভিতর দিয়ে যেতে যেতে ছোট বড় দলে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। কারো পরিধি আধ ইঞ্চি, কারো এক ইঞ্চি, কারো তার চেয়ে বেশী। আলাদা আলাদা করে তুলে নিয়ে মেয়ে কুলীরা তাদের স্তূপাকার করে সাজিয়ে রাখছে রেলওয়ে সাইডিং এর ধারে। ওখান থেকে ওয়াগনে চড়ে তারা চলে যাবে দূর-দূরান্তরে।

মারোয়াড়ী ভদ্রলোক সেই ঢাল লাগানো স্টোন্-চিপস্-এর সারি-গুলোর দিকে আঙুল তুলে বললেন, এরই একটা আপনার জন্যে রেখে দিলাম বাবুজী। আপনার 'মোকাম' তৈরী হবে।

বলে, এসে উঠলেন।

সঞ্জয় জিজ্ঞেস করে জানল, আশেপাশের সব টিলা লীজ নিয়ে রেখেছেন ভদ্রলোক। বেশির ভাগ মাল যায় কোলকাতায়। উত্তর ভারতের আরো অনেক শহরেও যায়। বিরাট ব্যবসা।

কেবল এই একটা নয়, আরো কারবার আছে জিৎমলবাবুর। কোনোটা ছেলের নামে, কোনটা ভাইপোর।

"ইন্‌কাম ট্যাকস-এর উৎপাত আছে তো। এ না করে উপায় নেই। সব ওরা টেনে নেয়। ব্যবসা করে আর সুখ নেই বাবুজী," অকপটে স্বীকার করলেন জিৎমলবাবু। তারপর বললেন, "তাছাড়া ছেলেপিলেগুলোকে ভেড়াতে হলে ওদের বুঝতে দিতে হবে, ওরাও মালিক। ওদেরও স্বার্থ আছে। তা না হলে গা করে না। এমনিতেই বডড বাবু হয়ে পড়ছে তারা। আমার পোশাক তো এই দেখছেন। আর আমার বড় শ্রীমানকে যদি দেখেন, বুঝতেই পারবেন না সে

আমার ছেলে। জুতোই আছে পাঁচজোড়া। সারা জীবন খেটে যা কিছু করলাম, সব তছনছ করে দেবে বাবুজী। দিন গুনছে, বুড়োটা কবে চোখ বুজবে। শুধু আমার নয়, সব মারোয়াড়ীর ঘরে আজ এই হাল। ছেলেগুলো মানুষ হচ্ছে না। আমাদের জাতের আখের বড় খারাপ।"

ডাক্তারের শিকারপর্ব এবারকার মত শেষ হয়েছিল। বিশেষ কিছু সুবিধে হয়নি। কোনো শার্দূল প্রভু দয়া করেননি। গোটাকয়েক পদচিহ্ন রেখে চলে গিয়েছিলেন। একটি বুনো শুয়োর মাত্র সম্বল করে সে ফিরবার আয়োজন করছিল। সঞ্জয় বলল, সে এখন ফিরবে না। ডাক্তার অবাক—একা একা কী করবে এই জঙ্গলে।

থেকে যাই কটা দিন।

ঐ পাথরের টুকরোগুলোর মধ্যে কী রস পেলে ?

সঞ্জয় জবাব না দিয়ে শুধু হাসল।

রস সত্যিই পেয়েছিল। শুধু পাথরের টুকরো নয়, তার কারবারী ঐ বৃদ্ধ মারোয়াড়ীকেও ভালো লেগেছিল। ছেলেবেলা থেকে শুনে এসেছে, এ জাতটা শুধু টাকা ছাড়া আর কিছু বোঝে না, আর কোনো দিকে এদের নজর নেই। হয় তো তাই। টাকার জন্যে এদের কেউ কেউ সব কিছু বিসর্জন দিয়ে থাকে—ন্যায়, ধর্ম, দেশাত্মবোধ, এককথায় মনুষ্যত্ব। তারা খাবার জিনিসে ভেজাল মিশিয়ে পরোক্ষে লোক খুন করে, রাতারাতি ব্যাঙ্কের মাথায় লাল বাতি জ্বেলে দিয়ে বহু গরীবের সর্বস্ব নিয়ে সরে পড়ে, তৈরী মাল গঙ্গায় ফেলে দিয়ে তিন গুণ দাম চড়িয়ে হাজার হাজার অভাবী মানুষের পটেক কাটে, ঘুষ দিয়ে কাজ বাগায়, লক্ষ লক্ষ টাকা ট্যাক্স্ ফাঁকি দেয়, রাজস্থান থেকে কোলকাতায় গম পাঠাবার নাম করে শ'এ শ'এ ওয়াগনভর্তি কয়লা পাচার করে পাকিস্তানে। আরো অনেক কিছু করে মনুষ্যত্বের বিচারে যা অন্যায়, পাপ। তবু এদের মত পরিশ্রমী জাত কটা আছে ভারতবর্ষে ?

কাজের জাতবিচার না করে তার মধ্যে এমন নিষ্ঠার সঙ্গে ডুবে যেতে পারে কারা? নিজের 'জাতের' জন্য (হোক সেটা সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা) এতখানি ত্যাগ স্বীকার কাদের মধ্যে দেখা যায়?

সঞ্জয় দেখেছে, একজন মারোয়াড়ী যখন দাঁড়িয়ে যায়, অন্য অনেক প্রদেশের বড় লোকদের মত সে তার পারিপার্শ্বিক থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে না। চারদিকে যারা রইল, তার মত উঁচুতে যারা উঠতে পারেনি, তাদেরও হাত বাড়িয়ে টেনে তুলতে চেষ্টা করে। একজন বাঙালী কিংবা বিহারী 'বড় লোক' তার গ্রাম থেকে সদ্য-আগত সাহায্যার্থী কোন দুঃস্থ মানুষকে 'ভাই' বলে সম্বোধন করবে না, কিন্তু কিন্তু তার থেকে অনেক বেশী 'বড় লোক' মারোয়াড়ী তার 'মুলুক' থেকে আমদানি নিতান্ত দীন-হীন লোককেও 'ভাইয়া বলতে কুণ্ঠা বোধ করবে না। শুধু বলা নয়, তার জন্যে করবেও অনেক কিছু।

শুধু কি গোষ্ঠী শোষণ করে এরা? কেবল 'জাতভাইদের' টানে? জিৎমলবাবুকে দেখে, তার সঙ্গে মিশে সঞ্জয়ের মনে হল, সবাই অন্তত তা করে না।

স্টোন্-চিপস্এর জগতে সে সত্যিই এক অদ্ভুত নেশার সন্ধান পেয়েছিল। প্রাতরাশ শেষ করেই মারোয়াড়ী সঙ্গে জীপে চড়ে বেরিয়ে পড়া ছিল তার দৈনন্দিন রুটিন। সেদিন ঘুরে ঘুরে সব দেখতে দেখতে বলল, আরেকটা ক্রাশিং মেশিন বসান না কেন জিৎমলবাবু? তাতে আপনার সময় এবং লেবার দুটোই অনেক বেঁচে যাবে। এই এত লোক বসে বসে হাতুড়ি দিয়ে ঠুকঠুক করে যা ভাঙছে, একটা মেশিনে তার অনেক গুণ মাল পেয়ে যাবেন। ক্যাপিটাল কস্ট্ একটা আছে বটে। কিন্তু সেটা উঠে আসতে আর কতদিন?

জিৎমলবাবু হাসলেল, একবার তাকিয়ে দেখলেন যে লোকগুলো লম্বা লাইন করে বসে পাথরের চাঁইগুলো ভেঙ্গে টুকরো করছে, তাদের দিকে, তারপর বললেন, আপনার কথা বিলকুল ঠিক বাবুজী। মেশিন আমি এখনি বসাতে পারি। তার দাম উঠে আসতে এক মাসও

লাগবে না। তারপর ষোলআনা লাভ। কিন্তু—

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে রইলেন। বোধ হয় একটু কুণ্ঠা বোধ করছিলেন বলতে। সেটা কাটিয়ে উঠে বললেন, আমি এই গোটা অঞ্চলটা ঘুরে দেখেছি। শুধু পাহাড় আর জঙ্গল। উঁচু জমি। জল বলে কিছু নেই, দু-চারটা ঝরণা আর দু-একটা ডোবা ছাড়া। বৃষ্টির জল ঢালু পথ দিয়ে গড়িয়ে চলে যায়। কাজেই বুঝতে পারছেন, চাষবাস অতি সামান্য। লোকগুলো খাটিয়ে; কিন্তু করবার মত কিছু নেই। মেয়েপুরুষ সারাদিন খেটেও পেটের ভাত জোটাতে পারে না। তবু এখান থেকে কিছু লোক কিছু পাচ্ছে। মেশিন এলে আর পাবে না।

হঠাৎ চিৎকার করে কাকে যেন কি বলতে বলতে ওদিকে চলে গেলেন জিৎমলবাবু। সঞ্জয় বুঝল, ওটা কিছু না। আসলে লজ্জা পেয়েছে ভদ্রলোক। এতগুলো লোকের মুখের দিকে চেয়ে নিজের লাভের অঙ্কটাকে জেনেশুনেই বাড়াতে দিচ্ছি না, এ কথাটা গোপন রাখবার ইচ্ছা ছিল, সঞ্জয়ের সামনে ধরা পড়ে গেছে।

সঞ্জয় এ লোকটির চরিত্রের অনেকগুলো দিক আগেই জানতে পেরেছিল, এবার আরেকটা নতুন দিকের সন্ধান পেল। এটা তার কাছে একেবারে অপ্রত্যাশিত।

আরেক দিন জিৎমলের কাছে নয়, তার কুলীদের যে সর্দার তার মুখ থেকে জেনেছিল, ও মেশিনটাও আনবার ইচ্ছা ছিল না বাবুর। তখন ওখানে আরো অনেক লোক কাজ করত। তারপর কোথাকার কোন্ সরকারী অফিস থেকে কয়েকটা জরুরী অর্ডার এল। তারা জলদি মাল চায়। বাধ্য হয়ে ওটা আনতে হল। কিছু লোক ছাঁটাই হয়ে গেল। তারা ওখান থেকে কয়েক মাইল দূরে সোপ-ষ্টোন্-মাইন-এ কাজ পেয়েছে। সেটাও ঐ বাবুর।

সেইদিনই সন্ধ্যার পর দুজনে যখন ডাকবাংলোর বারান্দায় বসে গল্প করছে, সঞ্জয় বলল, আপনার সোপ-ষ্টোন-মাইন দেখাতে নিয়ে যাবেন কবে ?

"সে খবরও পেয়ে গেছেন দেখছি," হেসে বললেন জিৎমলবাবু।

"আপনি তো আর বলেননি।"

"ছুদিন পরেই বলতাম। পথটা বড় খারাপ আছে। যেতে আপনার কষ্ট হবে, তাই বলিনি।"

সঞ্জয় মনে মনে হাসল। তার পূর্ব জীবনের কথা এখনো ওঁকে কিছু বলা হয়নি। এর চেয়ে কত গভীর জঙ্গলে দিনের পর দিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হয়েছে, কত ছুর্গম, ছুস্তর পথ রাতারাতি পাড়ি দিতে হয়েছে, ঝরণার জল আর নাম-না-জানা বুনোফল ছাড়া আর কিছু জোটেনি, কতদিন সাপের মুখে পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে, বাঘের ডাক শুনে সারারাত গাছের উপর বসে কাটিয়ে দিয়েছে, সে সব কাহিনী যদি শুনতেন জিৎমলবাবু, বুঝতে পারতেন তার কাছে 'খারাপ পথ' বলে কিছু নেই।

আপাতত সে প্রসঙ্গ না তুলে শুধু বলল, জীপ যাবে না ?

"যাবে, তবে বড্ড ঝাঁকুনি খেতে খেতে যেতে হবে।"

"আপনার অসুবিধে হবে ?"

"না, না, আমার কোনো অসুবিধে নেই। ওসব আমার অভ্যেস আছে। আপনার কথা ভাবছিলাম।"

"আমি যেতে পারবো। চলুন, কালই যাওয়া যাক।"

সঞ্জয়ের সম্বন্ধে জিৎমলবাবুর কৌতূহল গোড়া থেকেই প্রবল। অনেক সময় কখনো অন্য কথাচ্ছলে, কখনো সরাসরি প্রশ্ন করে জানবার চেষ্টা কম করেননি। কিন্তু সঞ্জয় তার বর্তমান চাকরি ছাড়া বিশেষ কিছু ভাঙেনি। সেই সঙ্গে তার লেখাপড়া এবং বাড়িঘরের মোটামুটি খবরটুকু অবশ্য জানিয়ে দিয়েছে। তার প্রথম জীবনের রাজনীতি, সশস্ত্র পথে দেশোদ্ধারের চেষ্টা, তার জন্য অশেষ ছুঃখ বরণ, পুলিসের হাতে নির্যাতন, জেল এবং স্বাধীনতার পর দ্বিতীয় দফা রাজনীতি ও সেখান থেকে স্বেচ্ছায় বিদায়গ্রহণ—এ সব কিছুর সামান্য

আভাসও পাননি জিৎমলবাবু।

ডাকবাংলো থেকে সোপ-স্টোন্-মাইন্এ যাবার পথে প্রথমটা জিৎমলবাবুই তার ভাণ্ডার খুলে দিলেন। তার বেশির ভাগ আগে বলা হয়ে গেছে। দ্বিরুক্তি করেও সময় ফুরাতে চায় না। অনেক রাস্তা বাকী। বলবার মত নতুন কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ দুজনে পাশাপাশি একদম চুপচাপ বসে থাকাই বা যায় কেমন করে? তাতে কঠিন পথের কাঠিন্য আরো বাড়ে। কিন্তু সঞ্জয় মাঝে মাঝে হাঁ, হুঁ আর দু-একটা প্রশ্ন ছাড়া একেবারে নির্বাক।

ড্রাইভারটি খুব পাকা। যদ্দুর সম্ভব বাঁচিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তবু মাঝে মাঝে দুজন যাত্রীরই মনে হচ্ছিল, যে কোন মুহূর্তে জীপনামক এই ক্রুদ্ধ যন্ত্রটি তাদের আশপাশের ঐ পাথরগুলোর মধ্যে সগর্জনে ছুঁড়ে ফেলে দেবে, এবং সেখান থেকে আস্ত হাড় নিয়ে উঠে আসবার কোনো সম্ভাবনা নেই।

এমনি খানিকটা মৃত্যুর ফাঁদ পাতা রাস্তা উল্লঙ্ঘন করে, ইংরেজিতে যাকে বলে 'নিগোশিয়েট,' একটুখানি সহজ জায়গায় পড়ে জিৎমলবাবু বললেন; এই রকম পথে নিশ্চয়ই আপনাকে কোনদিন চলতে হয়নি!

এর চেয়েও খারাপ পথে যেতে হয়েছে। জীপে নয়, ট্রাকে, এবং সেটা আরো সাঙ্ঘাতিক।

বলেন কী! আপনার ঐ দাওয়াই ক্যানভাস করতে?

না, তার জন্যে পাহাড়ে জঙ্গলে যেতে হবে কেন?

তবে?

ড্রাইভার এসে একটা সমান জায়গায় দাঁড়াল। এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম না নিয়ে তার পক্ষে আর স্টিয়ারিং ধরা সম্ভব নয়। বিশ্রামে প্রয়োজন তার আরোহীদেরও কিছুমাত্র কম ছিল না।

গাছের ছায়ায় একটা পাথরের উপর গিয়ে বসল দুজনে, এবং জিৎমলবাবু তার আগের প্রশ্নের পুনরুক্তি করলেন, কোথায় ঘুরলেন? কার ট্রাকে?

কার তা জানি না। পুরো দুদিন ধরে হেঁটেছি। পেটে কিছু পড়েনি। পা আর চলছিল না। হঠাৎ দেখলাম একটা ট্রাক যাচ্ছে। গিয়ে ধরলাম। তার রাস্তা আর আমার রাস্তা এক নয়। তবু যতটা যাওয়া যায়। ড্রাইভারের বোধহয় সন্দেহ হল আমার চেহারা দেখে। 'না' বলে দিল। সঙ্গে আর একটা লোক ছিল, সে আবার নানা রকম জেরা শুরু করল—কে তুমি? কোথায় যাবে? এখানে এলে কী করে? উত্তর আমার পকেটেই ছিল। বের করলাম। দেখেই সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিল। শুধু তাই নয়, ওদের যেদিকে যাবার কথা সেদিক ছেড়ে আমার পথে অনেকটা এগিয়ে দিয়ে গেল।

কী ছিল আপনার পকেটে? সবিস্ময়ে জানতে চাইলেন জিৎমলবাবু।

রিভলভার।

অ্যাঁ।

একটা শুধু আঁতকে ওঠার শব্দ। তারপর অনেকক্ষণ জিৎমলবাবুর কণ্ঠে আর কোনো আওয়াজ পাওয়া গেল না। দুটো চোখ শুধু চেয়ে রইল, সংস্কৃত ভাষায় যাকে বলে বিস্ময়বিস্ফারিত লোচন।

সঞ্জয় সেদিকে একবার তাকিয়ে হাসিমুখে বলল, ভয় নেই, এখন ওসব কিছু নেই আমার পকেটে। অনেকদিন হল ও পথ ছেড়ে দিয়েছি।

সোপস্টোন্-মাইন্ নামে 'মাইন্' হলেও আসলে কয়লার খনির মত পাতালস্পর্শী ভয়াবহ ব্যাপার নয়। অন্তত জিৎমলবাবুর এ মাইনটি তা ছিল না। খানিকটা জায়গা জুড়ে গর্ত খোঁড়া হয়েছে। তার একদিকে ধাপকাটা। লোকজন ওঠানামা করছে। ভিতরে সাদা পাথরের পাহাড়।

এখানেও ডিনামাইট লেগে গেছে, ভীষণ শব্দ করে পাহাড় ভেঙে চাঁই তৈরি করছে, চাঁই থেকে নানা আকারের টুকরো। কুলীরা সেগুলো ঝুড়ি করে তুলে এনে একটু দূরে নিয়ে জড়ো করে রাখছে।

বেশির ভাগ মেয়ে-কুলী। তারা নিজেদের মধ্যে হাসি গল্প করছে, বিশেষ করে যারা কমবয়সী, অচেনা আগন্তুকের উপর কৌতুহল দৃষ্টি ফেলে হয়তো তাকে নিয়েই কোনো সরস মন্তব্য করছে সামনেকার সখীটির কাছে। আবার একপশলা হাসি। মাঝে মাঝে ধমকে উঠছে মোটা গোঁফওয়ালা বৃদ্ধ সরদার। তারপরেও মিলিত হাসি।

মাইনের ভিতরটা দেখতে গিয়ে সঞ্জয় কিছুক্ষণ এদের লক্ষ্য করল। এখনো এখানে পলিটিক্স্ এসে পৌছায়নি, একদিন আসবে এবং সেদিন খুব দূরে নয়। তখন হয়তো এই মেয়েগুলোর মজুরি কিছু বাড়বে, ছুটিছাটার সুবিধা-সুযোগও জুটবে কিছু, কিন্তু এই সহজ, সরল, উচ্ছল হাসিটি আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখন যে কাজ এদের কাছে কাজ এবং খেলা, দুই-ই তখন হবে শুধু কাজ। এখন মনিবের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথাবলছে, একআধটু রঙ্গ-তামাশাও করতে ছাড়ছে না, তখন এদের আর ঐ জিৎমলের মধ্যে এসে দাঁড়াবে অন্য এক দল ভিন্নভাষী, ভিন্ন পোশাকের ভদ্রলোক, মালিক ও মজুর দু-তরফের কাছেই যারা অবাঞ্ছিত হয়েও অপরিহার্য।

ঢাল দেওয়া পাথর-টুকরোর কাছে সঞ্জয়কে নিয়ে গেলেন জিৎমলবাবু। সেখানে তখন বাছাই এর কাজ চলছে। যারা করছে তারা এ লাইনে এক্সপার্ট। একরঙা পাথর নয়। কতগুলো দুধের মত সাদা, কতগুলো সাদা কিন্তু ধবধবে নয়, কতগুলো একটুখানি পাটলবর্ণ, যাকে বলে পেল্ রেড্ (pale-red) কতগুলো থেকে বেগুনী আভা দেখা যাচ্ছে, কতগুলো আবার ছাই এবং কালচে রং এর। সব আলাদা আলাদা করে রাখা হচ্ছে। ধবধবে সাদা স্তুপের দিকে আঙুল দেখিয়ে জিৎমলবাবু বললেন, এই হচ্ছে পয়লা নম্বর সোপস্টোন, মেয়েদের বডি পাউডার, ফেস পাউডার তৈরি হয় এর থেকে। সারা দুনিয়ায় এর বাজার।

ময়দার সঙ্গে ভেজাল দেবার কাজেও লাগে বোধহয়, চুপিচুপি হালকা সুরে, অন্যেরা শুনতে না পায় এমন ভাবে বলল সঞ্জয়।

জিৎমলবাবু হেসে উঠলেন, ওটাই বুঝি আপনার আগে মনে হল? কিন্তু .আমার মনে হয় বাবুজী, কথাটা নেহাৎ রটনা। দেখছেন তো; এত পাথরের মধ্যে এর ভাগটাই সব চেয়ে কম। পেষাই-টেষাই করে করে যা পড়তা পড়ে, ময়দার চেয়ে বেশ কিছুটা বেশী। সস্তার সঙ্গে দামী জিনিস মেশাতে যাবে কোন্ বুদ্ধু? এর সঙ্গে ময়দা মেশালে বরং কিছু মুনাফা হয়। কিন্তু সে জিনিস কি মেয়েদের গায় উঠবে?

কী রকম? আমরা তো জানতাম ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। আপনি যা বলছেন, তাই যদি হয়, তাহলে ১৯৪৭ সালে ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষের মিনিস্ট্রি গেল কেন? এই সোপস্টোনের ওপর নজর দিতে গিয়েই ভদ্রলোক আপনাদের বিষনজরে পড়ে গেলেন।

এ খবর জিৎমলবাবু জানতেন না। সঞ্জয় বলল, যাক, ওকথা পরে হবে। বাকী সব দিয়ে কী হয় বলুন?

অনেক কিছু। ফেলা যায় না কোনোটাই। ঐ কালচে মত পাথরগুলো যে দেখছেন, ওটা ফার্টিলাইজার তৈরির কাজে লাগে। এবার চলুন পেষাই কলগুলো দেখাই আপনাকে।

চল্লিশ একর জমি নিয়ে বিশাল ব্যাপার। অনেকগুলো মাইন থেকে মাল তোলা হচ্ছে। খানিকটা দূরে ছোট ছোট পাহাড়ের একটা লম্বা রেঞ্জ্ চলে গেছে। সেদিকে আঙুল তুলে জিৎমলবাবু বললেন, ঐ গোটা বেল্টটাতে সোপস্টোন্ ভর্তি। এক মাইলের ওপর আমার লীজ নেওয়া আছে। খুব সস্তায় নিয়েছিলাম। এখন ভীষণ দাম বাড়িয়ে দিয়েছে সরকার।

কোণের দিকে দু-তিনখানা খড়ের চালা নিয়ে জিৎমলবাবুর আস্তানা। তার একটাতে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, আপনার এখানে কষ্ট হবে বাবুজী। ডাকবাংলোর মতো আরাম পাবেন না। এই খাটিয়ায় শুতে হবে। তবে ঘরগুলো বেশ ঠাণ্ডা। বড্ড গরম তো এদিকটায়, তাই খড়ের ব্যবস্থা। খেতে হবে একেবারে নিরামিষ। যে লোকটা আমার খানা বানায়, তার বিদ্যেও বেশী নয়। স্রেফ রুটি

আর আলু দিয়ে একটা চোখা মতো। শাকসবজি এখানে মেলে না, অনেক দূর থেকে আনাতে হয়।

সঞ্জয় বলল, ওসব নিয়ে আপনি কিচ্ছু ভাববেন না। আমার জীবনে এমন অনেক দিন গেছে, যখন এমন সব জিনিস পেটে পুরতে হয়েছে যা কোনো কালে কোনো দেশেই মানুষের খাদ্য নয়। শুনলে আপনি আবার ভয় পাবেন, তখন যেমন পেয়েছিলেন। আপনার সেই লোকটিকে বলুন, আপাতত আমায় এক গেলাস, মানে একলোটা ঠাণ্ডা জল দিয়ে যাক।

সেই খড়ো ঘরের মাটির মেঝের উঁপর পাশাপাশি দুটো দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে সঞ্জয় তার বিপ্লবী জীবনের মোটামুটি ইতিহাস জিৎমল-বাবুকে শুনিয়ে গেল। তাঁর একান্ত আগ্রহ এবং ইচ্ছাপূরণ করবার জন্যেই শোনাতে হল। তাছাড়া তার নিজের মনের দিক থেকেও কিছুটা তাগিদ ছিল। এই বৃদ্ধ মারোয়াড়ীটিকে বড় অদ্ভুত মনে হয়েছিল। একটা কেমন আকর্ষণ বোধ করছিল তার প্রতি। তার মধ্যে যেন দুটো মানুষ আছে! একজন ঝানু ব্যবসায়ী, কাজ ছাড়া কিছু জানে না, টাকা আনা পাই ছাড়া কিছু বোঝে না, নিতান্ত নিঃস্ব অবস্থা থেকে একক চেষ্টায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের বলে বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। কয়েক কোটি টাকার মালিক। আরেকজন সাদা, সরল, কোমল-প্রাণ, আত্মভোলা সন্ন্যাসী, ঐশ্বর্যের উপর যার মোহ নেই, যে কোনো মুহূর্তে সব ছেড়েছুড়ে আবার সেই লোটা-কম্বল আশ্রয় করতে পারে। চোখ দুটোতে একটা শিশুসুলভ-কৌতূহল। এমন লোককে সব কিছু বলা যায়।

সঞ্জয় ছেলেবেলা থেকে যে শিক্ষা পেয়েছে, যে পথে তাকে চলতে হয়েছে তার প্রধান এবং প্রথম পাঠ ছিল—মুখ খুলবে না। অনেক অমানুষিক নির্যাতন, তার মুখ থেকে একটি শব্দও বের করতে পারেনি জিৎমলের কাছে সে নিজেকে খুলে দিল। তাদের সংগঠনের এমন

অনেক গোপন কথা ব্যক্ত করল, যা কারো কাছেই কখনো বলেনি। তার নিজের কথাও রইল তার সঙ্গে।

জিৎমলবাবু নিঃশব্দে শুনে গেলেন, কোনো মন্তব্য করলেন না। কোনো প্রশ্নও নয়।

সঞ্জয় যখন থামল, গলাটা সাফ করে নিয়ে শুধু একটা কথা বললেন, আচ্ছা, এবার তুমি ঘুমোও বাবুজী। রাত আর বেশী নেই।

ডাকবাংলোয় ফিরবার আর দরকার ছিল না। জিৎমলবাবু ওখানেই রয়ে গেলেন। সঞ্জয় তার পরদিন মাইল ছয়েক দূরে একটা ছোট স্টেশনে গিয়ে কোলকাতার গাড়ি ধরল। জিৎমলবাবু গিয়ে তুলে দিয়ে এলেন। জীপ থেকে নেমে টিকিটঘরের দিকে যেতে যেতে বললেন, এই নাও আমার ঠিকানা। সময় করে একবার যেও বাবুজী। বড় খুশি হবো। আমি আর দিন দশেকের মধ্যেই ফিরছি! তারপর এসো। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

এতদিন যে সুরে কথা বলেছেন, এটা তার থেকে আলাদা, অনেক অনেক বেশী অন্তরঙ্গ। সঞ্জয় সেটা লক্ষ্য করল, কিন্তু কারণটা অনুমান করতে পারল না। শুধু বলল, যাবো।

কোলকাতায় পৌঁছবার কয়েক দিনের মধ্যেই তার ছুটি শেষ হল। অফিসে গিয়ে দেখে, তার নতুন অভিযানের বন্দোবস্ত হয়ে আছে। এবারকার পাল্লা অনেক লম্বা এবং ছড়ানো। ঘুরে আসতে মাসখানেক লেগে গেল।

মেস-এ ফিরে ছুখানা চিঠি পেল। একখানা মার, খবর খুব খারাপ। বড়দা হঠাৎ কোর্টের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। স্ট্রোক এবং এটা দ্বিতীয় আক্রমণ। সব কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়েছেন ডাক্তার। বেশ বড় সংসার। আয়টা একহাতের, কিন্তু খরচ করছে অনেকগুলো হাত। বৌদি এবং ছেলেমেয়েরা সবাই মুক্তহস্ত। সুতরাং অবস্থা অনুমেয়। অবিলম্বে একবার যাবার জন্যে বিশেষ তাগিদ দিয়েছেন মা।

বাকী চিঠিখানা জিৎমলবাবুর, তার মধ্যেও দেখা করার তাগিদ। সেটাই বরং অবিলম্বে সেরে নেওয়া সহজ।

বিরাট অফিস। অনেক লোক কাজ করছে। একধারে ঘষা কাঁচের দরজার আড়ালে একটি মাঝারি গোছের কামরায় মালিক বসেন। পোশাক সেই মিহি ধুতির উপর পাঞ্জাবি, মাথায় মারোয়াড়ী টুপি।

আবার বুঝি বেরিয়েছিলে তোমার ওষুধের ব্যাগ নিয়ে? দেখা হতেই প্রথম প্রশ্ন। সঞ্জয় হাসল।

এবার কোন্ দিকে গিয়েছিলে?

প্রথমটা দার্জিলিং অঞ্চল, তারপর শিলং গৌহাটি, মণিপুর ইম্ফল, ওদিকে আগরতলা পর্যন্ত।

তাই একটু ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে।

এর পরেই কাজের কথা। জিৎমলবাবু সরাসরি প্রস্তাব করলেন, তোমাকে আমার পাশে এসে দাঁড়াতে হবে সঞ্জয়বাবু। দাওয়াই-টাওয়াই ছেড়ে যত জলদি পার চলে এসো।

আমি! আকাশ থেকে পড়ল সঞ্জয়, আমি আপনার ব্যবসার কী বুঝি?

তুমি যেটা বোঝ, পার, করেছ, সেই কাজই তোমাকে দেওয়া হবে।

ইংরেজ তাড়ানো? তার তো আর দরকার নেই। হাসিমুখে হালকা সুরে বলল সঞ্জয়। কিন্তু জিৎমলবাবু একটু গভীর বিষয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সুরেবললেন, না, তা নেই। তারা গ্যাছে, নিজে থেকেই যাক বা কেউ তাড়িয়েই দিক। কিন্তু শুধু তাড়ানোটাকেই আমি বড় করে দেখি না। তারপর কী? ওরা এসে আস্তানা গেড়ে বসেছিল, ভেঙে দিলাম। তাহলেই হল? সেখানে আবার একটা কিছু দাঁড় করাতে হবে তো। আমি সেই দিকটা দেখি। তোমাদের ব্যাপার-টাকেও আমি সেই দিক থেকে দেখছিলাম সেদিন। তার পরে ঐ নিয়ে আরো ভেবেছি। উদ্দেশ্য যাই হোক, কী আশ্চর্য জিনিস গড়ে তুলে-

ছিলে তোমরা। তোমার কথা শুনতে শুনতে আমি শুধু ভাবছিলাম কত বড় কারিগর এরা।

বলতে বলতে ক্ষণকাল থামলেন। তারপর আবার শুরু করলেন, তোমরা যে-সব করতে, খুন, ডাকাতি, লুটপাট, বোমা তৈরি—ওর কোনোটাই আমি ভালো বলবো না। তার পেছনে তোমাদের যে সব যুক্তি, আমার মন কক্ষনও মেনে নেব না। কিন্তু ওর ভিতরে, বলতে গেলে ওর মূলে যে জিনিসটা ছিল তাকে নিশ্চই মানবো। তার দরকার সবখানে। তুমি পিস্তলই চালাও, আর ব্যবসাই চালাও, ঐটি না হলে চলে না। ওটাকে আগে পাকা করে নিতে হবে। কী, বুঝতে পারছ তো? আংরেজী করে বললে তুমি বুঝবে ভাল—অর্গ্যানিজেশন। তোমাদের যেটা ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকল না। কারণ, তোমাদের এইটা ছিল না।

হাতে টাকা বাজাবার ভঙ্গি করলেন জিৎমলবাবু। তারপর বললেন কিন্তু আমার ঠিক উলটো। সেই জন্তেই তোমাকে আমার বিশেষ দরকার, সঞ্জয়বাবু। তোমরা যাকে বল রিসোর্সেস্, আমার যথেষ্ট আছে, লোকজনেরও অভাব নেই, অভাব শুধু সেগুলোকে ঠিক মতো কাজে লাগাবার মতো একজন মানুষের।

আপনি নিজেই তো রয়েছেন তার জন্তে।

আমি পারছি না। বুড়ো হয়ে গেছি। তাছাড়া, ব্যাপারটা কি জানো? আমি এতদিন ধরে শুধু জাল ছড়িয়ে গেছি, এবার তাকে টেনে গুটিয়ে তোলা দরকার। ও বিস্তে আমার তেমন জানা নেই।

আপনার ছেলে?

তার কথা তো তোমাকে সেদিনই বলেছি। তাকে দিয়ে আমি ভরসা করি না। সেই জন্তেই শুরু থেকে তাকে আমি অনেকটা আলাদা করে দিয়েছি। অন্ত বিজনেস্ আছে তার। সেগুলো নিয়েই ব্যস্ত।

সঞ্জয় ভাবতে লাগল। নিতান্ত আকস্মিক ও অযাচিত ভাবে যে সুযোগ তার সামনে এসে দাঁড়াল, তার পক্ষে একান্ত আশাতীত। তার

প্রয়োজন বুঝেই যেন দেখা দিল সুযোগটা। ওদিকে দাদার সংসার একটি বিশাল থাবা বাড়িয়ে দিয়েছে, তার ওষুধ ফেরির সামান্য মজুরি যার কোন্ তলায় তলিয়ে যাবে, কারো চোখেই পড়বে না। তার উপরে তার নিজেরও এতদিন যে-টাকায় চলত এখন তার তাতে কুলোচ্ছে না। দরকারগুলো বাড়ানো, কিন্তু তাদের প্রত্যেকটির জন্যে পকেটের উপর বাড়তি চাপ পড়ছে। এই মুহূর্তে একটি ভালো কাজ তার অবশ্য দরকার। এর চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে? একমাত্র প্রশ্ন, জিৎমলবাবু তাকে ভালোবাসেন, তার পূর্ব জীবনের কঠোর ইতিহাস শুনে তার দিকে আরো আকৃষ্ট হয়েছেন। এটা সেই স্নেহের আর মমতার দান নয় তো?

জিৎমলবাবু তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। মনে হল, যেন সেখান থেকেই তার এই মুহূর্তের চিন্তাধারাটা আঁচ করে নিলেন। বললেন, শোন সঞ্জয়বাবু, তোমাকে আমার ভালো লেগেছে। কিন্তু তার জন্যে তোমাকে আমি টানছি না। একেবারেই না। জান তো আমি মারোয়াড়ীর ছেলে, প্রতি পদে হিসেব করে চলি। এটাও সেই হিসেবের ব্যাপার। তোমাকে ডাকছি তোমার কাছ থেকে কাজ পাবো বলে।

সঞ্জয় বলল, পারবো কি?

নিশ্চয়ই পারবে। বলে, উঠে দাঁড়িয়ে সঞ্জয়ের কাঁধের উপর দুটো চাপড় মারলেন জিৎমলবাবু। তাঁর বেরোবার প্রয়োজন ছিল। যেতে যেতে বললেন, কাল বা পরশু একবার সময় করে এসো। আরো কথা আছে।

সেই 'আরো কথা' থেকে সঞ্জয় নিশ্চিত হল, সঞ্জয়কে যে তিনি চাইছেন, তার মধ্যে প্রয়োজনের দিকটা মোটেই ছোট নয়। অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি হিসাবী লোক। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন, তাঁর কর্মীগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা জটিল হয়ে উঠবে। যুগ বদলে গেছে। মানুষের অভাব অনটন দিন দিন বাড়ছে, ওদিকে প্রত্যেকেই তার

অধিকার সম্বন্ধে ক্রমশ সজাগ হয়ে উঠছে। চারিদিকে ধীরে ধীরে অসন্তোষ ধূমায়িত হতে শুরু করেছে। অচিরে না হলেও অদূর ভবিষ্যতে ওদের মধ্যে এমন একটি সংগঠন আত্মপ্রকাশ করবে, যার সঙ্গে বোঝাপড়ার প্রয়োজন দেখা দেবে। এ তরফে তখন সঞ্জয়ের মতো লোক দরকার, যার অতীত ইতিহাস গৌরবময়, যার জন্যে জনমনে একটি শ্রদ্ধার স্বতঃস্ফূর্ত আসন আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে ; আবার অন্য দিকে যে কঠোরভাবে ন্যায়পরায়ণ, দুদিকের স্বার্থের প্রতি সমদৃষ্টি. শুধু তাই নয়, যে নির্ভীক, কারো হুমকির কাছে মাথা নোয়াবে না।

অন্য একটা বিষয়েরও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন জিৎমলবাবু। সরকারের আইনকানুন রোজ-রোজ বদলাচ্ছে, নতুন জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে, শুধু নীচুস্তরে নয়, উপরমহলেও দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ছে। সুতরাং সরকারীমহলে কিছুটা প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করতে না পারলে কোনো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে টিঁকে থাকা কষ্টকর। সঞ্জয়ের সেখানেও প্রয়োজন আছে। একদিন যারা তার সঙ্গে মাঠে-জঙ্গলে ঘুরত, জেলের ঘানি টানত, তাদের কেউ কেউ মন্ত্রীর গদিতে গিয়ে উঠেছে। সকলেই তাকে খাতির করবে। নিষ্কলুষ চরিত্রের সমাদর সর্বত্র।

জিৎমলবাবু বলেছিলেন, তোমাকে যতটা চিনেছি, যাকে চাকরি বলে সেটা তোমার ধাতে ঠিক সইবে না। আমারো ইচ্ছা নয়, আমাদের ভিতরে একটা মনিব-কর্মচারী সম্বন্ধ টেনে এনে এই সম্পর্কটা নষ্ট করি। তোমাকে আমার পার্টনার করে নেবো।

পার্টনার !

হ্যাঁ, যাকে বলে ওয়াকিং পার্টনার। আমার টাকা, তোমার বুদ্ধি আর পরিশ্রম।

মাইনে নয়, মুনাফার উপর একটা কমিশন নির্দিষ্ট হল সঞ্জয়ের জন্যে। তার অঙ্কটি ওখানকার সর্বোচ্চ বেতনধারীর প্রাপ্যের চেয়ে বড়। তার থেকে কিছু টাকা আগাম নিয়ে শেয়ারে লাগানো হল, ডিরেকটর হবার জন্যে যতটা দরকার। প্রথমটা গোটা অফিসের ভার পড়ল তার উপর।

অনেক বিশৃঙ্খলা ছিল এখানে-ওখানে, অনেক ঢিলেঢালা, ফাঁকি ও ফাঁক। সঞ্জয়কে খাটতে হল। আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে এল।

জিৎমলবাবু ক্রমশ নিজেকে গুটিয়ে আনছিলেন, তারপর একদিন একেবারে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। সর্বময় কর্তৃত্বের ভার গিয়ে পড়ল ম্যানেজিং ডিরেকটর সঞ্জয় চ্যাটার্জির উপর।

॥ চার ॥

অফিস থেকে বেরোতে সঞ্জয়ের দেরি হত। মাঝে মাঝে উঠবার ঠিক আগেটায় একটা ফোন আসত আমার কাছে, খুব ব্যস্ত নাকি?

কিছুমাত্র না।

কাজ থাকলেও সরিয়ে রেখে দিতাম। সঞ্জয় চ্যাটার্জি সকল কাজের উপরে। তার পরেও প্রশ্ন হত, মুড?

আমি উত্তর দিতাম, আড্ডার পক্ষে আইডিয়াল। অতএব চলে আসুন।

ইদানীং প্রায়ই তার এই নতুন (তখন আর ঠিক নতুন নেই) জীবনের কথা বলত সঞ্জয়। কোথায় কোথায় আরো কি সব প্রসার হচ্ছে ব্যবসায়ের, আগে থেকে যেগুলো ছিল তার মধ্যে কি সব নতুন সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এগুলো সাধারণত আড্ডার উপযোগী বিষয় নয়। আমার মতো লোকের কাছে এর কোনো আকর্ষণ থাকবার কথা নয়। সে যা বলত, আসলে সেটা ইংরেজিতে যাকে বলে টকিং শপ্। কিন্তু বলবার গুণে আমি তার মধ্যে রস পেতাম। শুনতে শুনতে তার পূর্ব জীবনের সঙ্গে এই জীবনের ছবিটাকে পাশাপাশি রেখে দেখবার চেষ্টা করতাম। সে কিন্তু একবারও সেই পিছনে ফেলে আসা দিনগুলোর উল্লেখ করত না। এই দুটোর মাঝখানে যে একটি ছোট্ট অধ্যায় রয়ে গেছে, সামান্য কয়েকটা পাতা, চিটাগংএর কোনো একটা বাড়িতে

লোকচক্ষুর অন্তরালে শুধু দুটি মানুষকে নিয়ে যা রচিত, তার কথাও কোনোদিন ভুলত না।

আমার কৌতূহল ছিল সেইখানে। 'কৌতূহল' কথাটা বড় শুকনো, বড় মামুলী। ও দিয়ে আমার মনের সেই বিশেষ ভাবটি বুঝিয়ে বলা যাবে না। সেটা নিছক কৌতূহল বা কেবলমাত্র জানবার আগ্রহের চেয়ে অনেক গভীর। সেই চিঠিখানা যার, আমি বাহকমাত্র, আমার মনের মধ্যে বার বার আনাগোনা করত। আর চোখের উপর ভাসত ব্যর্থতার বেদনার হতাশার সেই করুণ দৃশ্য, সহসা ক্ষণেকের তরে যা দেখে ফেলেছিলাম। সে জানতে পারেনি। পারেনি এ-ও, যার হাতের নিষ্করুণ আঘাত সে অনিবার্য জেনে সহজ ভাবেই সয়ে নেবার চেষ্টা করেছিল। সে চেষ্টা সফল হয়নি। সে ব্যর্থতার ইতিহাস জানি শুধু আমি। নিজের চোখে দেখে এসেছি।

কিন্তু সঞ্জয় কি তা অনুমান করতে পারেনি? সে কি আশা করেছিল, 'শেষ' কথাটা উচ্চারণ করলেই সব কিছু শেষ হয়ে যায়? 'আমি গ্রহণ করতে অক্ষম'—এই বলে সরে দাঁড়ালেই কি আরেকজনও হাত গুটিয়ে নেবে? সে তো দিতে কিছু বাকী রাখেনি। প্রত্যাখ্যান করলেই তার অত বড় দান মিথ্যা হয়ে গেল?

মিনুকে আমি একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম। সঞ্জয়ের সঙ্গে যদি আর দেখা না হত, হয়তো তার সেই বেদনাহত রূপটি আমার মনের তলায় চিরদিনের তরে হারিয়ে যেত। ওকে যেদিন দেখলাম, সঙ্গে সঙ্গে সে-ও বিস্মৃতির আবরণ ঠেলে জেগে উঠল। তারপর থেকে ও যখনই আসে, সে-ও এসে অলক্ষ্যে দাঁড়ায় আমার সামনে। আমি ওর কথা শুনি আর মাঝে মাঝে তার দিকে তাকিয়ে দেখি। জানতে ইচ্ছা হয়, ও কি এখনো তার কথা ভাবে? তাকে মনে রেখেছে? না ওর এই কর্মবহুল জীবনের বিশাল বিস্তৃতির মধ্যে তার জন্যে একটুখানি জায়গা আর পড়ে নেই? ওর সদাব্যস্ত মনের কোণ থেকে সে মুছে গেছে?

প্রশ্নটা অনেক দিন আমার জিভের ডগায় এসে গেলেও আমি আবার তাকে পিছনে ঠেলে দিয়েছি। কেমন যেন সাহস হয়নি। কি জানি, যদি মনে মনে যে আশঙ্কা করছি, সেই কঠোর সত্যটা শুনতে হয়? সেই প্রথম দিন কবিরাজমশাই এবং তার ছেলের সঙ্গে মেয়ের খবরটাও জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উত্তর যা পেয়েছিলাম, নিতান্ত মামুলী। তার থেকে আমার বর্তমান প্রশ্নে আসবার মতো উৎসাহ পাচ্ছিলাম না।

কখনো কখনো মনে হত মিনুর সম্বন্ধে সঞ্জয়ের এই নীরব থাকাটা হয়তো ইচ্ছাকৃত। দীর্ঘকালের অভ্যস্ত সংযম। পাছে কিছু বলতে গেলে আমার সামনে কোনো দুর্বলতা প্রকাশ পায়, তাই চুপ করে আছে। কিন্তু তাই বা কি করে বলি? আমি তো যে কোনো একজন তৃতীয় ব্যক্তি নই। সেই চিঠিখানা তো আমার হাত দিয়েই পাঠিয়েছিল এবং বিশেষ করে বলে দিয়েছিল, পড়ে দেখবেন, এর মধ্যেই আপনার প্রশ্নের উত্তর পাবেন।

এই নিয়ে যখন মনে মনে নানারকম গবেষণা করছি, একটা ছোট্ট ঘটনা ঘটল। 'অন্ ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট সারভিস' মার্কা একখানা চিঠি পেলাম আমার ডাকবাক্সে। উপরে সঞ্জয়ের নাম, কেয়ার অফ্ আমি। বিস্ময়কর ব্যাপার। সঞ্জয় চ্যাটার্জির মতো অত বড় একজন পদস্থ লোকের নামে সরকারী চিঠি আমার ঠিকানায় আসবে কেন? তার অফিসের বা বাসার ঠিকানায় যাওয়াই তো স্বাভাবিক।

টেলিফোনে খবরটা সঞ্জয়কে জানিয়ে দিলাম। সেই দিনই অফিসফেরত চলে এল। বাদামী রঙের লম্বা খাম, ভিতরকার বস্তুটি ছোট। টাইপকরা কয়েকটি মাত্র লাইন। পড়তে পড়তে একটা ম্লান ছায়া পড়ল ওর মুখে। আমি সাগ্রহে তাকিয়েছিলাম। জিজ্ঞাসা করতে যাবো, কিসের চিঠি, তার আগেই কাগজখানা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল। পড়ে দেখলাম, 'উদ্বাস্তু পুনর্বাসন' বলে যে সরকারী দপ্তর আছে, তার কোনো কর্তাব্যক্তি অমুখ তারিখের পত্রের উত্তরে

পত্রদাতার অবগতির জন্যে দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছেন যে মিনতি সেন নামিকা চিটাগং থেকে আগতা কোনো মহিলার সন্ধান পাওয়া যায়নি। অনুমান, ঐ ব্যক্তি সরকার পরিচালিত কোনো ক্যাম্প বা ত্রাণকেন্দ্রে ভর্তি হননি।

চিঠিটা শেষ করে মুখ তুলতেই সঞ্জয় বিমর্ষভাবে ধীরে ধীরে বলল, শহরে আর তার আশেপাশে যতগুলো রিফিউজী কলোনী আছে সব জায়গায় খোঁজ নিয়েছি। পাকিস্তান থেকে একটা দলের সঙ্গে এপারে চলে এসেছে, এই খবরটা শুধু জানতে পেরেছিলাম। তার বেশী কেউ কিছু বলতে পারে না। যাক গে। শুনুন, এবার বেশ কিছুদিন আর আপনার কাছে আসতে পারছি না।

কেন?

লম্বা সফরে বেরোচ্ছি। অনেক জায়গায় যেতে হবে।

ইনস্পেকশন?

সে তো রয়েছেই। তার সঙ্গে কতগুলো অপ্রিয় কাজও আছে।

যথা?

ভালো পজিশনে আছেন, এমন কয়েকটি অফিসারের নামে গোলমেলে রিপোর্ট আছে।

ওসব এনকোয়ারীও কি আপনাকে করতে হয়?

না, এটা ঠিক এনকোয়ারী নয়। সে সব চুকে গেছে। যাদের করবার তারাই করেছেন। তাদের বক্তব্য পাওয়া গেছে। এখানে বসেই অর্ডার দেওয়া চলত। তবু একবার গিয়ে দেখতে চাই। আচ্ছা চলি।

এখনি?

অনেক কাজ আছে। ফাইল টাইলগুলো গুছিয়ে-টুছিয়ে নিতে হবে।

উঠে পড়তেই আমি বললাম, চিঠিটা?

আপনার কাছেই থাক। ও আর আমি কোথায় নিয়ে যাবো?

আমি মনে মনে বললাম, সত্যিই তো। ওর জীবনের যে প্রকাশ্য মহল—অফিস আর বাসা, কোনোটার সঙ্গেই এর কোনো যোগ নেই, সম্পর্ক নেই। ঐ দুই মহলের বাইরে আর একটি ছোট্ট গোপন কুঠরি আছে, এ চিঠি সেখানকার। সে নিভৃত কক্ষের খবর আমি ছাড়া কেউ জানে না। তাই এ আমার কাছে এসেছিল, আমার কাছেই থাকবে।

সঞ্জয়ের ফিরতে দেরি হল এবং আমার কাছে এল ফিরবার বেশ কদিন পরে। তার আগে টেলিফোনে জানিয়েছিল, একটা ব্যাপারে ভীষণ ব্যস্ত আছি। এটা চুকে গেলেই যাবো।

সাধারণত সন্ধ্যার আগে তার আসা হত না। কিন্তু এদিন এল বেলা পাঁচটা নাগাদ। অফিসের পোশাক নয়, ধুতি-পাঞ্জাবি পরা এবং বেশ একটু ঢিলেঢালা ভাব।

বললাম, কী ব্যাপার? অফিস ছুটি নাকি?

মাথা নেড়ে বলল, না।

তাহলে? ছুটি নিয়েছেন বুঝি?

হ্যাঁ।

কদিনের?

সঞ্জয় সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে মৃদু হেসে বলল, কদিন নয়, একেবারে। মানে, বরাবরের মতো ছুটি।

সে কী! আমি স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলাম। সঞ্জয় বলল, ঐ জন্যেই বাইরে থেকে ফিরে এতদিন আপনার এখানে আসতে পারিনি। জানেন তো, চাকরি পাওয়ার চেয়ে ছাড়া আরো কঠিন। অ্যাদ্দিনে মুক্তি পেলাম।

সোফার পিঠে গা এলিয়ে দিয়ে যেন সেই মুক্তির আরামটা উপভোগ করে নিয়ে বলল, কই, আপনার মধু কোথায় গেল? একটু চা-এর ব্যবস্থা করতে বলুন।

তাই করতেই গ্যাছে।

ও, বলে দিয়েছেন ?

আমি কিছু বলিনি। ও নিজেই তো আপনাকে দেখে গেল।

কই, আমি তো দেখতে পাইনি।

কী করে দেখবেন ? আমার এ কাণ্ডারীটি বোধ হয় অদৃশ্য হবার মন্ত্র জানে। আমরা ওকে দেখতে পাই না, ও আমাদের ঠিক দেখে।

বলতে বলতেই চা-খাবারের ট্রে নিয়ে মধু এসে উপস্থিত। আয়োজনটা একটু ব্যাপক আকারের। সেদিকে আঙুল তুলে সঞ্জয় বলল, ব্যাপার কী মধু ?

উত্তরে সে শুধু একটু হাসল। তার সেই সলজ্জ বিনম্র হাসি। তারপর বলল, এবার আপনি অনেকদিন বাদে এলেন বাবু।

ও, এসব তাহলে বকেয়া পাওনা, এরিয়ার ডিউজ ? ভালোই হল। ভালো ভালো জিনিস পেট ভরে খেয়ে নেওয়া যাক। রাতে তো আবার সেই মেস্‌এর ঘ্যাঁট।

মেস্‌এর ঘ্যাঁট ! কেন, বাসা কী হল ?

তুলে দিলাম। কী দরকার একার জন্যে অত বড় এস্‌ট্যাব্লিশমেণ্ট ?

বছরখানেক আগে সঞ্জয়ের মা মারা গেছেন। দুটি ভাইপো ওর বাসায় থেকে লেখাপড়া শিখে ওর চেষ্টাতেই চাকরিবাকরি পেয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। পাটনার সংসার কিছুদিন থেকে একরকম তারাই চালাচ্ছে। তাহলেও নানা দিক থেকে সঞ্জয়ের উপর চাপ কম ছিল না। টাকা যেমন এসেছে, তেমনি বেরিয়ে গেছে। সঞ্জয়ের ঘর প্রায় শূন্য। সবই আমি জানতাম। অথচ ব্যক্তিগত খরচ ওর বরাবরই সামান্য। মাঝে মাঝে ভেবেছি, সঞ্জয়কে একটু 'সংসারী' হবার উপদেশ দেবো। বৃথা হবে বলেই দিইনি। এই জাতীয় লোকগুলোর মধ্যে একটি চিরবৈরাগী বাসা বেঁধে আছে। ঘরবাঁধা এদের ধাতে নেই।

কখনো কখনো সে নিজেই সজাগ হয়ে উঠত, এতগুলো টাকা

মাসে মাসে খরচ করার কোনো মানে হয় না। কিছু কিছু করে জমানো দরকার। ভবিষ্যৎ বলে তো একটা জিনিস আছে। তারপরেই আবার একদিন এসে বলত, ছেলেবেলায় বাবাকে বলতে শুনেছি, 'টাকা জিনিসটা দেখতে গোল হলে কি হবে। ওর অনেকগুলো করে ঠ্যাং। যতই চেষ্টা কর, ঠিক পালিয়ে যাবে।' আমরা হাসতাম। এখন দেখছি, এর চেয়ে খাঁটি কথা আর নেই।

সঞ্জয় খেতে খেতে বলল, কই, আপনি তো কিছুই বলছেন না। এত বড় একটা নতুন খবর এনে দিলাম।

বললাম, কথাটা শুনতে যদিও উপন্যাসের ডায়ালগের মতো, তবু বলবো, বলবার মতো ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। তখন থেকে ভাবছিলাম, জিৎমলবাবু বেঁচে থাকলে এত বড় দুর্ঘটনা কখনো হতে দিতেন না। আপনার যাওয়া হত না।

অন্তত এর চেয়ে অনেক বেশী শক্ত হত, তা ঠিক। তবে তাঁর ছেলেরাও কম বাধা দেয়নি। ডিরেক্টর বোর্ড তো রীতিমতো বেঁকে বসেছিল।

আমার বিস্ময়ের অবধি রইল না। স্বভাবতই ধরে নিয়েছিলাম, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোনো গুরুতর মতভেদ বা বিরোধের জন্যেই সে সরে এসেছে, বা আসতে বাধ্য হয়েছে।

সঞ্জয় আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনের কথাটা বুঝতে পারল। বলল, আপনি যা ভাবছেন, তা নয়। ওদের সঙ্গে আমার টারম্স্ বরাবরই ভালো।

তবে কি স্ট্রাইক-ফ্রাইক জাতীয় কোনো ব্যাপারে—

না, তাও নয়। এ একেবারে অন্য জিনিস।

বলে, মাথা নীচু করে একটু কি ভেবে নিল এবং সেই ভাবেই মৃদু স্বরে স্বগতোক্তির মতো বলল, হ্যাঁ, আপনাকে বলতে হবে বৈকি! যদিও জানি না, আমার আসল কথাটা ঠিক বোঝাতে পারবো কিনা।

মধু এসে ট্রেটা সরিয়ে নিয়ে গেল। সঞ্জয় একটা সিগারেট ধরিয়ে

আস্তে আস্তে দু-এক টান দিয়ে কিছুক্ষণ নিবিষ্ট হয়ে চেয়ে রইল খোলা ছাদের দিকে। তারপর শুরু করল :

আপনাকে সেদিন বলেছিলাম, কোম্পানীর দু-একটি অফিসারের বিরুদ্ধে কতগুলো অভিযোগ ছিল। বিশেষ করে সেই সূত্রেই আমাকে বাইরে যেতে হয়েছিল। তার মধ্যে একজনের কেসটাই বেশী সিরিয়াস। লোকটি ওভারসিয়ার। বাড়ি ছিল ঢাকা না কুমিল্লায় ঠিক মনে নেই। পার্টিশানের পর এখানে এসে চাকরির চেষ্টায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমার কাছে এসেছিল আমার এক পুরনো বন্ধুর চিঠি নিয়ে। কাজ জানা অভিজ্ঞ লোক। কথাবার্তা বলে যোগ্য বলে মনে হল। নিয়ে নিলাম।

আমাদের স্টোন-চীপ্-এর কারবার তো আপনার জানা আছে, যা নিয়ে জিৎমলবাবুর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। সেই পাহাড়গুলোর কথাও নিশ্চয়ই মনে আছে। তারই কাছে কতগুলো স্টাফ্ কোয়ার্টার্স তৈরি হচ্ছিল। ঐ ঈশান গুপ্ত ছিল তার চার্জে। মোটা টাকার কাজ। বাড়ি তৈরির ভার কনট্যাক্টরের ওপর। গুপ্ত দেখাশুনো করে। কালেভদ্রে কোলকাতা থেকে চীফ্ এঞ্জিনিয়র গিয়ে দেখে আসেন।

একবার এসে আমাকে বললেন, গুপ্তর নামে কিছু অ্যালিগেশন পাওয়া গেল। টাকা-পয়সা সংক্রান্ত। প্রমাণ-ট্রমান পাওয়া শক্ত। তাছাড়া কাজটাই এমনি, ওখানে একটু-আধটু এদিক ওদিক সবাই করবে। তাহলেও বছর তিনেক হয়ে গেল। ওকে ওখান থেকে সরিয়ে অন্য কোথাও দিলে ভালো হয়।

আমি মত দিলাম।

কোথায় দেওয়া যায়, ওর জায়গায় কে যাবে, এই সব যখন ভাবা হচ্ছে, একখানা বেনামা চিঠি পাওয়া গেল—কোলকাতার কোনো একটা ব্যাঙ্কে বেশ কয়েক হাজার টাকার অ্যাকাউণ্টস্ খুলেছে গুপ্ত, এবং সেটা তার স্ত্রীর নামে। গোপনে খবর নিয়ে জানা গেল, খবরটা সত্যি। টাকার পরিমাণ—এ ক'বছরে যে মাইনে সে নিয়েছে কোম্পানী

থেকে, তার চেয়ে অনেক বেশী। কাজকর্ম সম্পর্কেও নানারকম অভিযোগ পাওয়া গেল।

চীফ্ এঞ্জিনিয়র গেলেন এনকোয়ারীতে। অনেক কিছু পেলেন ওর বিরুদ্ধে। চার্জশীট্ তৈরী হল। ব্যাঙ্ক ডিপোজিটের ব্যাপারটাও রইল তার মধ্যে। অত টাকা কোথেকে কিভাবে এল তার কোনো সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ পাওয়া গেল না। মিথ্যা হিসাব, আসলে মাল কেনা হয়নি অথচ ষ্টকবইতে দেখানো হয়েছে, এই জাতীয় এবং অন্যান্য ব্যাপারে অনেক টাকা সে চুরি করেছে, তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

ডিপার্টমেণ্ট থেকে সুপারিশ এল, গুপ্তকে পুলিসে দেওয়া হোক। আমি কেসটা আগাগোড়া তন্নতন্ন করে দেখে এবং বিবেচনা করে ওর অনুকূলে একটি পয়েণ্টও পেলাম না। ডিপার্টমেণ্টের সঙ্গে একমত হওয়া ছাড়া আমার করবার কিছুই ছিল না। তবু অর্ডার দিতে গিয়ে দিলাম না। ভাবলাম, একবার দেখে আসি।

তখনই অবিশ্যি মনে হয়েছিল, এটা আমার নিছক দুর্বলতা ছাড়া আর কিছু নয়। যে কারণে দেখে আসতে যাচ্ছি তাকে ছেলেমি কিংবা পাগলামিও বলতে পারেন। তবু কে যেন আমাকে টেনে নিয়ে গেল।

জিৎমলবাবুর সঙ্গে প্রথম যেবার যাই তখনকার তুলনায় ওখানকার কাজ অনেক বেড়ে গিয়েছিল। পদস্থ অফিসারদের প্রায়ই যেতে হত। একটি রেস্ট হাউস তৈরি হয়েছিল তাদের জন্যে, পাহাড়গুলোর উলটো দিকে একটি নির্জন টিলার ওপর। চারদিকের দৃশ্যপট মনোরম। জায়গাটি আমিই পছন্দ করেছিলাম।

সন্ধ্যার মুখে গিয়ে পৌঁছলাম সেখানে। রাতের মতো বিশ্রাম। নটা নাগাদ খেয়েদেয়ে একখানা বই নিয়ে খোলা বারান্দায় ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছিলাম। সামনে গভীর বন, পিছনে বেশ কিছুটা তফাতে লোকজনের বসতি। তাদের কলরব এখানে এসে পৌঁছায় না। কৃষ্ণপক্ষের রাত। চারদিকে নিঝুম অন্ধকার। চৌকিদারের ঘর বিশাল

কম্পাউণ্ডের এককোণে। সেও হয় তো শুয়ে পড়েছে।

বইখানা আমার অত্যন্ত প্রিয়—এমিয়েল্‌স্ জার্নাল। যখনই বাইরে যাই ওটি আমার সঙ্গী। কিন্তু ঐদিন কিছুতেই মন বসছিল না। থেকে থেকে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলাম। অথচ ঘুমের কোনো সম্ভাবনা নেই যে গিয়ে শুয়ে পড়বো।

হঠাৎ পিছনে পায়ের শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়েই অবাক হয়ে গেলাম। ঘরের বাতি নেভানো। বারান্দার খানিকটা আলো গিয়ে পড়েছে সেখানে। তাতে দেখা গেল একটি স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে আছে। বললাম, কে ?

আমি মিনু।

যতটা বিস্মিত হবার কথা, ততটা যেন হলাম না। ঐ নামটাই যে আমাকে কোলকাতা থেকে টেনে নিয়ে এসেছে। যদিও আমার সহজ বুদ্ধি, আমার সরল যুক্তি আমাকে বার বার বলেছে, নামের মিল থেকে মানুষের মিল খুঁজতে যাওয়া নিতান্ত হাস্যকর। ব্যাঙ্কের খাতায় ঈশান গুপ্তের স্ত্রী মিনতি গুপ্তই সদানন্দ কবিরাজের মেয়ে মিনতি সেন, এমন একটা উদ্ভট ধারণা মনে মনে পোষণ করা এবং সেটা যাচাই করে দেখবার জন্যে এতদূরে ছুটে আসা সুস্থ মস্তিষ্কের লক্ষণ নয়। পি আর জিৎমল অ্যাণ্ড কোম্পানীর মতো অত বড় প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেকটর সঞ্জয় চ্যাটার্জির পক্ষে এটা লজ্জার কথা। তবু কী এক দুর্বার কৌতূহল এবং তার চেয়েও বেশী একটা অসম্ভব আশা আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে এসেছে।

হয়তো এই অত্যাশ্চর্য অঘটনের জন্যে আমার মনের কোনো অগোচর কোণে একটা প্রস্তুতি চলছিল। তাই শুধু একবার চমকে উঠলাম।

মিনু মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে কাছে এসে দাঁড়াল। অনেক বদলে গেছে। রক্ত-মাংসে গড়া সেই কাঠামোটা শুধু আছে, শুধু একটা ফ্রেমওয়ার্ক, যার থেকে চেনা যায়, এই পর্যন্ত, কিন্তু তার প্রতি

অঙ্গ থেকে যে দীপ্তি বেরিয়ে আসত তার কোনো চিহ্ন নেই। একটা চেয়ার দেখিয়ে বললাম, বসো। মিনু বসল না। একবার শুধু মুখ তুলে তাকাল।

জিজ্ঞেস করলাম, তোমার সঙ্গে কে আছে?

কেউ না; আমি একাই এসেছি।

এত রাত্রে, এই অন্ধকারে! পথও নেহাৎ কম নয়।

এ ছাড়া আমার উপায় ছিল না। কেন এসেছি যদি একবার শোনেন—

বল।

ঈশান গুপ্ত আমার স্বামী। তাকে আপনি বাঁচিয়ে দিন, সঞ্জয়দা। নৈলে ছুটো বাচ্চা নিয়ে আমাকে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

আমি চুপ করে রইলাম। মিনু ক্ষণকাল নীরব থেকে বলল, আমি শুনেছি, আপনি সব পারেন। আপনি যা করবেন, তার উপরে কথা বলবার ক্ষমতা কারো নেই।'

তুমি ঠিক শোননি। যা শুনেছ, তা যদি সত্যি হত, তাহলেও আমি যা খুশি করতে পারি না আমাকে কতগুলো আইনকানুন মেনে চলতে হয়।'

তার বিরুদ্ধে আপনাদের যত টাকার দাবি, আমার ব্যাঙ্ক ডিপোজিট থেকে নিয়ে নিন। তাতে যদি না কুলোয়, আমার সব গয়না দিয়ে দিচ্ছি। তার ওপরে আরো শাস্তি দিতে চান, চাকরি থেকে সরিয়ে দিন। পুলিসে দেবেন না, এইটুকু শুধু ভিক্ষা চাইছি আপনার কাছে।

শেষের দিকে তার গলাটা ধরে এল, কিন্তু ভরসা দেবার মতো কোনো কথা আমার মুখ থেকে বেরোল না।

মিনু কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে থেকে বলল, আমার জন্যে, আমার ছেলেমেয়ে ছুটোর জন্যে এও কি আপনি পারেন না, সঞ্জয়দা?

. আমি মাথা নেড়ে বললাম, কোনো উপায় নেই, মিনু। এ কেস আমরা কোনো রকমেই নিজেদের হাতে রাখতে পারি না। ফৌজদারী মামলা রুজু করা ছাড়া অন্য পথ নেই।

মিনু একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'আমার কপাল। শুধু শুধু এত রাত্রে আপনাকে বিরক্ত করে গেলাম।'

চলে যাবার জন্যে পা বাড়াল। আমি বললাম, তুমি জানতে আমি এই কোম্পানীতে চাকরি করি?

জানতাম।

আগেই জানতে, না সম্প্রতি শুনেছ?

না, অনেক আগেই শুনেছিলাম।

অনেক আগেই শুনেছিলে! কিন্তু কখনো তো একবার দেখা করবার বা একটা খবর দেবারও চেষ্টা করনি?

মিনু চুপ করে রইল। আমি বললাম, আর আমি তোমাকে কত বছর ধরে কত জায়গায় খুঁজে বেড়িয়েছি।

চকিতে একবার চোখ তুলেই সে চলতে শুরু করল। আমি তার সঙ্গে যেতে যেতে বললাম, আজ এসেছি কেন জানো? শুনে তুমি হাসবে। ব্যাঙ্কের বইতে মিনতি গুপ্ত নামটা দেখবার পর থেকেই— থাক সে কথা। শোনো মিনু, যদি অপরাধ না নাও, তোমাকে একটা সামান্য অনুরোধ করবো।

মিনুর চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল। যেতে যেতে থেমে গেল। আমি বললাম, ঈশানবাবু যদি কোর্ট থেকে ছাড়া পান, খুব ভালো কথা। আর যদি তাঁকে জেলে যেতে হয়, যতদিন ফিরে না আসেন, তোমার আর তোমার বাচ্চা দুটির সব ভার তুমি আমার—

কেন? কথাটা শেষকরবার আগেই বাধা দিল মিনু। অস্পষ্ট আলোতেও লক্ষ্য করলাম, তার মুখের পেশিগুলো শক্ত হয়ে উঠেছে, কোন্ সুবাদে আমি আপনার গলগ্রহ হয়ে থাকবো?

পূর্ণ দৃষ্টি মেলে আমার দিকে তাকাল। সে চোখের সামনে

আমি সঙ্কুচিত হয়ে পড়লাম। কোনোরকমে 'বললাম, কেন, আমাদের মধ্যে কি কোনো সম্পর্ক নেই, কোনো সম্পর্ক ছিল না?'

না। বলে, দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল। খানিকটা গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। কি যেন ভাবল বাইরের দিকে চেয়ে। তারপর আমার দিকে ফিরে তিক্তকণ্ঠে শ্লেষ ঢেলে বলল, 'এবার বুঝতে পারছি, কেন আপনি আমার স্বামীকে জেলে পাঠাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। ভেবেছেন, যাকে কত বছর ধরে কত জায়গায় খুঁজে বেড়িয়েছেন (এ কথাগুলো আমার এবং আমারই সুর অনুকরণ করে আবৃত্তি করে গেল) তাকে হাতের মুঠোয় পাবার এই সুযোগ। কিন্তু আপনি ভুল করছেন পঞ্চমবাবু। আমাকে আপনি এখনো চিনতে পারেননি।

ডান হাতের তর্জনী তুলে ধরল আমার দিকে। আমি কেবল ভাবছিলাম, আমি ভুল শুনছি না তো! এই কথাগুলো কি মিনুর মুখ থেকে বেরোচ্ছে? এ কি তার কণ্ঠস্বর, তার ভাষা? কিংবা এ হয়তো মিনু নয়। অন্য কেউ। এতক্ষণ 'ধরে আমি একটা স্বপ্ন দেখছিলাম।

আমার কিছু বলবার মতো অবস্থা ছিল না। শুধু একখণ্ড নিশ্চল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। সে ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ খেয়াল হল, এই অন্ধকারে তাকে একা ছেড়ে দিলাম। ছুটে বেরিয়ে গেলাম রাস্তায়। গলা ছেড়ে ডাকলাম, মিনু মিনু—

পাহাড়ের গায়ে ঠেকে আমার ডাক আমার কাছেই ফিরে এল। কোনো দিক থেকে কোনো সাড়া পেলাম না। কোন্ পথে গেল, কোন্ দিকে তার বাসা কিছুই ঠাহর করতে পারলাম না।

অনেক রাত পর্যন্ত রেস্ট হাউসের খোলা বারান্দায় পায়চারি করতে করতে হঠাৎ এক সময়ে মনে হল, এ হতে পারে না। সজ্ঞানে সুস্থ মস্তিষ্কে মিনু আমার নামে এত বড় একটা হীন, জঘন্য, কুৎসিত

অভিযোগ করে গেল, এ অসম্ভব। কিংবা হয়তো এত বড় বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে সত্যিই তার জ্ঞান ছিল না, মস্তিষ্ক সুস্থ থাকবে তাও আশা করা যায় না। তবু সে পারে না। তাকে তো আমি চিনি। এটা তার শিক্ষার, সংস্কৃতির, তার রুচির, তার চরিত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী। আমি তো তাকে একদিন দুদিন ধরে দেখিনি। কয়েক মাস ধরে তার প্রতিটি কাজ, প্রতিটি আচরণ, প্রতিটি চিন্তার সঙ্গে আমার পরিচয়। তার সারা মন যে সে আমার সামনে খুলে দিয়েছিল। তার অন্তরের কোনো কোণটাই আমার অজানা ছিল না।

জানি, মানুষ বদলে যেতে পারে। হয়তো এতগুলো বছর অনেক ঝড় বয়ে গেল তার উপর দিয়ে, অনেক ঘা খেয়ে খেয়ে এখানে এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। যে-মন সেদিন আমার দিকে ছুটে এসেছিল, সে অন্য খাতে চলে গেছে, কিংবা শুকিয়ে গেছে। মেনে নিলাম। তবু সে তার উন্মত্ত কল্পনাতেও আমার সম্বন্ধে এ রকম কথা উচ্চারণ দূরে থাক, মনে মনে ধারণা করতে পারে, এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারলাম না।

কিন্তু নিজের কানে যে শুনলাম! ওটা ওর অভিনয়। ইচ্ছা করে আমার যেটা সব চেয়ে দুর্বল স্থান সেইখানে আঘাত করে গেল। ও কখনো বিশ্বাস করে, আমি ওর স্বামীকে জেলে পাঠাচ্ছি, ওকে হাতের মুঠোয় পাবো বলে? হাতের মুঠোয় তো পেয়েছিলাম। তখন তো নিইনি। ওর অত বড় দান প্রত্যাখ্যান করে চলে গিয়েছিলাম। তা না করে বলতে পারতাম, যদি কোনো দিন ফিরে আসি তখন এসে নেবো। সে কি ও ভুলে গেছে? এটা ওর ছল। ও ভাবল, ঐ বিশ্রী অভিযোগটাকে মিথ্যা করে দেবার জন্যেই আমি ওর স্বামীকে ছেড়ে দেবো। ওর বিশ্বাস, আমি সেটা ইচ্ছা করলেই পারি। অনুরোধে যখন করলাম না, তখন আশ্রয় নিল অভিনয়ের। এবার আমাকেই প্রমাণ দিতে হবে যে আমি ওর ওপর অন্যায় ভাবে অনুরক্ত নই। যে দুর্নাম সে দিয়ে গেল তার থেকে নিজেকে বাঁচাতে হলে ওর

স্বামীকেও বাঁচিয়ে দিতে হবে।

কী ছেলেমানুষ! তখনো বড্ড ছেলেমানুষ ছিল। আপনার মনে নেই কী কাণ্ড করেছিল, যেদিন পুলিস আমাকে ওদের বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গেল? যখন দেখলাম, পালাবার আর কোনো পথ নেই, আমি ধরা দেবার জন্যে তৈরী। ও কিছুতেই শুনবে না, জোর করে ধরে নিয়ে ওর খাটের নিচে কম্বল চাপা দিয়ে দিল। ভেবেছিল, পুলিস টের পাবে না। বেচারা! আজও তেমনি ছেলেমানুষ রয়ে গেছে।

এই কথাগুলো যখন বলছিল সঞ্জয়, আমার মনে হল ওর কণ্ঠ থেকে একটি স্নেহনির্ঝর ঝরে ঝরে পড়ছে। একদা বোমা-পিস্তলধারী, অধুনা একটি বৃহৎ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার সঞ্জয় চ্যাটার্জির ভিতরে এমন একটা মানুষ লুকিয়ে ছিল, এই ভাষায় এই সুরে সে কথা বলে যাচ্ছে, নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে বাধছিল।

সঞ্জয় বোধ হয় বুঝতে পারছিল, সে নিজেকে কিছুটা আবেগের আওতায় নিয়ে যাচ্ছে। তখনই যেন টেনে সরিয়ে নিয়ে এল। গলার স্বরও একেবারে আলাদা মিস্টার চৌধুরী, আপনি হয়তো ভাবছেন, এসব আমার কষ্টকল্পিত রচনা। কঠিন রিয়ালিটির আঘাত থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা, নিজেকে মিথ্যা দিয়ে ভোলানো। আমিও কি তা ভাবিনি? কিন্তু বারংবার এই দৃঢ় বিশ্বাসে ফিরে এসেছি—শেষ মুহূর্তে মিনু যা বলে গেল, সেটা তার আসল কথা নয়। নিছক বানানো। যে উদ্দেশ্যে বানানো, সেটা অবশ্য হাস্যকর। কিন্তু কতই বা বুদ্ধি ওর? হাজার হলেও মেয়েমানুষ। তাছাড়া, এখন সত্যিই ওর অবস্থা ঠিক ডুবন্ত মানুষের মতো। হাতের কাছে খড়কুটো যা পেল আঁকড়ে ধরল।

সকাল হতেই লোকজন আসতে লাগল। স্থানীয় স্টাফ নেহাৎ ছোট নয়। তাছাড়া আমি ওখানে যাচ্ছি, এ খবর অন্যান্য জায়গাতেও পৌঁছে গেছে। অনেকের অনেক রকম কাজ। এখানে সেরে নেবার

সুযোগ সুবিধা বেশী। কোলকাতায় আমি নিশ্চয়ই এতটা সুলভ নই।

বেলা হল। যে সব চেয়ে বেশী প্রত্যাশিত, তার দেখা নেই। ভাবলাম, হয়তো স্ত্রীকে পাঠিয়ে বুঝে নিয়েছে কোনো আশা নেই তাই আসেনি। কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছিল, মিনু নিজে থেকে এসেছিল, তার স্বামী তাকে পাঠায়নি।

ডেকে পাঠাতে যাবো, এমন সময় বেয়ারা জানাল, ওভারসিয়ারবাবু দেখা করতে চায় এসেই কৈফিয়ৎ দিল, ভিড় কমবার অপেক্ষায় ইচ্ছা করেই দেরি করেছে। তাছাড়া—

বললাম, কী, বলুন ?

আমার স্ত্রী কাল রাত্রে বাড়ি ছিল না। তিন নম্বর ব্লকে আমার এক পিসীমা থাকেন। তাঁর অসুখ। সেখানে গিয়েছিল। ছেলে-মেয়ে দুটোকে একা ফেলে আসতে পারিনি। আজ সকালে ফিরতে—'

বুঝলাম, সমস্ত ব্যাপারটাই গোপন রেখেছে মিনু। নিভৃত রাতে কয়েকটি মিনিটের জন্যে যে দেখা পেলাম, তার সমস্ত মাধুর্য ও বেদনা রইল শুধু আমাদের দুজনের কাছে। আর কেউ তা জানল না, জানবে না।

ঈশান তার চার্জশীটের জবাব দিয়েছিল পাকা উকিল দিয়ে। সব আগাগোড়া অস্বীকার। এখন এক কাণ্ড করে বসল। আচম্বিতে আমি কিছুমাত্র আন্দাজ করবার আগেই খপ করে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলল, স্যার, আপনি ব্রাহ্মণ, আমার অন্নদাতা, রিফিউজী বলে দয়া করে চাকরি দিয়েছিলেন। আপনার কাছে মিথ্যা বলবো না। টাকা আমি নিয়েছি। লোভ সামলাতে পারিনি। আমি একা নিইনি, স্যার। তাহলেও আমি সব দিয়ে দেবো। কোম্পানীর সব লোকসান পুরিয়ে দেবো। আমাকে বাঁচান। আপনি মহানুভব। যে-দেশের জন্যে প্রাণ তুচ্ছ করে মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, আমিও সে দেশের একটা নগণ্য মানুষ। বাড়িঘর নেই। আমার

স্ত্রীও রিফিউজী। কেউ কোথাও নেই। দুটো ছেলেমেয়ে। সব ভেসে যাবে, স্যার। আমাকে একটা চান্স দিয়ে দেখুন···

আরো অনেক কথা বলে গেল এমনি সাধুভাষায়। আমি কয়েকবার পা ছাড়াবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে চুপ করে রইলাম।

তার বলা যখম শেষ হল, বললাম 'আমার কাছে মুখে যা কবুল করলেন, লিখে দিতে পারবেন?

নিশ্চয়ই।

,বেশ, লিখুন।'

একটা প্যাড্ এগিয়ে দিলাম। সে ঘরে গিয়ে লিখতে লাগল।

ঈশানের ফাইল আমার সঙ্গেই ছিল। সব কিছু হয়ে আছে, শুধু আমার অর্ডারটা বাকী। সেটা যে কী হবে সে বিষয়ে কারো সন্দেহ ছিল না। আমারও না। বিভাগীয় কর্তার রেকমেণ্ডেশনের নীচে দুটি মাত্র শব্দ—আই এগ্রী। তার বদলে অনেক শব্দ লিখতে হল। তার সারটুকু আপনাকে বলছি—ঈশান গুপ্তের বিরুদ্ধে যে দাবী সাব্যস্ত হয়েছে, সে টাকাটা যদি সে দিয়ে দেয় এবং যে মাল স্টকবুকে জমা বলে দেখানো হয়েছে, অথচ জমা হয়নি, সব যদি সে পুরিয়ে দেয়, তাকে ফৌজদারী সোপর্দ করবার প্রয়োজন নেই। বিভাগীয় শাস্তিই যথেষ্ট। তাকে পাঁচ বছরের জন্যে নীচের গ্রেডে নামিয়ে দেওয়া হল। চীফ এঞ্জিনিয়র যেন অবিলম্বে তার অন্যত্র বদলির ব্যবস্থা করেন।'

এই পর্যন্ত এসেই থেমে গেল সঞ্জয়। বলল না যে এটা তার ভাঙা হাতের রায়। না বললেও আমি বুঝলাম এবং এও বুঝলাম নিজের কাছে সেই সত্যটি ধরা পডবার পর সঞ্জয় চ্যাটার্জি আব গদি আঁকড়ে পড়ে থাকতে পারে না।

শেষ